বাংলার সব্জী

শ্রীঅমরনাথ রায়

ফেলো অফ দি রয়েল হর্টিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর রয়েল
এগ্রিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর ন্যাশন্যাল রোজ সোসাইটী
(লণ্ডন) ; বণ্ডেড মেম্বর ফ্লোরিষ্ট টেলিগ্রাফ ডেলিভারি
এসোসিয়েসন (ইউ. এস্. এ.) ; ফার্ম্মার ও কৃষিলক্ষ্মী
পত্রিকার সম্পাদক ; গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী
এবং বহু কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা ।

[মূল্য দেড় টাকা

নিবেদন

দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে চাষ-আবাদ করিবার আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু এ-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে আমাদের এখানে কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তকের যথেষ্ট অভাব আছে এবং সেই অভাবের জন্য কৃষি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে এখন পর্যন্ত তেমন জ্ঞান বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কৃষি সম্বন্ধে আগ্রহশীল আমার কতিপয় বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে বলেন এবং তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি খুবই দ্বিধার সহিত সর্ব্বপ্রথমে 'বাংলার সব্জী' নামক পুস্তকখানি বাহির করি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের আগ্রহ কত বাড়িয়াছে।

পল্লীসংগঠন বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং আমার পরম বন্ধু কৃষি-বিশেষজ্ঞ বাবু চণ্ডীচরণ বিশ্বাস মহাশয়

আমাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তকখানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এবং উদ্যান-স্বামী, কৃষক ও মালি সকলেরই উপকারে আসে সে বিষয়ে যত্ন লইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বিচার করিবার ভার আমার নহে; সহৃদয় পাঠকবর্গ ও সুধীজনের উপরেই সে ভার অর্পণ করিলাম।

এ বৎসর কাগজের দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও লোকের আগ্রহ দেখিয়া বাংলার সব্জীর পূর্ব্বমূল্য বর্দ্ধিত না করিয়া পুনরায় প্রকাশিত করিলাম।

পুস্তকের স্থানে স্থানে ছাপার ভুল আবশ্যক বোধে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইল।

বিনীত গ্রন্থকার

উৎসর্গ

যাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যাহার সেবায়

গ্লোব নার্শরী

আজ উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে

—যাহার—

কার্য্যকলাপ আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
আজও গাঁথা রহিয়াছে, কৃষির উন্নতি ও হিত-
সাধনের জন্য যাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত

সেই কর্ম্মবীর আমার ভ্রাতৃস্থানীয়

৺শশধর দত্তের

পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে

বাংলার সব্জী

নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
উৎসর্গ করিলাম।

'অমরদা'

ভূমিকা

আজকাল ভাইটামিনের যুগ। এখন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে টাট্‌কা শাক-সব্জী খাও, তবেই বাঁচিতে পারিবে ; এবং পাঠশালায় বা বিদ্যালয়ে আসিয়া কৃষি শিক্ষার বই পড়, তবেই শাক-সব্জী উৎপন্ন করিতে শিখিবে। কিন্তু পূর্ব্বে এ সকল ব্যবস্থার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন শাক-সব্জীর ছোট ছোট বাগান থাকিত। এমন কি বাড়ীর মেয়েরাই সে বাগানের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা নিজ হস্তে বীজ পুঁতিতেন, গাছে জল দিতেন, গাছের পোকা বাছিতেন, গাছে পোকা ধরিলে ছাই দিতেন ইত্যাদি সকল প্রকার পরিচর্য্যা করিতেন। নিজ হস্তে শাক-সব্জী তুলিতেন, সকাল সন্ধ্যায় ছোট ছেলে-মেয়েদের লইয়া বাগানটীতে ঘুরিতেন, কোন্ গাছ কোন্ সময়ে রোপণ বা বপন করিতে হয় তাহাদিগকে বলিতেন, তাহাদের দেখাইতেন, কোন্ গাছে কি ফল হইয়াছে ; বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও কত আনন্দ পাইত, তাহারাও নিজ হস্তে গাছ রোপণ করিত, কাহার গাছে কত বড় ফল হইয়াছে, ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা প্রতি-যোগিতা চলিত। ইহার ফলে ছেলেদের শারীরিক ব্যায়াম ত' হইতই, শাক-সব্জী চাষবাস সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতেই তাহাদের একটা অভিজ্ঞতাও জন্মিত এবং শিশুকাল হইতেই টাট্‌কা শাক-সব্জী খাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইত। ইহার আরও একটা সুফল এই ছিল যে, পাড়া-

প্রতিবেশীদের মধ্যে এই সকল শাক-সব্জীর আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির ভাব থাকিত। ছেলে-মেয়েরাও শিখিত যে পাড়া প্রতিবেশীদের জিনিস দেওয়াতে বেশ আনন্দ আছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা গৃহস্থের আর্থিক সাহায্য যে অনেক পরিমাণে হইত, তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষা প্রণালীর দোষেই হউক, কিংবা আধুনিক সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতেই হউক, এই চিরন্তন প্রথাটী শিক্ষিত সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে সভ্যতার প্রবাহে আমরা এই ব্যবস্থাটী উঠাইয়া দিয়াছি, সেই সভ্যতার প্রবর্ত্তক ইংরাজগণের মধ্যে এই প্রথা পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক ইংরাজের বাড়ীতেই একটী করিয়া 'কিচেন গার্ডেন' আছে এবং ইংরাজ মহিলারাই তাহার তত্ত্বাবধান করেন ও সেই বাগানে নিজ হস্তে কাজ করেন।

সুখের বিষয় শাক-সব্জী উৎপন্ন করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত সমাজ পুনরায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ইতিমধ্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের দিনে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি নিজ নিজ বাড়ীতে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তরিতরকারীর চাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল ভাইটামিনপূর্ণ টাট্‌কা তরিতরকারী পাইবেন তাহা নহে, তাঁহাদের দৈনিক বাজার খরচেরও যে অনেকটা হ্রাস হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়াছেন যে, গ্রামের সকলে যদি আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং ডোবা, খানা প্রভৃতি ভরাট করিয়া তরিতর-কারীর আবাদ করেন, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং গ্রামখানি শ্রী, সম্পদ ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

বিনা অভিজ্ঞতায় কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ তরিতরকারী উৎপাদনের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাই প্রধান। তবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ব্বে কেতাবী অভিজ্ঞতা লাভ করাও দরকার। সেইজন্য কিছু কেতাবী অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

যদিও বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ, তবুও বাংলা দেশে কৃষি সাহিত্য নাই বলিলেই চলে। বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে ব্রতী হইয়া কৃষি বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া কৃষি সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী করুন, ইহাই প্রার্থনা করি। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে বাংলার কৃষি-সাহিত্য-ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা অর্থশালী ত' হন নাই, বরং ক্ষতি-গ্রস্তই হইয়াছেন, কারণ বাংলার কৃষি-সাহিত্য কয়জনেই বা পড়ে? এ অবস্থায় যে 'গ্রোব নার্শরী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় 'বাংলার সব্জী' প্রকাশ করিলেন, ইহাতে তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার এই উদ্যমের পশ্চাতে

কেবলমাত্র দেশ-সেবার ইচ্ছাই প্রবল রহিয়াছে ; ইহাতে তিনি লাভ-লোকসানের হিসাব করেন নাই। তাঁহার সম্পাদিত 'কৃষি-লক্ষ্মী'ও ইহার আর একটী উদাহরণ।

বর্ত্তমান সময়ে 'গ্লোব নার্শরী' বাংলার শ্রেষ্ঠ নার্শরীগুলির অন্যতম। যদিও অমরবাবু ইহার সত্বাধিকারী, তিনি চেয়ার টেবিলে বসিয়া আফিসে কাজ করেন না, তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মচারীরাই আফিসের কাজ চালান,—তাঁহার মতে তাঁহার নার্শরীই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। তিনি ও তাঁহার ছোট ভাই শ্রীমান বীরেন্দ্র প্রত্যেক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নার্শরীর অন্যান্য শ্রমিকদিগের সহিত খালি পায়ে, খালি গায়ে, হাঁটু পর্য্যন্ত খদ্দর পরিয়া মাটি খোঁড়েন, গাছ লাগান ও বাগানের অন্যান্য যাবতীয় কাজ করেন। নার্শরীর প্রত্যেক গাছটীর ইতিবৃত্ত তিনি জানেন।

অমরবাবু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হাতে-হেতেড়ে বাগানের কাজ করিয়া শাক-সব্জীর চাষ সম্বন্ধে যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার 'বাংলার সব্জী' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং পাঠকগণ ইহা দ্বারা শাক-সব্জী উৎপাদন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভের সুযোগ পাইবেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা,
৫।১।৪২

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার সব্জী

সূচীপত্র

(প্রথম অধ্যায়)

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

কন্দ বা মূল জাতীয় সব্জী

(তৃতীয় অধ্যায়)

কপি জাতীয় সব্জী

(চতুর্থ অধ্যায়)

শশাকী বর্গীয় সব্জী

(পঞ্চম অধ্যায়)

(ষষ্ঠ অধ্যায়)

শুঁটী জাতীয় সব্জী

(সপ্তম অধ্যায়)

বিবিধ শাক (দেশী ও বিদেশী)

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

(অষ্টম অধ্যায়)

পরিশিষ্টাংশ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

বাংলার সব্জী

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ জ্ঞান

বীজের আবশ্যকতা ও তাহার কার্য্য

সৃষ্টি রক্ষার জন্য ভগবান প্রাণিজগতে যেমন মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গাদি সৃজন করিয়াছেন, উদ্ভিদ্‌জগতেও সেইরূপ নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি সৃজন করিয়াছেন। উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধির জন্য ভগবান বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের ন্যায় উদ্ভিদ্-বীজও ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভকোষের মধ্যে একটি ভাবে অবস্থান করে এবং ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণ-অবয়ব প্রাপ্ত হয়। অঙ্কুরোৎপাদন ও

পুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য শ্বেতসার নামক এক প্রকার কোমল পদার্থ বীজের মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। উহা নষ্ট হইলে বীজের জীবনী-শক্তি নষ্ট হয়, ফলে অঙ্কুরোৎপাদনের আর কোন ক্ষমতা থাকে না।

মনুষ্যজাতি হইতে যেমন মনুষ্যজাতিরই জন্ম হইয়া থাকে, সেইরূপ এক জাতীয় বীজ হইতে সেই জাতীয় গাছই জন্মে। সুস্থ লোকের সন্তান সাধারণতঃ সুস্থই হইয়া থাকে। সেইরূপ সতেজ ও পরিপুষ্ট বীজ হইতে সাধারণতঃ সতেজ গাছই জন্মায়।

বীজ সংগ্রহ

সুতরাং বীজ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ রুগ্ন ও নিস্তেজ গাছগুলি জমি হইতে কাটিয়া ফেলা উচিত, পরে বীজ সংগ্রহ করিবার পরও পুনরায় একবার বীজ বাছিয়া লওয়া দরকার। এইরূপ করিলে স্বভাবতঃ ফসলের উন্নতি হয়। জমিতে ২।১টী গাছও যদি রুগ্ন জন্মায় তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গাছগুলিও ঐরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বীজসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যাঁহারা নিজে বীজ প্রস্তুত করেন না, তাঁহারা যেন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বীজ সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত বীজ পুনরায় একবার বাছিয়া লয়েন।

অনেক চাষী অনেক সময় পুরাতন অথবা অপরিপুষ্ট

বীজ ক্ষেত্রে বপন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন, বীজ ভাল কি মন্দ তাহা সাধারণের পক্ষে দেখিয়া নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টকর। আমি নিম্নলিখিত উপায়ে বীজ পরীক্ষা করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

বীজ চিনিবার উপায়

একটী বিস্তৃত পাত্রে কিছু কাঠের গুঁড়া ছড়াইয়া রাখিতে হইবে। পরে একটী ব্লটীং কাগজ দুই ভাঁজ করিয়া সেই ভাঁজের মধ্যে পরীক্ষণীয় বীজগুলি রাখিয়া উক্ত কাগজটী পাত্রমধ্যস্থ কাঠের গুঁড়ার উপর বাখিতে হইবে। পরে পরিমিত জলদ্বারা উক্ত কাগজটী এমনভাবে ভিজাইয়া দিবেন যাহাতে কেবল কাগজটী সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া উঠে। এইরূপ করার পর পাত্রটী ঢাকা দিবেন। অন্ধকার স্থানে এইরূপ করিলে ভাল হয়। এই উপায়ে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইবে। ১০০টী বীজ গুণিয়া ব্যবহার করিলে শতকরা কত বীজ ভাল তাহার একটা মোটামুটী হিসাব পাওয়া যায়। কাঠের গুঁড়ার অভাবে তুষ বা কুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বীজ অধিক দিন ঘরে রাখা চলে না, কিন্তু অনেক সময় বীজ ৫।৬ মাস অথবা এক বৎসর পর্য্যন্ত ঘরে রাখিতে হয়। কারণ কোনও কোনও বীজ পক্ক হইবার

পর তাহা রোপণ করিবার সময় আসিতে প্রায় ৫।৬ মাস বিলম্ব হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়াই ঐ সমস্ত বীজ নির্দ্দিষ্ট কাল ঘরে রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ঐ বীজের উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ যদি বীজের আবরণ বা খোসা পাতলা হয়। সুতরাং বীজ রক্ষা বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বীজ সংগ্রহের পর উহা যেন বেশ করিয়া ঝাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। পরে ঠাণ্ডা হইলে উহা কোনও শিশি অথবা বোতলের মধ্যে পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখা উচিত। কারণ বীজ গরম থাকিতে শিশিতে পূরিলে বায়ু হইতে জলকণা জমিয়া সমস্ত বীজই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। শিশিটী কাল অথবা সবুজবর্ণের হইলেই খুব ভাল হয়। সাদা শিশিতে অনেক সময় বীজ খারাপ হইয়া যায়। শিশির মুখ এরূপভাবে বন্ধ করা উচিত যাহাতে উহার মধ্যে কোনরূপে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। বাতাস চলাচল করিলে বীজ সহজেই খারাপ হইয়া যায়। বীজের বোতলের মধ্যে ন্যাপথলিন ব্যবহার করিলে বীজে আর পোকা ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না। বীজ জমিতে বপন

বীজ রক্ষা করিবার প্রণালী

করিবার পূর্ব্বে খুব পাতলা তুঁতের জল অথবা লবণ-জলে ভিজাইয়া লইলে গাছে সহজে পোকা ধরিতে পারে না।

বায়ু, উত্তাপ ও জল এই তিনের সাহায্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বীজ বপন করিলে উহার উপরের আবরণ ফাটিয়া দুইটী অঙ্গ প্রকাশ হইয়া থাকে। একটী নিম্নভাগে মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে, অপরটী বীজ ও পত্র সমেত উর্দ্ধগামী হয়। মৃত্তিকা মধ্যে যে অংশ প্রবেশ করে উহা উদ্ভিদের মূল এবং যাহা উপরের দিকে উঠে উহাই কাণ্ড। কাণ্ডের উপরিভাগে শাখা-প্রশাখা থাকে। মৃত্তিকা হইতে রস ও অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহ করাই মূলের কার্য্য। মোটা শিকড়গুলি মাটি হইতে খাদ্য আহরণ করে না। ইহাদের সাহায্যে বৃক্ষ দৃঢ়ভাবে মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হয়। প্রধান বা মূল শিকড় হইতে অন্যান্য ছোট শিকড় বাহির হইয়া খাদ্য আহরণের নিমিত্ত মৃত্তিকার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকড়ও মাটির মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উপরে গাছের শাখা-প্রশাখা যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, নিম্নে মাটির মধ্যে শিকড়ও প্রায় ততদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সমস্ত উদ্ভিদের শিকড় আবার একরূপ নহে।

মূলের উৎপত্তি ও তাহার কার্য্য

কোনও কোনও উদ্ভিদের শিকড় চতুর্দ্দিকে বেশী বিস্তৃত না হইয়া মাটির নিম্নভাগেই বহুদূর প্রবেশ করে।

আবার অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের মূল শিকড় হইতে এককালে বহু সংখ্যক শিকড় চতুর্দ্দিকে বহির্গত হয়। এই সকল শিকড় আকারে প্রায় সমান। এইরূপ শিকড়কে তন্তুময় শিকড় কহে। পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতির শিকড় আঁশাল। মানকচু, ওল, গোল আলু প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের প্রধান মূলে ঐ সকল উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সামগ্রী সঞ্চিত থাকে। পুষ্প প্রসব করিবার সময় এই সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। এতদ্ভিন্ন তাদৃশ প্রধান মূল পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু উক্ত মূল প্রকৃতপক্ষে ঐ উদ্ভিদের অন্তর্ভৌম, অর্থাৎ মৃত্তিকার নিম্নস্থ কাণ্ড। ইহা হইতে বহির্গত ছোট ছোট শিকড়ই প্রকৃত শিকড়। কোন কোন গাছের মূল সেই সেই গাছের পোষণোপযোগী সামগ্রী ধারণের আধারের কার্য্য করে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উদ্ভিদের অপকারী পদার্থ মূলের দ্বারাও বহির্গত হইয়া যায়। আমাদের লোমকূপ দ্বারা যেরূপ ঘর্ম্মাকারে শরীরের অপকারী ক্লেদ বহির্গত হয় অনেকটা সেইরূপ। সাধারণতঃ শিকড় দিয়া উদ্ভিদের তিনটী মহৎ কার্য্য সমাধা হয়।

সেজন্য শিকড়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) মূল-কেশ (root-hair), (২) মূলখাপ (root-cap) ও (৩) সাধারণ শিকড় (ordinary roots)। মূলস্থিত কেশগুলি মাটির সহিত সংলগ্ন থাকে, ইহারাই মাটি হইতে উদ্ভিদ্-খাদ্য শোষণ করে। মূলখাপ—ইহাদিগের সূক্ষ্ম বর্দ্ধমান অগ্রভাগকে রক্ষা করে। মূলকেশে মাত্র একটী কোষ থাকে (unicellular) কিন্তু সাধারণ শিকড় বহু কোষ দ্বারা (multi-cellular) গঠিত। উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে অজৈব পদার্থ (inorganic substances) গ্রহণ করিয়া তাহাকে জৈব যৌগিক পদার্থে পরিণত করিয়া (complex organic substances) শরীরের নানা স্থানে প্রেরণ করে। বিশেষ বিশেষ বৃক্ষে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যে স্থানে সেই সেই পদার্থ পাওয়া যায় শিকড় বাছিয়া বাছিয়া সেই পদার্থের নিকট আসে। এইজন্য প্রত্যেক গাছের সার একরূপ হয় না। মূলের এই ক্ষমতাকে সন্ধান-শক্তি (selecting power) কহে। অসার উদ্ভিদের মূলকেশ হইতে একপ্রকার অম্লরস বাহির হয়। যে সমস্ত পদার্থ জলে দ্রব হয় না, উদ্ভিদ্ এই অম্লরসের সাহায্যে তাহাকে দ্রব করিয়া নিজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া লয়। ধাতুজ

পদার্থ মিশ্রিত জল, অন্তর্ব্বাহ প্রণালী দ্বারা (osmotic) মূলের ভিতর এক কোষ হইতে অন্য কোষে এবং পরে উর্দ্ধে প্রেরিত হয়। অন্তর্ব্বাহ (osmotic) প্রণালীর মূল-সূত্র হইতেছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুইটি বিভিন্ন গুরুত্ব বিশিষ্ট তরল পদার্থ একই ঘনত্বে পরিণত না হয় ততক্ষণ প্রত্যেক কোষের মধ্যে শোষণক্রিয়া চলে। উদ্ভিদ্-দেহেও মৃত্তিকাস্থ রস শিকড়ের মধ্য দিয়া ঠিক এই প্রকারে প্রবেশ করে। মূলকেশের ভিতর প্রাণপঙ্ক (protoplasm) দ্বারা প্রস্তুত শর্করা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ রস (cell sap) থাকে। বাহিরের মৃত্তিকা রস অপেক্ষা ইহাদের ঘনত্ব খুব বেশী। এই নিমিত্ত বাহিরের ধাতু মিশ্রিত জল কোষ চর্ম্ম ভেদ করিয়া বেশী পরিমাণে প্রবেশ করে। কিন্তু উদ্ভিদ্ রস সেই পরিমাণে খুব অল্পই বাহির হয়। ভূমির রস কোষ মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা বিস্ফারিত হয়। এইরূপ বিস্ফারিত হইলে সজীব প্রাণপঙ্ক একটু উত্তেজনা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কুচিত হয় এবং কোষ মধ্যস্থিত জল বাহির হইয়া পরবর্ত্তী কোষের সম্প্রসারণ ঘটায়। প্রাণপঙ্কের এই কুঞ্চন ও প্রসারণ (contraction and dilation) একই সময়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য একটী অবিচ্ছিন্ন জলস্রোত প্রবাহিত হয়। কুঞ্চন ও প্রসারণের সাহায্যে উর্দ্ধোত্থিত

জলস্রোত (ascending sap) একটী চাপ পায়। ইহাকে মূলের চাপ (root pressure) কহে। এই জলস্রোত আবার শোষণ ও চাপদ্বারা (suction and pull) কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে সূর্য্যালোক এবং বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এ্যাসিড গ্যাসের দ্বারা উহা প্রয়োজনীয় খাদ্যে পরিণত হয়। এই খাদ্য গাছের সবুজকণার (chlorophills) সাহায্যে প্রস্তুত হয় এবং সূর্য্যালোক এই সবুজকণা প্রস্তুত করণে প্রধান সহায় হয়। মাটির রস এবং বায়ু হইতে আহৃত অঙ্গার (carbon) এই দুই বস্তুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রথমে শর্করা ও পরে শ্বেতসার প্রস্তুত করে। এইরূপে উদ্ভিদ্ মাটি হইতে নানা অজৈব ধাতব ও যৌগিক রসায়ন পদার্থ শিকড় দ্বারা শোষণ করিয়া পরে পত্রের সাহায্যে পরিপাক করিয়া লয়। উক্ত জৈব খাদ্য প্রস্তুত হইলে উদ্ভিদ্ কোষের মধ্য দিয়া নানা বর্দ্ধিষ্ণু প্রদেশে উহা পৌঁছাইয়া দেয়।

কাণ্ডের আবশ্যকতা

কাণ্ড বৃক্ষের মেরুদণ্ড স্বরূপ। শাখা-প্রশাখা বাদ দিলে যে লম্বমান অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহার নামই কাণ্ড। অধিকাংশ উদ্ভিদের কাণ্ডই মাটির বাহিরে অবস্থান করে। কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট

এবং কতকগুলি শাখা-প্রশাখাবিহীন বা সরল হইয়া থাকে। কোনও কোনও উদ্ভিদের কাণ্ড কোমল আবার কতকগুলির কাণ্ড কঠিন হইয়া থাকে। কোমল কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি মাটির উপরে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না, উহাদিগকে লতানিয়া উদ্ভিদ্ বলা হয়। 'মূল' মাটি হইতে রস সংগ্রহ করে, কাণ্ড তাহা শোষণ করিয়া শাখা ও পত্রে পৌঁছাইয়া দেয়।

পত্রের কার্য্য

মানুষের যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস আবশ্যক হয় এবং উহার অভাবে যেমন মানুষ বাঁচিতে পারে না, উদ্ভিদ্‌ও সেইরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস না লইয়া বাঁচিতে পারে না। পত্র দ্বারাই উদ্ভিদ্ শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মূল দ্বারা আকৃষ্ট রস জীর্ণ করা ইহার আর একটি প্রধান কার্য্য। মানুষ যেমন খাদ্য হইতে দেহের উপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া, অতিরিক্ত পদার্থ মলাকারে ত্যাগ করে, পত্রও সেইরূপ উদ্ভিদের পোষণোপযোগী আবশ্যকীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত পদার্থ তরল অবস্থায় বাষ্পাকারে ত্যাগ করে। ইহা ব্যতীত পত্র বায়ু হইতেও আবশ্যক অনুযায়ী আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। দিবাভাগে পত্র সকল বায়ু হইতে প্রশ্বাসরূপে কার্ব্বনিক এ্যাসিড গ্যাস গ্রহণ করে এবং শ্বাসরূপে

অক্সিজেন বায়ু ত্যাগ করে, পরন্তু রাত্রিকালে ইহারা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্ব্বনিক এ্যাসিড গ্যাস ত্যাগ করে। উপরে এ বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে মাটির আবশ্যকতা ও তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। মৃত্তিকার অন্তর্গত উপাদান সমূহের

মৃত্তিকার বিভিন্নতা ও তাহার গুণ

গুণাগুণভেদে মৃত্তিকার অবস্থা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। সকল স্থানের মৃত্তিকার বর্ণ সমান নয়। স্থানভেদে মৃত্তিকার বর্ণ সাদা, লাল, হলদে, কাল বা মসিবর্ণের হইয়া থাকে। পাহাড়, পর্ব্বত ও প্রস্তরাদি শীত, তাপ, বায়ু, জল, বাষ্প প্রভৃতির ভৌতিক ক্রিয়াবলে চূর্ণীকৃত হইয়া প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও নিম্নভূমিতে আসিয়া স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে। উহাও মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া মাটির আকার ধারণ করিতেছে। ঐ সকল চূর্ণ মধ্যে বহুপ্রকার ধাতব ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। কোন স্থানে কোন পদার্থের আধিক্য এবং কোন স্থানে বা অল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য উহাদের গুণ ও শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থানে যে পদার্থ অধিক পরিমাণে জমে, সেই স্থানের মৃত্তিকা অনেকটা সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকায় সাধারণতঃ বালুকা, কর্দ্দম,

চূণ, উদ্ভিজ্জ এবং জীব পদার্থের সন্নিবেশ থাকে এবং এই পদার্থের কম-বেশী অনুসারে মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ভর করে।

যে মৃত্তিকায় বালুকা অধিক, তাহাকে—বেলে, যাহাতে কর্দ্দমের ভাগ অধিক তাহাকে—এঁটেল, যাহাতে চূণ অধিক তাহাকে—চূণ-প্রধান মাটি বলে। যাহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বেশী বিদ্যমান থাকে তাহাকে—জৈব মৃত্তিকা কহে। ওজন হিসাবে বেলেমাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভারী এবং উদ্ভিজ্জ মাটিই সর্ব্বাপেক্ষা হালকা। সমস্ত মাটিরই একটা স্বাভাবিক তাপ আছে এবং অল্পবিস্তর জল ধারণের ক্ষমতা আছে। বালুকার যোজনা শক্তি নাই ; অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেক কণাই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকে, একের সহিত অন্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং ইহার জল শোষণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও জল ধারণের ক্ষমতা মোটেই নাই। জল শোষণের ক্ষমতা যাহার যেরূপ বেশী, উত্তাপ শোষণের ক্ষমতা তাহার সেইরূপ কম। ইহা অল্প উত্তাপেই গরম হইয়া উঠে। সুতরাং বালির এই সমস্ত দোষ গুণ অল্লাধিক বেলে মাটিতেই বর্ত্তমান। জল ধারণের ক্ষমতা না থাকায় ইহা স্বভাবতঃ নীরস।

ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সমূহের সমন্বয়ে

কর্দ্দমের উৎপত্তি। কর্দ্দমের সূক্ষ্ম কণা সমূহ অতি ঘনভাবে সংলগ্ন থাকায় ইহার ধারণ শক্তি অধিক এবং শোষণ শক্তি অল্প। কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকা অধিক আঠাল এবং চট্চটে হইয়া থাকে এবং উহা সরস হইলেও ঘনত্ব এবং দৃঢ়তা নিবন্ধন উদ্ভিদের মূল সহজে ইহা ভেদ করিতে পারে না।

চূণের একটা স্বাভাবিক গুণ আছে যে উহা অধিক পরিমাণে জল শোষণ ও জল ধারণ করিতে পারে। চূণের এই সকল গুণ থাকায় ঘন আঠাল কিংবা বেলেমাটিতে পরিমিত চূণ মিশাইলে মৃত্তিকার সমস্ত দোষ দূরীভূত হইয়া জমি সরস হয় ও মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে।

জীব-জন্তু, গাছ-পালা, লতা-পাতা প্রভৃতি পচিয়াও মৃত্তিকার আকার ধারণ করে। উহাকেই উদ্ভিজ্জ বা জৈব মৃত্তিকা বলে। উক্ত চারি প্রকার মৃত্তিকার মাত্র কোন একটীতে উদ্ভিদ্ হৃষ্টপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না। উপরোক্ত চারি প্রকার পদার্থকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মৃত্তিকার কোন অস্তিত্বই থাকে না; এজন্য উক্ত চারিটী পদার্থের একত্র সমাবেশ আবশ্যক, কোন একটীকে বাদ দিলে চলে না। ইহাদের সংমিশ্রণে গঠিত

মত্তিকা হইতে উদ্ভিদ্ তাহার পোষণোপযোগী উপকরণ সকল পাইয়া থাকে। এখন কিরূপ জমি চাষের পক্ষে উপযোগী সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সব্জী চাষের জন্য উচ্চ জমির বিশেষ প্রয়োজন। যে জমিতে বর্ষার জল জমে সেইরূপ জমিতে সব্জী চাষ ভাল হয় না। সব্জী চাষের জমি নির্ব্বাচন করিবার সময় আর একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জমিতে যেন কোন প্রকার দীর্ঘ গাছের আওতা বা ছায়া না থাকে। সব্জী ক্ষেতের চতুষ্পার্শ্ব খোলা হইলেই ভাল হয়। যদি সেইরূপ জমির একান্ত অভাব হয় তবে, যে জমির অন্ততঃ পূর্ব্বদিক সম্পূর্ণ খোলা, সেইরূপ জমি নির্ব্বাচনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কারণ পূর্ব্বদিকের রৌদ্র, ফসলের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর, পড়ন্ত রৌদ্র না পাইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

জমি নির্ব্বাচন

ইহার পর জমির ফসল যাহাতে গরু মহিষ ছাগল প্রভৃতিতে নষ্ট করিতে না পারে সে বিষয়েও বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত। গরু ছাগল প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বেই জমির চারিধারে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন।

ক্ষেত্র সংরক্ষণ

ধনী ব্যক্তিগণ বেড়ার জন্য পাকা দেওয়াল দিয়া থাকেন। ডুরেণ্টা, পালতে মাদার, ইঙ্গাডালসিস্ প্রভৃতি বেড়ার বীজ বপন করিয়া গাছ জন্মিলে উহা দ্বারা বেড়ার কার্য্য চলিতে পারে। ইহার গাছ কাঁটাযুক্ত, সুতরাং ভালরূপে বেড়া দিলে গরু ছাগলের পক্ষে দুর্ভেদ্য হয়। ইহার বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া বেড়া প্রস্তুত করিতে এক বৎসর কাল সময় লাগে। উহাদের ডাল পুঁতিয়া গাছ জন্মাইতে পারা যায়। আজকাল অনেকে কাঁটা তার দিয়া বেড়া দিয়া থাকেন। শাল, জিয়াল অথবা অন্য গাছের মোটা খুঁটি ৪।৫ হাত অন্তর পুঁতিয়া পরে তাহাতে কাঁটা তার লাগাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেড়া প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া ভেরেণ্ডা, চিতা প্রভৃতি গাছ ও বাঁশের চটী দ্বারাও বেড়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ইহার পর যাহাতে শীঘ্রই জমি হইতে জল নিষ্কাষণ হইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, এজন্য জমি পাট করিবার সময় এক দিকে ঢালু রাখা আবশ্যক এবং সেই ঢালুদিকে পগার বা নালা রাখা উচিত।

জল নিকাশের ও জল সেচনের ব্যবস্থা

সব্জীক্ষেত্রে প্রায় সর্ব্বদাই জল দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সুতরাং জমির সন্নিকটে কূপ, পুষ্করিণী অথবা নল-

কূপ থাকা প্রয়োজন। জল দিবার সুব্যবস্থা না থাকিলে সব্জী চাষে সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। অনেক সময় জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলের অভাববশতঃ ফসল ভাল হয় না।

চাষের নিয়ম

জমি বড় হইলে তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের সব্জী বীজ বপন ও ফসল উত্তোলনের সময় অনুসারে সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিয়া শীতকালীন ফসল; যথা—ফুলকপি, বাঁধা-কপি, ওলকপি, বীট, শালগম, গাজর ইত্যাদি উত্তোলন করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে কার্ত্তিক হইতে পৌষের মধ্যে—লাউ, কুমড়া, কুলী-বেগুন, পটোল ইত্যাদি বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মকালে ফসল উত্তোলন করা যায়, এবং কতকগুলি, যথা—চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল প্রভৃতি গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বপন করিয়া বর্ষায় ফসল উত্তোলন করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটি ফসল উত্তোলন করিবার পূর্ব্বেই অন্য ফসল বপনের সময় আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং জমি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন স্থানেই ফসল দেওয়া উচিত। এইরূপ না করিয়া একই জমিতে এক বৎসর

দুই তিন প্রকার ফসলের চাষ দেওয়া উচিত নহে। কারণ কিছুদিন বিশ্রাম না দিয়া জমি হইতে ক্রমান্বয়ে ফসল উত্তোলন করিতে থাকিলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং অন্যবারের ফসল প্রথমবারের ন্যায় জন্মায় না। একারণ দুই তিন বারের উৎপন্ন ফসলের মূল্যও প্রথমবারের উৎপন্ন ফসলের মূল্যের সমান হয় না। সুতরাং একবার জমি হইতে ফসল উঠাইয়া লইবার পর জমিকে বিশ্রাম দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

কিরূপ জমি সব্জী চাষের উপযোগী

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সব্জী চাষের জন্য জমির জল নিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং এইজন্য জমি ঈষৎ ঢালু করিয়া লইতে হয়। এখন জমি কিরূপ পরিমাণে ঢালু করা আবশ্যক তাহাই বিবেচ্য। জমির অবস্থা বুঝিয়া এই ঢালুর পরিমাণ নির্ণয় করা উচিত। যে জমি বৃষ্টির কিছুকাল পরেই জল টানিয়া লয় এবং জমি শুষ্ক করিয়া ফেলে, সেই জমির ঢাল খুব সামান্য হইলেও ক্ষতি হয় না, অর্থাৎ যে জমির জল স্বাভাবিক উপায়ে নিষ্ক্রামণ হইয়া যায় তাহা খুব সামান্য ঢাল করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু যে জমির জল-নিষ্ক্রামণের শক্তি কম তাহার ঢাল বেশী করা উচিত। অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থা হয় যে, জমি

হইতে জল নিম্নে গিয়া জমাট ছিদ্রশূন্য শক্ত মাটির সংস্পর্শে আসিয়া তথায় জমিতে থাকে। অর্থাৎ জমির উপরিভাগে কোন জল দেখা যায় না। কিন্তু নিচের মাটি জমাট থাকায় তথা হইতে জল সরিতে দেরী হয়। এরূপ জমিকে চলতি কথায় 'জলবসা' জমি কহে। এইরূপ জমি সব্জী চাষের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এই জমিকে ঠিক অবস্থায় আনিতে হইলে ৩।৪ ফুট গভীর করিয়া ইহার মাটি খুঁড়িয়া উল্টাইয়া উপরের মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই প্রকারে জমির মাটি বার বার ওলটপালট করিলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জলবসা জমিতে কোন পাট না করিয়া তাহাতে চাষ করিলে ক্রমশঃ উপরের জমিও শক্ত ও খারাপ হইয়া যায় এবং জমি ঠিক করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

জমিকে চাষের উপযোগী করিতে হইলে উপর হইতে অন্ততঃ ২।৩ ফুট জমির সমস্ত মাটিকে বাতাস আলো ও রৌদ্র খাওয়ান উচিত এবং জমির মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করা বিধেয়। মাটি বিশেষভাবে চূর্ণিত না হইলে উহার মধ্যে যে সমস্ত মিশ্রিত উদ্ভিজ্জ খাদ্য থাকে, উদ্ভিদ্ তাহা ঠিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং ফসল ভাল হইতে পারে না। মাটিকে ২।১ দিনের মধ্যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া

চূর্ণ করিয়া ফেলিলে তাহাতে কাজ ভাল হয় না। ধীরে ধীরে একদিক্ হইতে কোপাইয়া তাহাকে উল্টাইয়া ৫।৬ দিন ধরিয়া রৌদ্র, আলো ও বাতাস খাওয়ান উচিত, এইরূপ ৫।৭ বার করিলে মাটি স্বাভাবিক ভাবেই চূর্ণ হইয়া যায় এবং সমস্ত মাটিতেই উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র, আলো ও বাতাস পায় বলিয়া ফসল আশানুরূপ হয়।

মাটিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—বেলে, দোআঁশ ও এঁটেল। বেলেমাটি সহজেই উত্তপ্ত হয় এবং জল পড়িলে জল শীঘ্র টানিয়া লয়। অধিকন্তু জল বা কোন প্রকার সার পদার্থ এই মাটিতে অধিক দিন থাকে না। ইহাতে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বালি থাকে। ফুটি, তরমুজ ও বর্ষার শাকসব্জী কেবলমাত্র এই মাটিতে জন্মিতে পারে।

বেলেমাটি

এঁটেল মাটি, বেলে মাটির সম্পূর্ণ বিপরীত, উহা সহজে উত্তপ্ত হয় না এবং উহার ধারণ-শক্তি, অর্থাৎ জল ধারণের ক্ষমতা অধিক। এই মাটি অত্যন্ত আঠাল এবং চট্‌চটে, ইহাতে ৫০ ভাগেরও অধিক এলুমিনা নামক শ্বেত ধাতব পদার্থের চূর্ণ মিশ্রিত থাকে। অন্যান্য মাটি অপেক্ষা এঁটেল মাটিতে

এঁটেল মাটি

এলুমিনা ও লৌহের ভাগ অধিক। ইহাতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বালি, ২॥ হইতে ৫ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ এবং নামমাত্র উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে। এঁটেল মাটির অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রগুলি অতি সূক্ষ্ম, তাহা দিয়া বৃষ্টির জল সহসা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। উহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অন্যান্য মাটি অপেক্ষা এঁটেল মাটিতে অধিক পরিমাণে জল সঞ্চিত থাকে। বর্ষাকালে এঁটেল মাটি জলসিক্ত থাকায় এবং মাটির আঠালতা ও ঘনত্ব নিবন্ধন ছিদ্রপথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সে সময়ে উক্ত জমিতে কোন ফসল ভাল হয় না। শীত ও গ্রীষ্মকালে উক্ত মৃত্তিকা শুষ্ক ও খট্‌খটে থাকে, সুতরাং শীত ও গ্রীষ্মের ফসল এঁটেল মাটিতে কিয়ৎ পরিমাণে জন্মাইতে পারা যায়।

উদ্যানের কার্য্য ও শাকসব্জীর চাষে দোআঁশ মাটি বিশেষ উপযোগী। দোআঁশ মাটিতে ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কর্দ্দম মাটি, ৫ ভাগ উদ্ভিজ্জ পদার্থ, ৫ ভাগ চূণ এবং অবশিষ্টাংশ বালি মিশ্রিত থাকে।

দোআঁশ মাটি

দোআঁশ মাটিতে বালির ভাগ অধিক থাকিলে উহা বেলে-দোআঁশ ও কর্দ্দম-মাটির ভাগ অধিক থাকিলে উহা এঁটেল-দোআঁশ নামে অভিহিত হয়।

প্রয়োজনানুসারে অনেক সময় জমির প্রকৃতি

বদলাইবার আবশ্যক হয়। এঁটেল মাটি হালকা করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাতে পরিমাণ মত বালি, পাতাসার, ছাই, চূণ প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বেলেমাটিকে দোআঁশ করিবার আবশ্যক হইলে উপযুক্ত পরিমাণে এঁটেল মাটি, ছাই, চূণ ও পাতাসার মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

কিরূপ জল সব্জী-চাষে উপকারী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সব্জীক্ষেত্রে রীতিমত জল সেচনের ব্যবস্থা না করিলে সব্জীর ফলন ভাল হয় না। এই জলের ব্যবস্থা সাধারণতঃ চারি প্রকারে হইতে পারে—কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী ও নদী। রৌদ্র ও বাতাস ভাল ভাবে না পাওয়ায় কূপের জল বিশেষ ফলদায়ক হয় না। তজ্জন্য অনেক স্থানে কূপের জল ব্যবহার করিবার সময়, কূপের নিকট হইতে ক্ষেত্রে জল দিবার যে নালা কাটা হয়, তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া পরে ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকারে জল কিছুক্ষণ রৌদ্রে ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া পরে ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, সুতরাং তাহার দূষিত ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। অনেকে জল উত্তোলন করিয়া কোনও বড় জলাশয় (tank) অথবা মাটির বড় গামলায় রাখিয়া পরে সেই জল ব্যবহার করিয়া

থাকেন। ইহাতেও জলের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। নলকূপের জলও কূপের জলের ন্যায় সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। তবে নলকূপের জল, কূপের জল অপেক্ষা অধিক উপকারী, কারণ উহাতে অনেক সময় উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। উপরোক্ত দুই প্রকার জল অপেক্ষা পুষ্করিণীর জল অধিকতর ফলপ্রদ, বিশেষতঃ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব যদি বৃক্ষবিহীন হয়। কারণ সর্ব্বদা রৌদ্রালোক ও বাতাসে উহার দূষিত অংশ সংশোধিত করিয়া থাকে। উল্লিখিত সমস্ত জল অপেক্ষা নদীর জলই সব্জীক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। কারণ তাহা নানাদেশ অতিক্রম করিয়া আসিবার সময় বহুপ্রকার উদ্ভিদ্-খাদ্য সংগ্রহ করে এবং নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ উহাতে সংযুক্ত থাকে। এইজন্য সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নদীর নিকটবর্ত্তী জমি, নদী হইতে দূরবর্ত্তী জমি অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরা এবং ফলদায়িনী হইয়া থাকে।

কি কি উপায়ে জমিতে জল সেচন করা যাইতে পারে

জলের উৎপত্তিস্থল ও তাহাদের গুণাগুণ বলা হইল কিন্তু কিরূপে ক্ষেতে জল সেচন করিতে হইবে তাহা এখনও বলা হয় নাই। অনেকে কলসী দ্বারা জল উত্তোলন

করিয়া ক্ষেতে দিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত বয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। সামান্য ২।৪ কাঠা জমি হইলে অবশ্য এইরূপে জল দেওয়া যাইতে পারে ও দেওয়াই সমীচীন কিন্তু জমির পরিমাণ বেশী হইলে, কলসী দ্বারা জল দেওয়া বহু ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া, এতদ্দেশীয় চাষীরা সিউনী ও ডোঙ্গাকল ব্যবহার করিয়া থাকে। সিউনী অথবা ডোঙ্গাকল হইতে যে স্থানে জল পড়ে তথা হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেতের সহিত সংযুক্ত রাখা হয়।

'সিউনী' ব্যবহার পল্লীগ্রামে প্রায় সকলেরই জানা আছে। এই সিউনীর মাথায় ও গোড়ায় দড়ি অথবা বেত বাঁধিয়া দুইজন লোকে ইহাদ্বারা জল উত্তোলন করিয়া থাকে এবং তাহারা ঘণ্টায় ১০।১২ শত গ্যালন জল অনায়াসে তুলিতে পারে। এই উপায়ে ৬।৭ ফিট নিম্ন হইতেও জল তুলিতে পারা যায়।

দোন বা ডোঙ্গাকলের ব্যবহারও বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। ইহাতে ৪।৫ ফিট নিম্ন হইতে জল তুলিতে পারা যায়। তালগাছের গোড়ার দিক্ লইয়া তেলো ডোঙ্গা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহার গোড়ার অংশ জলের দিকে রাখিয়া, ডোঙ্গার দুই পার্শ্বে দুইটী বাঁশ পরস্পরের দিকে হেলাইয়া, পুঁতিয়া, উহাদের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া

বাঁধিয়া দিতে হইবে, পরে হেলান বাঁশের মাথার উপরে একটি আস্ত বাঁশ স্থাপন করিয়া বাঁশের একদিক্ মোটা শক্ত দড়ির সহিত বাঁধিয়া সেই দড়ি খানিকটা লম্বাভাবে ঝুলাইয়া তালগাছের গোড়ার (যে দিক্ জলের দিকে অবস্থিত) সহিত উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেন খুলিয়া না যায়। বাঁশটীর অপর দিকে কতকগুলি ইটপাটকেল, পাথর বা কোন ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া দিতে হইবে। জল তুলিবার সময় ডোঙ্গার মোটা দিক্ জলে ডুবাইয়া আস্তে আস্তে দড়ি ধরিয়া টানিয়া তুলিলেই,অপর দিক্ দিয়া সমস্ত জল ডোঙ্গা হইতে বাহির হইয়া জমিতে গড়াইয়া পড়ে। অপর দিকে বাঁশের সহিত বা পাথর বাঁধা থাকায় জল টানিয়া তুলিবার সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। অধিক জমিতে বেশী পরিমাণে জল সেচনের আবশ্যক হইলে উপরোক্ত উপায়ে জল সেচন করা যাইতে পারে। তেলো ডোঙ্গার অনুকরণে আজকাল লৌহ চাদরের হালকা ও কার্য্যকরী ডোঙ্গা খরিদ করিতে পাওয়া যায়।

অনেকে মেসিন পাম্প দ্বারা জল ব্যবহারের বিধি দিয়া থাকেন, কিন্তু পাম্পের কলকজা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিলে পাম্প ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহারকালে উহা হঠাৎ খারাপ হইয়া

গেলে মেরামত করা বিশেষ কষ্টকর হয় এবং জল দিবার অন্য ব্যবস্থা না থাকিলে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

ককগিয়ার, মায়া প্রভৃতি পাম্পের যন্ত্রপাতি খুব সরল। এই পাম্প দ্বারা ২৫ ফিট নিম্ন হইতে প্রতি ঘণ্টায় ২০০০ দুই হাজার গ্যালন জল তুলিতে পারা যায়।

সারের আবশ্যকতা

মানুষ ও জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ্গণও আহার করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ ভূমি হইতে আহার করিয়া পরিপুষ্ট ও ফলবান হইয়া থাকে। যে ভূমিতে উদ্ভিদের আহার্য্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে সেই স্থানের উদ্ভিদ্ বিশেষ ফলবান হইয়া থাকে। ভূমি হইতে আহারোপযোগী খাদ্য না পাইলে উদ্ভিদ্গণ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যে ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্য থাকে না তাহা উষর জমি নামে অভিহিত হয়। উষর ভূমি উর্ব্বর করিতে হইলে জমিতে উদ্ভিদ্-খাদ্যের সংমিশ্রণ করা আবশ্যক। যে দ্রব্যের সংমিশ্রণে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহাকে সার বলা হয়। চলিত কথায় গাছের খাদ্যকেই সার বলে। অনেক দিন হইতেই

আমাদের বাঙ্গালা দেশ সুজলা সুফলা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আজ সেই বাঙ্গালা দেশ পাশ্চাত্ত্যের অনেক কুফলা প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম ফসল উৎপাদন করে। তাহার কারণ আমরা জমি ভালভাবে কর্ষণ করি না এবং জমি হইতে যতবার ইচ্ছা ফসল তুলিতে যাই, জমিতে রীতিমত সার প্রয়োগ করি না। কোন জমিতেই অফুরন্ত খাদ্য থাকে না। একবার ফসল উঠাইয়া লইলে জমিতে উদ্ভিদের খাদ্যাংশ কমিয়া যায়। মৃত্তিকামধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকিলেও অধিকাংশ খাদ্যই অদ্রবণীয় ভাবে অবস্থান করে। আবার দ্রবণীয় খাদ্যের কিয়দংশ বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়। এজন্য জমিতে সার প্রয়োগ প্রয়োজন। সার ও জল প্রদান ভিন্ন জমি উত্তমরূপে ও গভীরভাবে কর্ষণ করাও বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ইহাতে উদ্ভিদের মূল, বৃদ্ধি ও বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। সুকর্ষিত ভূমিতে জল ও বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে এবং তজ্জন্য মৃত্তিকার মধ্যস্থিত অনেক পদার্থ দ্রবণীয় হইয়া থাকে। এইরূপে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়।

পটাস, ফস্ফরাস, নাইট্রোজেন প্রভৃতি উদ্ভিদের আহার্য্য সামগ্রী। বাঙ্গালীর যেমন প্রধান খাদ্য ভাত, উদ্ভিদ্‌গণেরও

সেইরূপ প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন। ভাতের সঙ্গে যেমন আমাদের মোটামুটী তরকারী আবশ্যক, উদ্ভিদেরও তেমন ফস্ফরাস ও পটাস আবশ্যক। ইহা ছাড়া অঙ্গার, চুণ, বালি, লৌহ প্রভৃতি উদ্ভিদের সামান্য পরিমাণে আবশ্যক হয়, ইহা মৃত্তিকা মধ্যেই উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্য, সকল সময় জমিতে দিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। পটাস, ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেনই উদ্ভিদের মুখ্য বা প্রধান খাদ্য এবং অন্যগুলি গৌণ খাদ্য।

খাদ্যের গুণাগুণ

নাইট্রোজেন-যুক্ত সার, গাছের বর্দ্ধনের সহায়তা করে, পটাস-যুক্ত সার আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করাইয়া উদ্ভিদ্‌কে সবল রাখে। ফস্ফরাস সার গাছের ফুল ও ফলের অংশ বাড়াইয়া সেগুলি পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। জমিতে উক্ত তিনটী দ্রব্যের অভাব হইলে তাহা সার প্রয়োগে পূরণ করা একান্ত আবশ্যক।

সার কয় প্রকার ও কি কি

সার সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—উদ্ভিজ্জ সার, প্রাণিজ্জ সার, খনিজ সার, মৃত্তিকা সার ও মিশ্রিত সার। ইহার মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ্জ সার জমি ও গাছের উপকার করে

কিন্তু খানিজ সার, জমি অপেক্ষা গাছের উপকার বেশী করে।

উদ্ভিদ্ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাকে উদ্ভিজ্জ সার বলে। বৃক্ষের পত্র ও শাখা হইতে অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। শীতকালে যখন বৃক্ষের পত্রাদি পড়িয়া যায় তখন ঐ পত্র সংগ্রহ করিয়া একটি গর্ত্তে ফেলিয়া রাখিতে হয়। গ্রীষ্মকালে উক্ত পাতায় মধ্যে মধ্যে জল দিলে পচনক্রিয়া শীঘ্র হইয়া থাকে। এই ভাবে গর্ত্তের মধ্যে ৭৷৮ মাস রাখিলে পত্র পচিয়া সাররূপে পরিণত হয়। সর্ব্বপ্রকার বীজ বপনের সময় এই সারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এঁটেল ও বালি মাটিকে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্যও ইহা আবশ্যক হইয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জ সার

এই সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত, নচেৎ অনেক স্থলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিয়া থাকে। পাতা পচিবার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার পোকা জন্মায়। এজন্য পচা পাতা প্রথমে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে গুঁড়াইয়া চালনির দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। চালনিতে ছাঁকার আর একটী গুণ এই যে, অনেক সময় পাতার সমস্ত অংশ ঠিকভাবে পচে না। ছাঁকার

সঙ্গে সঙ্গে সেই অব্যবহার্য্য অংশগুলি বাহির হইয়া আসে। সেইগুলি নষ্ট না করিয়া পুনরায় গর্ত্তে ফেলিয়া রাখিলে তাহা আবার সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কলাপাতা বা পেঁটো, বাঁশপাতা, তেঁতুলপাতা ও ঝাউপাতা হইতে সার প্রস্তুত হয় না, কারণ উহাতে ক্ষার থাকে।

উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে সবুজ সারও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ইহাকে green manure কহে। এই সার প্রয়োগ করিবার নিয়ম এই যে, জমি চাষের জন্য প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন একটী বিশেষ ফসল চাষ করা হয়, পরে ইহা ফসলের পূর্ব্বেই মাটির সহিত চষিয়া দেওয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায় ও সুন্দর সাররূপে পরিণত হয়। এই সারের জন্য সাধারণতঃ ধইঞ্চা, শোণ, মটর, অড়হর, বরবটী প্রভৃতি শুঁটিযুক্ত ফসলের চাষ করা যাইতে পারে। এই প্রকার সারে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হয়। সবুজ সার প্রতি বৎসর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহা এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর অন্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যাবতীয় উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে কেবল খইল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সব্জীচাষের বিশেষ উপযোগী। সরিষা, রেড়ি, নারিকেল,

তিল, চিনাবাদাম, তুলা, তিসি, নিম ইত্যাদি নানাজাতীয় পদার্থ হইতে খইল পাওয়া যায়। এই সমস্ত খইলের মধ্যে রেড়ির ও সরিষার খইলের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত। যে খইলে তৈলের পরিমাণ কিছু বেশী থাকে সেই খইল মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে।

অনেকে খইল কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করেন কিন্তু তাহাতে অনেক সময় সুফল না হইয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে। খইল পচিবার সময় তাহা হইতে উত্তাপ নির্গত হয়। জমিতে ব্যবহার করিবার পর যদি খইল পচে তাহা হইলে ঐ উত্তাপে অনেক বৃক্ষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে অথবা মারিয়া ফেলে, সুতরাং জমিতে খইল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহা কোনও পাত্রে ভিজাইয়া পচাইয়া লওয়া উচিত। যদি পচাইয়া ব্যবহার করিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে খইল গুঁড়া করিয়া কর্ষিত জমিতে ছড়াইয়া দিয়া তাহা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হয়। তাহার পর জল সেচন করিয়া উক্ত মৃত্তিকা ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। এই অবস্থায় কয়েক দিন রাখিলে খইলের তেজ কিছু কমিয়া যায়, সুতরাং তখন চারা রোপণ করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। খইল পচিতে সাধারণতঃ ১৪।১৫ দিন সময়

লাগে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অল্পদিনের মধ্যেই উহা পচিয়া যায়।

কাঠের ছাইও উদ্ভিজ্জ সার মধ্যে পরিগণিত। যে সমস্ত সজীর মূল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের পক্ষে কাঠের ছাই উত্তম সার। ইহা ছাড়া কপি প্রভৃতি চাষের জমিতে চাষের একমাস পূর্ব্বে ছাই মিশ্রিত করিয়া রাখিলে ফসলে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কম হয় এবং ফসল অপেক্ষাকৃত তেজাল হয়।

ইহা ছাড়া কচুরী ও বিবিধ পানা, শ্যাওলা প্রভৃতি পোড়ান ছাই অনেক স্থলে সজী সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সজীর খাদ্য হিসাবে ইহার কোনটীই একেবারে নগণ্য নহে।

মৃত পশু-পক্ষীর দেহ পচিয়া বিকৃত হইলে তাহা অতি উত্তম সাররূপে পরিগণিত হয়। মৃতজন্তুর দেহ কোন গর্ত্তে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরে সেই মাংস ও হাড় পচিয়া গলিয়া সাররূপে পরিণত হইয়া থাকে। প্রাণিজ সারের মধ্যে প্রাণীর মাংস অপেক্ষা অস্থিই বহুল পরিমাণে সাররূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই অস্থি কলে পেষণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলা হয়। এই অস্থিচূর্ণ সজী চাষে খুব বেশী

প্রাণিজ সার

প্রয়োজন হয় না। যে সমস্ত উদ্ভিদের মূল মাটির মধ্যে জন্মে সেই সমস্ত উদ্ভিদের চাষে অস্থিচুর্ণের ব্যবহার অধিক ফলপ্রদ। অস্থিচুর্ণসার, কলিকাতা বা অন্য বড় বড় নগরীতে সার ব্যবসায়ী বা কৃষিদ্রব্য বিক্রেতাদিগের নিকটও পাওয়া যায়।

রক্তও উত্তম সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কসাইখানায় প্রাপ্ত শুষ্ক রক্ত য়ুরোপে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এই সার সত্বর বৃক্ষগণের গ্রহণোপযোগী হইতে পারে। কোন একটি টিনে অথবা অন্য পাত্রে কাঁচা রক্ত ধরিয়া রাখিয়া উহার সহিত ৩।৪ গুণ চূণ মিশাইয়া শুকাইয়া রাখিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত একই ভাবে থাকিতে পারে এবং উহার গুণও সহজে নষ্ট হয় না। উক্ত সারের সহিত ৮।১০ গুণ জল মিশাইয়া ফলবৃক্ষে সাররূপে ব্যবহার করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পচা মৎস্যও নাইট্রোজেন-প্রধান অতি উৎকৃষ্ট সার। ইহাও শীঘ্র গলিত হইয়া বৃক্ষাদির গ্রহণোপযোগী হইতে পারে। পচা মৎস্য অন্য কোন স্থানে গর্ত্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরে পচিয়া গলিয়া মাটির আকারে পরিবর্ত্তিত হইলে সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

খনিজ সারের মধ্যে সোরা, লবণ ও চূণই প্রধান। সোরা একটি বিশেষ সারের মধ্যে গণ্য। আমাদের দেশে সাধারণতঃ অনেক স্থানে সোরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছাই সার যেমন মাটিতে স্থায়ীভাবে থাকিয়া কার্য্য করে, সোরা সেরূপ নহে। উহা অস্থায়ী সার কিন্তু অতি শীঘ্র কার্য্যকরী হয়। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে অথবা চারা বাহির হইবার পর উহা জমিতে ছড়াইয়া দিয়া জল সেচন করা আবশ্যক, নতুবা উহার কোন উপকারিতা পাওয়া যায় না।

খনিজ সার

লবণের মধ্যে উদ্ভিদের কোন প্রকার খাদ্য নাই। তাহা সত্ত্বেও উহা সাররূপে ব্যবহারের বিধি আছে। কারণ ইহার সাহায্যে জমির অনেক পদার্থ শীঘ্র বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহারোপযোগী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লবণ প্রয়োগে জমির অনেক কীট-পতঙ্গাদিও মারা যায়। লবণ প্রয়োগকালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। গাছের মূলদেশে অথবা পাতায় লবণ পড়িলে উহার বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। বীট, পালম প্রভৃতি সব্জী চাষে এবং নারিকেল, লেবু প্রভৃতি ফলের গাছে লবণ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

খনিজ সারের মধ্যে চূণ বিশেষ প্রয়োজনীয় সার, ইহা

মাটির অনেক দোষ সংশোধন করে। মাটি শুষ্ক হইয়াগেলে বায়ু হইতে রস সংগ্রহ করিয়া ইহা মাটিকে ভিজা রাখে। বহুকালের পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা সেই জমি উত্তমরূপে কর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে চূণ প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল ফসল বেলেমাটিতে অথবা দোআঁস মাটিতে ভাল হয় তাহাতে চূণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ৬।৭ সের ঝুরা চূণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। প্রতি ৪।৫ বৎসর অন্তর জমিতে চূণ ব্যবহার করা আবশ্যক।

উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ সারের সংমিশ্রণে যে সার প্রস্তুত হয় তাহাকে মিশ্রিত সার কহে। এই কয়প্রকার সার ব্যতীত

মিশ্রিত সার

আর একপ্রকার সার বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। উহা পশু-পক্ষাদির মলমূত্র। অনেকে ইহাকে মিশ্রিত সারের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এই সমস্ত সারের মধ্যে সব্জী চাষের জন্য প্রধানতঃ গোবরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে চোনা (গো-মূত্র) মিশ্রিত গোবর লবণাক্ত হইয়া থাকে এবং তাহা ফসলের ক্ষতিকারক কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক। গোময় অপেক্ষা গোমূত্র আরও উৎকৃষ্ট সার। গোবর না পচাইয়া কখনও

ব্যবহার করা উচিত নহে। টাটকা গোবর ব্যবহার করিলে জমিতে নানাপ্রকার পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হইয়া থাকে এবং তাহাতে ফসলের অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া সন্থ গোবরের তেজ চারা গাছ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং গোবর ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা ভালরূপে পচাইয়া লওয়া উচিত। নিম্নলিখিত উপায়ে গোবর পচাইলে সুফল পাওয়া যায়। প্রথমে যত গোবর সংগ্রহ করা হইবে সেই অনুপাতে একটি গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের তলায় ইট বিছাইয়া তাহার উপর কিছু পুরু করিয়া ছাই ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরে উহাতে সমস্ত গোবর ঢালিয়া দিতে হইবে। ৫।৬ মাস এইরূপে থাকিবার পর গোবর পচিয়া কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে।

গোময় অপেক্ষা ঘোড়া ও ছাগলের নাদি তেজস্কর সার। ইহা অপেক্ষা পক্ষীর বিষ্ঠা আরও উৎকৃষ্ট সার। গৃহপালিত হাঁস, মোরগ, পারাবত প্রভৃতির বিষ্ঠা, যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া পচাইয়া জমিতে দিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। সজ্জী বাগান অপেক্ষা ফুলের বাগানে উক্ত সার প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

গোময়ের ন্যায় গোমূত্র এবং মহিষ, ঘোড়া, মেষ ও ছাগলের মূত্রও অতি তেজস্কর সার। অনেকের বিশ্বাস

মূত্র সাররূপে ব্যবহার করিলে গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভুল ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। সদ্য সংগৃহীত মূত্র ব্যবহার করিলে গাছপালা উহার তেজ সহ্য করিতে পারে না, একথা সত্য। এইজন্য ইহার সহিত অন্ততঃ ১০।১২ গুণ জল মিশ্রিত করিয়া জমিতে ব্যবহার করা উচিত। ঘোটক, গর্দ্দভ, গরু, মেষ, ছাগল ও মহিষাদির মূত্র কোন পাত্রে করিয়া ধরিয়া রাখা যায় না, কারণ উহারা কখন মূত্রত্যাগ করিবে বলা যায় না, এজন্য গোয়াল বা আস্তাবলে কিছু পুরু করিয়া কাঠের বা ঘুঁটের ছাই বিছাইয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতির মূত্র অনর্থক নষ্ট হইতে পারে না। মূত্রত্যাগ করিলে, ছাই থাকায় উহা সমস্ত শুষিয়া লয়। ২।১ দিন অন্তর ঐ সমস্ত ছাই সংগ্রহপূর্ব্বক একস্থানে জড় করিয়া রাখা যাইতে পারে। কিছুদিন পরে উহার তেজ কমিলে জমিতে ব্যবহার করা আবশ্যক। টাটকা মলমূত্রের সার ব্যবহারে একটী বিশেষ ভয় এই যে, উহাতে নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গাদি জন্মিতে বা থাকিতে পারে। জমিতে প্রয়োগ করিলে উহা ক্ষেত্রের ফসলের অনিষ্ট করিয়া থাকে। এইজন্য ঐ সমস্ত সার পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত। পচাইবার সময় কিছু ঝুরা চুণ ও সামান্য

তুঁতে উহার সহিত মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

উপরোক্ত সার ছাড়া রান্নাঘরের বা কলের ঝুলও সব্জী ক্ষেতের বিশেষ উপকারী সার। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে জলে ভিজাইয়া সেই জল জমিতে ছিটান আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকাও আমাদের দেশে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পাঁক মাটির ও পোড়া মাটির প্রচলনই অধিক। বৃক্ষের শাখা পত্রাদি, জলজ উদ্ভিদের ও জলজন্তু সমূহের গলিত অংশ বা ধ্বংসাবশেষ হইতে সাধারণতঃ পুষ্করিণীর পাঁকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে বৃক্ষের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এই পাঁক রৌদ্রে না শুকাইয়া জমিতে ব্যবহার করা কোনক্রমেই উচিত নহে। কারণ ইহার মধ্যে কতকগুলি দূষিত দ্রব্য থাকে যাহা রৌদ্রে না শুকাইলে সংশোধিত হয় না বরং সব্জীর সমধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

পোড়া মাটিও আমাদের দেশে একটি বিশেষ সার বলিয়া ব্যবহৃত হয়। পুরাতন চুল্লীর মাটি অনেক গাছের গোড়ায় ব্যবহারে গাছ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজাল হইতে দেখা গিয়া থাকে। বহুল পরিমাণে চাষের জন্য এইরূপ

মাটি সদাসর্ব্বদা পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে ইহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে অতি সহজেই ইহা প্রস্তুত করা যায়। মাটি সমেত কতকগুলি ঘাসের চাপড়া সংগ্রহ করিয়া প্রথমে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। পরে উহা পাঁজার আকারে তৃণাদির সহিত সাজাইয়া ইষ্টকের পাঁজার ন্যায় মাটি দিয়া লেপিয়া উহার তলদেশে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিতে হয়। অগ্নি যাহাতে কোনক্রমে জ্বলিয়া না উঠে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইরূপে গুমোট ভাবে জ্বলিয়া ভিতরস্থ তৃণাদি পুড়িয়া গেলে উৎকৃষ্ট সারের পোড়া মাটি প্রস্তুত হয়। এই মাটি কয়েক দিন ফেলিয়া রাখিয়া পরে জমিতে ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যায়। অধিক পুরাতন দেওয়ালের ভিটামাটি বা পোড়ামাটি সব্জী ক্ষেতের উত্তম সার।

উপরে নানাবিধ জৈব সারের কথা বলা হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি অজৈব বা রাসায়নিক সারের বিষয় লিখিত হইল। যাঁহারা উপরোক্ত সার সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য মনে করেন, তাঁহারা বাজার হইতে রাসায়নিক সার ক্রয় করিয়া জমিতে ব্যবহার করিতে পারেন। উদ্ভিদ্‌গণের প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাস তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

নিম্নে কয়েকটী নাইট্রোজেন, ফস্ফেট ও পটাস-প্রধান রাসায়নিক সারের কথা লিখিত হইল।

সারের নাম	প্রধান উপাদান
(১) সালফেট অফ এমোনিয়া	নাইট্রোজেন।
(২) নাইট্রেট অফ সোডা	নাইট্রোজেন।
(৩) ক্যালসিয়াম সায়ানাইড	নাইট্রোজেন।
(৪) নাইট্রেট অফ পটাস	নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম।
(৫) সালফেট অফ পটাস	পটাসিয়াম।
(৬) ক্লোরাইড অফ পটাস	পটাসিয়াম।
(৭) অস্থিচূর্ণ বা বোনমিল	ফস্ফরাস।
(৮) রক ফস্ফেট	ফস্ফরাস।
(৯) সুপার ফস্ফেট	ফস্ফরাস।

সালফেট অফ এমোনিয়া ঃ—ইহাতে শতকরা ১৯।২০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। জমিতে চূণের ভাগ না থাকিলে ইহার ক্রিয়া সুবিধাজনক হয় না। আবার সদ্য চূণের সহিত উক্ত সার সংমিশ্রণে সালফেট অফ এমোনিয়ার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য উক্ত সার প্রয়োগ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে জমিতে চূণ দেওয়া আবশ্যক। ঝুরা চূণই ব্যবহার করা প্রশস্ত। ইহাতে নাইট্রোজেন, এমোনিয়া আকারে

থাকে বলিয়া সালফেট অফ এমোনিয়ার ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে উহা জমিতে ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহার গুণ সহজে নষ্ট হয় না এবং জমিতে ইহা স্থায়ীভাবে কার্য্য করে। বর্ষার জলেও এই সার নষ্ট হয় না বা ধুইয়া যায় না। সেইজন্য বর্ষার ফসলে এই সার বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

নাইট্রেট অফ সোডা :—ইহাতে শতকরা ১৫।১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। সালফেট অফ এমোনিয়াতে নাইট্রোজেন এমোনিয়া আকারে থাকে সেজন্য উহার কার্য্য অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে; কিন্তু নাইট্রেট অফ সোডাতে নাইট্রোজেন নাইট্রেট আকারে থাকায় জমিতে প্রয়োগ করিলে সদ্য সদ্য ফসলের উপকারে আসে। সালফেট অফ এমোনিয়া ব্যবহার করিলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করে অধিকন্তু খারাপ করে না; কিন্তু নাইট্রেট অফ সোডা দ্বারা অধিক ফসল উৎপন্ন হইলেও ক্রমাগত ব্যবহারে জমি খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। বৃষ্টির জলে ইহার সার অংশ ধুইয়া চলিয়া যায়। এজন্য যে ফসলে অধিক জলের আবশ্যক হয় না সেরূপ উদ্ভিদের চাষে ইহার ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত।

নাইট্রেট অফ পটাস :—ইহাতে শতকরা ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩০ ভাগ পটাস থাকে। ইহা সাধারণতঃ বারুদের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় অথচ উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনে ইহা সারের মধ্যে অন্যতম। ইহা প্রয়োগে উদ্ভিদ্ সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জমিতে ইহা প্রয়োগ করিবার পর জল সেচন আবশ্যক। ইহা গাছের গায়ে যাহাতে না লাগে সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

সালফেট অফ পটাস :—ইহাতে শতকরা প্রায় ২৫।২৬ ভাগ পটাস থাকে। কতকগুলি ফসলে পটাসের বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে এবং কতকগুলি সব্জীতে পটাস ব্যবহার করিলে কুফল ফলে।

অস্থিচূর্ণ :—ইহাতে শতকরা ২০ ভাগ ফস্ফরাস ও প্রায় ৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। পশু-পক্ষীর হাড় চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। অন্য ফসল অপেক্ষা যে সমস্ত উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার মধ্যে জন্মায় তাহাদের চাষে ইহা অধিক আবশ্যক। রকফস্ফেট অপেক্ষা ইহা শীঘ্র কার্য্যকরী।

রকফস্ফেট :—ইহা একরূপ পাথরের গুঁড়া হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাতে ফস্ফরাসের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ। ইহা খুব মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিতে হয়। জমিতে প্রয়োগ করিবার পর অনেক বিলম্বে

ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। সেইজন্য বীজ বুনিবার অনেক পূর্ব্বে ইহা জমিতে দেওয়া আবশ্যক।

সুপার ফস্ফেট ঃ—ইহাতে শতকরা ২০।২২ ভাগ ফস্ফরাস থাকে। রকফস্ফেটের মধ্যে যে ফস্ফরিক এসিড থাকে তাহা জলে গলে না, উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসিলে মূলদ্বারা গলাইয়া উদ্ভিদ্ উহা হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুপার ফস্ফেটে যে ফস্ফরিক থাকে তাহা জলে দ্রবণীয়। ইহা খুব দ্রুত কার্য্যকরী হয়।

বীজ বপন করিবার সঙ্গে অথবা চারা বাহির হইবার পরও ইহা জমিতে ব্যবহার করা চলে। জমিতে রস কম থাকিলে ফস্ফরিক এসিড তাহা পূরণ করিয়া লয়। অধিক বর্ষাতেও ইহার গুণ নষ্ট হয় না। চূণের সহিত ইহার বিরোধ। জমিতে ফস্ফরাসের পরিমাণ কম থাকিলে গাছের ফুল-ফলের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এজন্য জমিতে ফস্ফরাসের একান্ত প্রয়োজন।

কতকগুলি সার আছে যাহাদের একের সহিত অন্যের মিল নাই। দুইটীর একত্র সংমিশ্রণে পরস্পরের গুণ নষ্ট করে, যেমন চূণের সঙ্গে খোল, গোবর, পাতাসার এবং সালফেট অব এমোনিয়া। সালফেট অব এমোনিয়া ও খোলের সহিত রক ফস্ফেটের মিল নাই। পতিত অবস্থায়

অথবা চাষের ২।১ মাস পূর্ব্বে জমিতে চূণ ব্যবহার করা উচিত। জমিতে চূণ (slaked lime) প্রয়োগের পর ইহার তীব্রতা নষ্ট হইলে অথবা মাটির সহিত উহা উত্তমরূপে মিশিয়া যাইবার পর উহার সহিত আর অন্য কোন সারের বিরোধ থাকে না।

এখন হাপোরে কিরূপে চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় সে বিষয়ে বলা হইবে। অনেক সব্জীরই বীজ এক স্থানে ফেলিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া পরে তাহা অন্য স্থানে নাড়িয়া লাগাইতে হয়। যে স্থানে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে বীজতলা বা হাপোর বলে। হাপোরের জন্য স্থান নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যেখানে-সেখানে হাপোরের জমি মনোনীত করিলে তাহাতে বীজ ভালরূপ অঙ্কুরিত হয় না এবং অঙ্কুরিত চারা অনেক সময় সতেজ হয় না। অনেক সময় অঙ্কুরিত চারাগুলি পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। হাপোরের জমি নির্ব্বাচন ঠিক না হইলে কেবলমাত্র সার দ্বারা এই সকল দোষ সংশোধন করা যায় না।

হাপোর প্রস্তুত প্রণালী

হাপোরের জমির চতুষ্পার্শ্ব উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

প্রয়োজন অনুসারে উপরে হোগলা বা সুবিধামত দ্রব্য দ্বারা ছাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। যতদিন চারা ক্ষুদ্র থাকে এবং রৌদ্র, বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম না হয় ততদিন আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। হাপোরের জন্য ক্ষেতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ জমি নির্ব্বাচন করা উচিত। জলবসা জমি হাপোরের জন্য নির্ব্বাচন করা অনুচিত। হাপোরের নিকটে যাহাতে কোন প্রকার জঙ্গলাদি না থাকে সে বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ নিকটে জঙ্গলাদি থাকিলে পোকা-মাকড় আসিয়া চারার অনিষ্ট করিতে পারে।

হাপোরের জমি দৈর্ঘ্যে ৫ হাত এবং প্রস্থে দুই হাতের অধিক না হাওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন অনুসারে দৈর্ঘ্যে ইহা অপেক্ষাও কমান যাইতে পারে কিন্তু প্রস্থে ইহা অপেক্ষা অধিক না কমাইলেই হয়। এইরূপে জমি নির্ব্বাচন করিয়া সেই জমি হইতে ৯ ইঞ্চি মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে উহার নিম্নভাগ ঝামা অথবা শক্ত মাটি দ্বারা ৪ ইঞ্চি আন্দাজ সমস্ত স্থান ভরিয়া ফেলা উচিত। ইহার পর উক্ত স্থানটি হালকা দোআঁশ ঝুরা মাটি দ্বারা ভরিয়া দেওয়া আবশ্যক। হাপোরের চতুষ্পার্শ্বে শক্ত মাটি থাকা প্রয়োজন এবং লম্বাদিকে একটু ঢাল

রাখিলে ভাল হয়। হাপোরের উপরে যে মাটি ভরিয়া দেওয়া হইবে তাহা ধূলার ন্যায় গুঁড়া করিয়া ইহাতে যে সার মিশ্রিত করিতে হইবে তাহাও সরু চালনি দ্বারা চালিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। এই মাটি দোআঁশ হওয়া আবশ্যক। পাতা-সার ও পুরাতন গোবর সার ইহার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। মাটি একটু চাপিয়া দেওয়া দরকার।

বীজ বপন প্রণালী

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সজ্জী চারা সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যে স্থানে বীজ বপন করা হয় সেই স্থানে এবং এক স্থানে বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া অন্য স্থানে নাড়িয়া বসান। শেষোক্ত প্রকার সজ্জীর বীজ হাপোরে অথবা গামলায় লাগান হইয়া থাকে। এই হাপোরের অথবা গামলার মাটি বেশ সার-যুক্ত ও ঝুরা হওয়া প্রয়োজন। বীজ বপনের সময় মাটি যেন বেশী ভিজা বা কর্দ্দমাক্ত না থাকে। বীজ বপনের সময় চলিয়া যাইতেছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি কর্দ্দমাক্ত মাটিতে বীজ বপন করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই বেশী হইয়া থাকে এবং অনেক সময় চারা না উঠায় পুনরায় বীজ বপন করিতে হয়, তাহাতে আরও বেশী বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। যে দিবস

বীজ বপন করা হইবে উক্ত দিবস শুষ্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে বীজ বপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কোন প্রকার পাতা সার অথবা পুরাতন গোবর মাটির সহিত মিশ্রিত না থাকিলে অনেক বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। বীজ ছড়াইবার সময়ও খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যা'তা করিয়া বীজ ছড়াইলে কোন স্থানে চারা বেশী ঘন ভাবে জন্মে এবং কোন স্থানে খুব পাতলা ভাবে জন্মে; হয়'ত বা কোন স্থানে মোটেই জন্মে না। যাহাতে সমস্ত বীজ ক্ষেতে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কিঞ্চিৎ বালি বা ঝুরা মাটি মিশ্রিত করিয়া বীজ ছড়াইলে বীজগুলি সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

বীজ ছড়াইবার পর তাহার উপর বীজের স্থূলতা অনুসারে মৃত্তিকা চাপা দেওয়া উচিত। অনেকের মত যে বীজের যতটুকু স্থূলতা, বীজের উপরে ততটুকু মাটি চাপা দেওয়া উচিত কিন্তু অত অল্প মাটি চাপা দিলে অনেক সময় জল দিতে গিয়া বীজ বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে চারা ভাল ফুটিতে পারে না; পক্ষী ও কীটপতঙ্গ অনেক সময় উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং বীজের স্থূলতা অপেক্ষা কিছু বেশী মাটি চাপা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যে মাটি

বীজের উপরে চাপা দেওয়া হইবে তাহা নীচের মাটি অপেক্ষা অধিক সার-যুক্ত, ঝুরা ও হালকা হওয়া প্রয়োজন। বীজ বপন করিবার পর অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জল দিবার ঝাঁঝরি দ্বারা অল্প জল সেচন পূর্ব্বক জমি ঈষৎ ভিজাইয়া মাটি সরস করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে না পারিবেন তাঁহারা হাপোরের চতুষ্পার্শ্বে নালা কাটিয়া তাহাতে কিছুক্ষণ জল রাখিয়া মাটিকে সরস করিয়া লইতে পারেন। প্রত্যেক বীজেরই অঙ্কুরিত হইবার একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা আরও ২।৪ দিন অধিক অপেক্ষা করিবার পর যদি দেখা যায় যে বীজ অঙ্কুরিত হইল না, তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া পুনরায় বীজ বপন করা উচিত।

বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া দরকার। কোন প্রকার অপুষ্ট অথবা পুরাতন বীজ জমিতে বপন করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই অধিক হইয়া থাকে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা ২।১ ঘণ্টা খুব পাতলা তুঁতের অথবা লবণের জলে ভিজাইয়া লইয়া জমিতে বপন করা যাইতে পারে। এইরূপে পোকার উপদ্রব কম হয়। অনেকে না জানিয়া অবিশ্বস্ত স্থান হইতে পুরাতন বীজ ক্রয় করিয়া

আনেন এবং জমিতে বপন করিবার পর চারা না হইলে শেষে হতাশ হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ যাঁহারা সখ করিয়া চাষ করেন তাঁহারা কোনক্রমে একবার অকৃতকার্য্য হইলে ভগ্নোত্তম লইয়া পড়েন; সুতরাং পুনরায় সব্জীর চাষে আর তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে না। বীজ জমিতে ছড়াইবার পর কিয়ৎ পরিমাণে গন্ধকের গুঁড়া সেই জমিতে ছড়াইলে কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা বীজ বা অঙ্কুর নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

চারা রক্ষণ প্রণালী

বীজ হইতে চারা প্রস্তুত হইলে চারা রক্ষা করাও বহু যত্নসাধ্য ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যায় যে, চারা মাটি হইতে বাহির হইয়াই অনেক লম্বা হইয়া উঠে ও তাহার আকার ক্ষীণ হয়। যে স্থানে হাপোরে এই চারা বাহির হয়, সেই স্থানে কিছু চালা ঝুরা মাটি দিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপ না করিলে উক্ত চারাগুলি হেলিয়া পড়িয়া যায় এবং তুর্ব্বল ও বক্র হইয়া পড়ে।

অধিক রৌদ্র অথবা অধিক বৃষ্টির সময় চারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। কোমল চারাগুলির উপর কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া না দিলে অধিক বৃষ্টিতে গাছের গোড়া কাটিয়া যাইবার এবং অধিক রৌদ্রে উহা শুকাইয়া অথবা ঝলসাইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। প্রাতঃকালে অথবা

সন্ধ্যাকালে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত,. কারণ রাত্রের শিশির চারা গাছের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বীজ বপনের সময় মনে রাখিবেন চারা তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে হইবে। চারা ঘন হইলে তুলিবার সময় বাছিয়া তোলা সম্ভব হইবে না ও অনেক চারা জটা পাকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। চারা ঘন হইলে সেগুলি গাদাগাদির জন্য লম্বা ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ও গোড়ায় আলো বাতাস না লাগায়—'ধসা' বা 'লোণা' লাগিয়া সমস্ত চারার গোড়া পচিয়া যাইবে। সময় সময় দেখা যায় হঠাৎ চারা ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। তাহার একমাত্র কারণ ধসা বা লোণা ধরা। সে সময় অতিরিক্ত জল সেচন করা নিষিদ্ধ। অতিশয় ঘন বুনানী পারিত্যাগ করিতে হইবে। চারাগুলি যাহাতে প্রচুর আলো ও বাতাস প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' রোগ দেখা দিলেই ক্ষেত্র হইতে অন্যান্য সমস্ত চারা যত ছোটই হউক তুলিয়া অন্য স্থানে হাপোরে দিতে হইবে। এই রোগ অতি সংক্রামক ও অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। সেইজন্য উক্ত রোগ হইলে নিকটবর্ত্তী সমস্ত চারা অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

যে সমস্ত চারা হাপোরে প্রস্তুত হয় তাহা উত্তোলন করিবার সময় অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন। যেন-তেন

চারা নাড়িয়া বসান

প্রকারে চারা তুলিয়া জমিতে বপন করিলে সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া যায়। খুব সরু খুরপি অথবা বাঁশের শক্ত কাঠি দ্বারা ইহা উত্তোলন করিলে ভাল হয়। চারা উঠাইবার সময় যাহাতে শিকড়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

চারা উত্তোলন করিবার পূর্ব্বে যে জমিতে উহা স্থায়ী-ভাবে রোপণ করা হইবে তাহার পাট সম্পূর্ণ করিয়া রাখা আবশ্যক, পরে নিরূপিত স্থানে চারার শিকড়ের যতটুকু দৈর্ঘ্য তাহা অপেক্ষা কিছু বড় করিয়া গর্ত্ত খনন করিয়া চারা রোপণ করা প্রয়োজন। চারাগুলি রোপণ করিবার সময় উহাদের শিকড় যেন গর্ত্তে বিকৃত অথবা কুঞ্চিত অবস্থায় না থাকে। রৌদ্রের তেজ কমিলে চারাগুলি অপরাহ্ণকালে জমিতে নাড়িয়া রোপণ করাই বিধেয়। অধিক বৃষ্টির পর চারা বসান উচিত নয়। সামান্য বৃষ্টিতে মাটি অল্প ভিজিয়া গেলে চারা রোপণ করা যাইতে পারে। চারাগুলি হাপোর হইতে তুলিবার পূর্ব্বে জল সেচন করিয়া উহার মাটি ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। জমিতে

লাগাইবার পর যতদিন না উহা রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে ততদিন কোন আচ্ছাদন দ্বারা ঢাকিয়া রাখা এবং ক্রমে ক্রমে রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করাইয়া লওয়া আবশ্যক। ৬।৭ দিন পরে চারাগুলির শিকড় জমিতে বসিয়া গেলে উহাদের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে চারার যেরূপ পরিচর্য্যার আবশ্যক তাহা পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচিত হইবে।

সজ্জীক্ষেতে নানাপ্রকার পোকার উপদ্রব হইয়া থাকে এবং সেই সকল পোকা ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যে সফলকাম হইতে হইলে জমি ও বৃক্ষাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সজ্জীর জমিতে যাহাতে কোন প্রকার আওতা না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে জমি সর্ব্বদা রৌদ্র পায় সেখানে পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গের উপদ্রব খুব কম হইয়া থাকে।

কীট নিবারণের উপায়

ছোট ছোট কীট, উই ও পিপীলিকার উপদ্রব থাকিলে ক্ষেতের মাটি ২।১ ফুট গভীর করিয়া ওলটপালট করিয়া কিছু লবণের জল ছিটাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে উই ও পিপীলিকা মরিয়া যায় অথবা সেই জমি হইতে অন্যত্র পলাইয়া যায়। বিঘা প্রতি ৫।৬ সের চূণ ব্যবহার করিলে

এবং জমিতে জল দাঁড়াইতে না দিলে জমিরও উপকার হয় এবং এরূপ উপদ্রব অনেকাংশে কমিয়া যায়। সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্রিমির ন্যায় একপ্রকার পোকা জমিতে মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ব্যাধিযুক্ত বৃক্ষের বীজ বপন করিলে এই কীট আপনা হইতেই জন্মায়। এইরূপ স্থলে ব্যাধিযুক্ত গাছগুলি না রাখিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। এক প্রকার ছাতারোগ গাছ ও ফসলকে কাল ছাইয়ে পরিণত করে। এই ছাই-বৃক্ষস্থ রোগের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীটাণুর সমষ্টি বাতাসে উড়িয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও সমস্ত ক্ষেত্রকে দূষিত করে। কখন কখন বৃক্ষে ধসা ধরিতে দেখা যায়। একপ্রকার উদ্ভিদাণুই এই রোগের কারণ। এই রোগে গাছে পচ ধরে এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্র-স্থিত সমুদয় গাছ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয়। আব বা ফোস্কার ন্যায় একপ্রকার ঝুল রোগও বৃক্ষে দৃষ্ট হয়। পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই আব ফাটিয়া যায় ও ইহার মধ্যস্থিত কীটাণুসমূহ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। যদি দেখা যায় গাছের গায়ে কাল বা হল্‌দে দাগ বৃদ্ধি পাইতেছে ও গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া রোগগ্রস্ত সমুদয় গাছ পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। যদি ক্রমে ক্রমে

সমুদয় ক্ষেত্র এইরূপ রোগাক্রান্ত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রস্থিত সমুদয় গাছ পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময় পোকা লাগিয়া গাছের পাতা,ফল,ফুল প্রভৃতি নষ্ট করিতে থাকে। এইরূপ কীটাণুযুক্ত গাছ অল্প হইলে গাছের গায়ে তামাকের জল, গন্ধকের গুঁড়া, তুঁতের জল, কেরোসিন জল,ছাই প্রভৃতি ছড়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। যদি গাছের সংখ্যা অধিক হয় এবং গাছগুলি দূরে দূরে থাকে তাহা হইলে ১০ ছটাক পাথুরে চূণ জলে ফুটিতে দিতে হইবে এবং তৎপরে ১০ ছটাক গন্ধক মিশ্রিত করিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে, যাহাতে তলায় না জমিতে পারে অথচ কাদার মত হইয়া যায়। ফোটা শেষ হইবার সময় এক মণ জলের সহিত মিশাইয়া ইহাকে ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর ইহাকে ছাঁকিয়া লইয়া পিচকারী করিয়া গাছের গায়ে ছিটাইলে সুফল দর্শিবে। প্রকাণ্ড গাছ হইলে উত্তমরূপে গন্ধকের ধোঁয়া দিতে হইবে। উই ও পিপীলিকাদি নষ্ট করিতে হইলে সমপরিমাণে সেঁকো বিষের সহিত ময়দা ও অল্প গুড় মিশাইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া জমির মধ্যে মধ্যে রাখিলে পিপীলিকাদি তাহা খাইয়া মরিয়া যাইবে। উইপোকার উপদ্রবে তুঁতের জল বেশ কার্য্যকরী হয়। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত উপায়গুলি

অবলম্বন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। পোকার উপদ্রব নিবারণ করিতে হইলে ও পোকার হাত হইতে ফসল বাঁচাইতে হইলে, যাহাতে পোকা না লাগে সর্ব্বপ্রথম তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

ক্ষেতের মধ্যে আগাছা জন্মিতে দেওয়া ও ক্ষেতের নিকট জঙ্গল থাকিতে দেওয়া কখনও উচিত নয়।

এক জমিতে একই প্রকার ফসল বারংবার জন্মান উচিত নহে। মাঝে মাঝে নূতন প্রকারের ফসল জন্মান আবশ্যক।

ক্ষেতে যে সমস্ত বীজ বপন করা হইবে তাহা যেন ব্যাধিযুক্ত বৃক্ষের বীজ না হয়।

ফসল উঠাইয়া লওয়ার পর জমিতে পুনরায় চাষ দেওয়া প্রয়োজন।

অনেক পতঙ্গ আলোক ভালবাসে। রাত্রে ক্ষেতের মধ্যে একটি বড় গামলায় জল ও অল্প কেরোসিন তৈল দিয়া তাহার উপর একটি লণ্ঠন ঝুলাইয়া রাখিলে, আলোর প্রতিবিম্ব জলে পড়ায় অনেক পতঙ্গ আলো ভ্রমে জলে পড়িয়া মরিয়া যাইবে।

জমির মধ্যে স্থানে স্থানে আগুন জ্বালাইলেও অনেক উপকার হয়।

কয়েক প্রকার পোকা আছে তাহারা পোকার শত্রু।

এই প্রকার পোকা জমিতে যাহাতে অধিক পরিমাণে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। জলফড়িং, সাপের মাসীপিসি, পদ্মপোকা প্রভৃতি কখনও মারিয়া নষ্ট করা উচিত নয়। ঘুরঘুরে, উইচিঙ্গড়ে প্রভৃতি পোকা মাটির ভিতর হইতে নানাজাতীয় ছোট ছোট পোকা খায়।

ক্ষেতের উপকারী পোকা ও জন্তু

ভেক, টিকটিকি, চামচিকে প্রভৃতি জীব ও ছাতারে, ফিঙ্গে, শালিক, ময়না প্রভৃতি নানাজাতীয় পাখী অনেক পোকা খাইয়া নষ্ট করে। কুকুর অথবা বিড়াল পুষিলেও ক্ষেত্রস্বামীর অনেক উপকার হয়। কুকুর পুষিলে চোর, খরগোস, সাজারু প্রভৃতি জীবজন্তু আসিয়া ক্ষেতের কোন ক্ষতি করিতে পারে না ; বিড়াল থাকিলে ইঁদুরের উপদ্রব হয় না। এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে পারিলে ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষিক্ষেত্রে জমির উপরে বিচ্ছিন্ন আকারে একজাতীয় বাজে উদ্ভিদ্ আপনা হইতেই জন্মলাভ করে। উহা ক্ষেত্রস্থিত উদ্ভিদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। ঐ আগাছা ক্ষেত্রে যাহাতে জন্মলাভের সুবিধা না পায় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আগাছা

যদিও অসাবধানতাবশতঃ কোনরূপে তাহা জন্মলাভ করে, তাহা হইলে দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র উহা সমূলে উৎপাটন করিয়া জমি পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য; কেন না ইহা ক্ষেত্রস্থিত ফসলের আহার্য্য সমূহ আহরণ করিয়া নিজেদের পরিপুষ্টি সাধন করে ও আসল গাছকে কৃশ ও রুগ্ন করিয়া ফেলে। উহারা যে সকল স্থানে জন্মলাভ করিয়া বৃদ্ধি পাইবার স্থবিধা কারিতে পারে সে সকল স্থানের আসল ফসলে আওতা হইয়া তাহাদের পুষ্টিসাধনের বিশেষ অস্থবিধার সৃষ্টি করে। এই অনিষ্টকারী আগাছাগুলি বিনা কারণে স্থানটী ফসলের অনুপযোগী করিয়া ফেলে। স্থতরাং ক্ষেত্রে বা উদ্যানে যাহাতে কোনরূপে ঐ সকল আগাছা জন্মিতে না পারে সে বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন না করিলে যদি কোনরূপে ক্ষেত্রমধ্যে উহার বীজ ছড়াইয়া পড়ে তবে তাহাদের নষ্ট করিতে সবিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।

অনেকে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করিয়া আগাছা নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের মতে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা নিতান্ত হানিজনক; কেন না, ইহা প্রয়োগে ফসলের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইতে পারে। এক শত্রুকে নষ্ট করিতে গিয়া অপর শত্রুকে

আশ্রয় দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। জমির মাটি উত্তমরূপে ওলটপালট করিয়া আগাছার শিকড়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাছিয়া লইয়া পোড়াইয়া দেওয়া উচিত।

জমি পরিষ্কার থাকিলে ফসল সতেজ ও বলবান্ হইয়া ফলপ্রসূ হইতে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না।

উদ্যানের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি সকল সময় ব্যবহার করা উচিত। একটু বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিতে পারিলে অল্প সময়ের মধ্যে অল্প অর্থ ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে অনেকখানি কাজ করিতে পারা যায়। উদ্যান ও ক্ষেত্রের

শেষ কথা

কার্য্যের জন্য যে সমস্ত লোক ও মালী নিযুক্ত করা হইবে যাহাতে তাহারা অসুস্থ হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। মালীরা সাধারণতঃ নিরক্ষর ও অবিবেচক হইয়া থাকে। তাহারা যাহাতে ক্ষেত্র বা উদ্যানস্বামীর ক্ষতি বা অনিষ্ট করিতে না পারে সে বিষয়ও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ক্ষেত্রস্বামীর শৈথিল্য থাকিলে তাহারা চুরি করিয়া ফল পুষ্পাদি বিক্রয়করতঃ ক্ষতি করিতে পারে; সুতরাং এ বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূলজ সব্জী

গোল আলু

আলু মূলজাতীয় সব্জীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা মূলজাতীয় সব্জীর অন্তর্গত হইলেও মূলা, শালগম, গাজর, বীট প্রভৃতি মূলজাতীয় সব্জীর কাণ্ড যেরূপ মৃত্তিকা মধ্যে স্থূলতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ইহার সেরূপ হয় না। গোল আলুর শিকড়ের প্রত্যেক গ্রন্থিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার আলু জন্মে এবং উহা পরিপুষ্ট হইলে সব্জীরূপে আহারের উপযোগী হইয়া থাকে। এদেশে শকরকন্দ আলু, রাঙা আলু, মউ আলু, চুবড়ী আলু, শিমুল আলু, মেটে আলু, শাঁক আলু প্রভৃতি নানাজাতীয় আলুর চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন জাতীয় আলুই আস্বাদনে গোল আলুর সমতুল্য নহে। অন্যান্য আলু অপেক্ষা দেখিতে অনেকটা গোলাকার বলিয়া ইহা গোল আলু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহা এদেশীয় আলু নহে সেইজন্য অনেকে ইহাকে বিলাতি আলু বলিয়া থাকেন। ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা আমেরিকা হইতে য়ুরোপ এবং পরে এদেশে আনীত হয়। আজ-কাল পৃথিবীর নানাস্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। বিদেশীয় সব্জী হইলেও এদেশে ইহার চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অধুনা ভারতবর্ষে ইহা বিশেষরূপে আদৃত এবং শ্রেষ্ঠ সব্জী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

শক্ত এবং আঠাল মাটিতে আলু ভাল জন্মে না। সূক্ষ্ম বালির ভাগ অধিক এরূপ বেলে-দোআঁশ মৃত্তিকাই আলু চাষের বিশেষ উপযোগী। হাল্‌কা বেলে-দোআঁশ মাটি ছাড়া আলু ভালরূপ জন্মে না।

আলুর জমিতে বিশেষ গভীরভাবে লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। জমিতে বারংবার লাঙ্গল ও মই দিয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকা চষিয়া ধূলার মত করিতে হইবে। আলুর চাষে সারের বিশেষ প্রয়োজন। বর্ষার পূর্ব্বে বিঘা প্রতি জমিতে একশত মণ গোবর সার ও দেড় মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। অস্থিচূর্ণ বা টাটকা গোময় সার পচিয়া উদ্ভিদের আহারের উপযোগী হইতে অনেক সময় লাগে।

জমি প্রস্তুত ও সার প্রয়োগ

এজন্য বর্ষার পূর্ব্বে জমিতে সার প্রয়োগ করাই বিধেয়। বৃষ্টির জল পাইয়া উহা পচিয়া গলিয়া মাটির সহিত উত্তম-রূপে মিশিয়া যায়। ইহাতে উদ্ভিদ্‌গণের বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। জমি কর্ষণ করিবার সময় রেড়ি কিংবা সরি-ষার খইল বিঘা প্রতি ২—২৷৷০ মণ ব্যবহার করিতে হয়।

আলুর বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বিঘা প্রতি জমিতে ৫।৬ মণ ছাই মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। ছাই মিশ্রিত করিলে মাটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হালকা ও আল্‌গা হইয়া থাকে এবং ছাই সার প্রয়োগের ফলে বীজ বপনের পর গাছে পোকা কিংবা পচ ধরিবার সম্ভাবনা কম থাকে।

ইহা ছাড়া আলুর জমিতে সবুজ সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে জমিতে লাঙ্গল দিয়া বরবটী, শোণ কিংবা ধঞ্চে বীজ ছড়াইতে হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলে গাছে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল ও মই দিয়া গাছ সমেত ধঞ্চে মাটির সহিত উত্তমরূপে চষিয়া ফেলিতে হইবে। বর্ষার জলে পাতা সমেত ইহার ডালগুলি মাটিতে পচিয়া সাররূপে পরিণত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাসে বীজ আলু বসান হইয়া

থাকে। জলদি আলুর বীজ আশ্বিন মাসে বসাইতে পারা যায়। জমি গভীরভাবে এবং উত্তমরূপে ধূলার মত কর্ষিত হইলে মই দিয়া মাটি সমতল করিয়া লইতে হইবে এবং পরে ২০ ইঞ্চি অন্তর লাইন দিয়া প্রতি শ্রেণীতে ৮।৯ ইঞ্চি ব্যবধানে ৪।৫ ইঞ্চি গভীর করিয়া বীজ আলু বসাইয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। বীজ আলু বসাইবার পূর্ব্বে বিঘা প্রতি জমিতে ১০।১২ সের সালফেট অব এমোনিয়া ও ২০।৩০ সের রেড়ি বা সরিষার খইল মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বীজ আলু আস্তভাবে অথবা চোক সমেত কাটিয়া উভয় প্রকারেই বপন করিতে পারা যায়। ছোট ছোট আলু হইলে এক একটি আস্তভাবে এবং বড় আলু হইলে খণ্ডাকারে বপন করা যাইতে পারে। বীজ আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুঁতিতে হইলে প্রতি খণ্ডে অন্ততঃ ২।৩টী চোক রাখিয়া কাটা আবশ্যক। চোখ সমেত কাটিয়া কাটা স্থানের উপর কলিচূণের গুঁড়া অথবা ছাইয়ের গুঁড়া ছড়াইয়া তিন চারি দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়; আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পরই জমিতে বসাইলে উহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ছোট বীজ আস্তভাবে এবং বড় বীজ খণ্ডাকারে এই উভয় প্রকার বপনেই ফল প্রায় সমান পাওয়া যায়। বীজ আলু বেশ পুরাতন ও কলযুক্ত দেখিয়া

বীজ বপন

বসান উচিত। পচা বা দাগি বীজ আলু কখনও ক্ষেতে লাগান উচিত নয়।

বীজ আলু আশ্বিন মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে জমিতে বসান উচিত। গাছগুলি ৭।৮ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে দুপাশ লইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় আইল বাঁধিয়া দিতে হয়, ইহাকে পিলি বাঁধা বলে। পিলি (বা ভেলি) বাঁধিবার সময় প্রতি গাছের গোড়ায় একমুষ্টি হিসাবে শুক্‌না খইল ব্যবহারে ফলন বেশী হয় এবং আলুর আকারও বড় হয়। পিলি বাঁধিলে তাহাতে জলসেচন না করিলে সারের কার্য্য ফলদায়ক হয় না। পিলি বাঁধিলে লাইনের মধ্যে মধ্যে খাদ থাকিয়া যায়। উক্ত খাদকে চলিত কথায় জুলি বলে। ঐরূপ খাদ বা জুলি থাকায় ক্ষেতে জল সেচনের সুবিধা হয়। এরূপভাবে জুলি তৈয়ারী করিতে হইবে যেন একটীতে জল সেচন করিলে সব জুলিতে জল যায়।

জল সেচন

আলুর জমি যাহাতে সরস থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গাছের গোড়ায় মাটি যাহাতে আলগা থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ক্ষেতে আগাছা জন্মিলে তাহা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলিতে হইবে। জল না পাইলে যেমন

আলু পরিপুষ্ট হইতে পারে না, গাছের গোড়ায় জল বসিলেও সেইরূপ গাছ পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত জল সেচন হেতু গাছের গোড়ায় জল বসিয়া যাহাতে গাছ পচিয়া না যায় এইজন্য জল সেচন কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আলুর জমিতে পনের দিন অন্তর সেঁচ দিতে পারা যায়। স্থান বিশেষে দুইবার কি তিনবার সেঁচ দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থানে মৃত্তিকা স্বভাবতঃ নীরস থাকে এবং যে জমির জল ধারণের ক্ষমতা কম সেখানে ৫।৬ বার কিংবা আবশ্যক বুঝিয়া ততোধিকবার জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সময় জমিতে রেড়ির খইলের তরল সার প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আলু উত্তোলন

সাধারণতঃ বীজ বপনের সময় হইতে তিন মাসের মধ্যেই আলুর পূর্ণ পরিণতি হইয়া থাকে। পৌষ মাঘ মাসে গাছের পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, তখন গাছের বাড় থাকে না। এই সময়ে জল সেচন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই সময় হইতে আলু লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ সময়ে আলুর সেরূপ আস্বাদন থাকে না। গাছের পাতা এবং ডাল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পর জমি হইতে আলু উত্তোলন করিতে

হইবে। যে সময় নূতন আলু অধিক দরে বিক্রয় হয়, সে সময় চাষীরা আলু পরিপুষ্ট হইবার অপেক্ষা না করিয়া গাছের গোড়া হইতে আবশ্যক মত আলু বাহির করিয়া লইয়া আবার গাছের গোড়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেয়। গাছের গোড়ায় যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু থাকে উহা ফাল্গুন চৈত্র মাসে আহারোপযোগী হইয়া থাকে। উপরোক্ত উপায়ে একই গাছ হইতে দুইবার ফলন পাওয়া যাইতে পারে। ইহাকে দোভাঙ্গা বীজ (ratooned seeds) বলে।

পৌষ মাসের শেষাশেষি অথবা মাঘের প্রথমে যখন গাছগুলি বেশ সতেজ থাকে এবং উহাতে ফুল ধরে সেই সময়ে দোভাঙ্গা করিতে হয়। যে গাছে বড় এবং অধিক আলু হয় সেই গাছগুলিতে মাটি চাপা দিয়া খারাপ গাছ উঠাইয়া ফেলা উচিত। যে সময়ে এই কাজ করা হইবে তখন যেন মাটি সরস থাকে। মাটি অধিক শুষ্ক হইয়া যাইলে একবার সেচ দেওয়া চলে। চেষ্টা ও যত্ন করিলে একই জমি হইতে দুইবার আলু সংগ্রহ করা যায়। জলদি আলুর বীজ বপন ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করিতে হয়। উক্ত আলু অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহের মধ্যে উঠাইয়া লইয়া উক্ত জমিতে পুনরায় অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে

রোপণ করিতে হয় ও চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত জমিতে আলু রাখিয়া উত্তোলন করিতে হয়। শেষবার যে আলু জন্মায় তাহা সুপরিপক্ক হওয়ায় ভাল বীজ আলু পাওয়া যায়। এই পন্থায় চাষ করিয়াও সুফল পাওয়া গিয়াছে।

বীজ আলু প্রস্তুত করিতে হইলে খানিকটা জমির আলুগাছের গোড়া হইতে শিকড়ে চাড় না লাগে এরূপ-ভাবে আস্তে আস্তে আলগাভাবে মাটি সরাইয়া আলু-গুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঐ সমস্ত গাছের মাত্র ডগাটী বাহিরে রাখিয়া সমস্ত গাছটী মাটি দ্বারা চাপা দিতে হইবে। ২।১ মাস পরে ঐ সমস্ত লতা হইতে ছোট ছোট আলু পাওয়া যাইবে। ইহা বীজ আলু হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রতি বিঘায় টুকরি আলু ১½ মণ কিন্তু বড় আকারের বিদেশী আলু ২½—৩ মণ বীজ আবশ্যক হয় এবং ৬০/০ হইতে ১০০/০ মণ পর্য্যন্ত আলু জন্মে। বিঘা প্রতি খুব কম করিয়া ৩০/০ মণ আলু জন্মে এবং তাহার মূল্য যদি খুব কম পক্ষে ১২০৲ টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে খরচ-খরচা বাদে যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

আলু সংবৎসরের জন্য তুলিয়া রাখিতে হইলে কাটা ও

দাগিগুলি বাদ দিয়া তুঁতের জলে আলুগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। পরে বায়ু চলাচল হয় এরূপ একটি শুষ্ক ঘরের মেজের উপর দুই ইঞ্চি কিংবা ২॥০ ইঞ্চি পুরু করিয়া বালি বিছাইয়া তাহার উপর আলু-গুলি ঢালিয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

আলু রক্ষা করিবার

অন্য উপায়েও আলুগুলি একই ভাবে অধিক দিন পর্য্যন্ত রাখিতে পারা যায়। ঈষৎ গরম জলে আলুগুলি কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে উহাদিগকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কোন শুক্না ঘরের মাচার উপর কিছু পুরু করিয়া বালি বিছাইয়া আলুগুলি সাজাইয়া রাখিলে আলু সহজে পচিয়া নষ্ট হয় না। বায়ু-চলাচলহীন স্যাঁৎসেঁতে ঘরে রাখিয়া দিলে আলুতে পোকা লাগিয়া কিংবা পচ ধরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক।

পোকাতে আলুর বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। বেগুণ গাছে মাঝে মাঝে যে একপ্রকার পোকা দেখিতে পাওয়া যায় উহা আলুর পাতা খাইয়া থাকে। অন্য একপ্রকার সবুজ রংয়ের শোষক পোকা আলু গাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। হঠাৎ বিনা কারণে গাছ শুকাইতেছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে উক্ত

পোকা নিবারণ

পোকা দ্বারা গাছ আক্রান্ত হইয়াছে। উক্ত পোকা প্রথমেই গাছের গোড়া আক্রমণ করিয়া থাকে, তখনই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া পোকা বাহির করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।

আলু ঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিলে একপ্রকার ছোট ছোট সাদা রঙ্গের স্থূতলী পোকা ঢুকিয়া আলু নষ্ট করিয়া ফেলে। উক্ত পোকা ধরিলে কোন কোন আলুর চোকের কাছে বালির মত পোকার কাল নাদি জড় হইয়া থাকে। তুঁতের জলে আলু ধুইয়া সেগুলি বালির উপর বিছাইয়া গাদা করিয়া রাত্রে পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে বীজ আলুতে পোকা লাগিবার সম্ভাবনা কম থাকে।

আজকাল ২৪-পরগণার কোন কোন স্থানে, হুগলী, বর্দ্ধমান ও উত্তরবঙ্গে বিস্তর আলুর চাষ হইয়া থাকে। পাটনাই আলু রূপান্তরিত হইয়া দেশী আলুর আকার ধারণ করিয়াছে। ২৪-পরগণায় নৈনিতাল ও দেশী আলুর চলন বেশী। উত্তরবঙ্গে দার্জ্জিলিং আলুর বিস্তৃত চাষ হয়। পাটনাই আলুর আকার গোল কিন্তু নৈনিতাল আলুর আকার হংসডিম্বের মত। জাতি হিসাবে আলুর আকার ও গঠন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে এবং আসামের অনেক স্থলেও

বিভিন্ন জাতি

দার্জ্জিলিং আলুর চাষ হইয়া থাকে। বাংলা দেশে দেশী, নৈনিতাল, দার্জ্জিলিং, গৌহাটী, পাটনাই, কাটোয়া, টুকরী* প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় আলুর চাষ হইতে দেখা যায়।

বীজ আলুর আবশ্যক হইলে উৎকৃষ্ট জাতীয় পরিপুষ্ট এবং কল সমেত বীজ বিশ্বস্ত স্থান হইতে সংগ্রহ করা উচিত।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইটালি প্রভৃতি দেশ হইতে কয়েক প্রকার নূতন বিভিন্ন জাতীয় বীজ আলু আনাইয়া এদেশে চাষ করা হইতেছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জাতিগুলি বিশেষ সুফল প্রদান করিয়াছে। এগুলি সহজে পচে না বা ধসা ধরে না, উপরন্তু ফলন বেশী হয়। উহাদের নাম—

১। ম্যাগনাম বোনাম ২। গ্রেট স্কট
৩। এবানডান্স ৪। এপিকিওর
৫। উইণ্ডসর ক্যাসল ৬। ফ্যাক্টর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আলুর বিভিন্ন গুণ, যথাঃ—ইহা মুখ-রোচক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলকারক, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, বায়ু ও কফরোগে উপকারক।

* ইহা একটী মিশ্রিত বীজ টুকরি করিয়া বাজারে আসে তাই এই নাম। সাধারণতঃ পাটনাই ও দার্জ্জিলিং জাতীয় বীজ টুকরিতে ভর্ত্তি করা হয়।

রাঙ্গা আলু ও শকরকন্দ আলু

ইহারা মূল জাতীয় সব্জী। রাঙ্গা আলু বা শকরকন্দ আলুর চাষ একই প্রকার হইলেও এবং ইহারা একই কার্য্যে ব্যবহৃত হইলেও উহাদের বর্ণ এবং আস্বাদের কিছু তারতম্য হইয়া থাকে। লাল আলুর বা রাঙ্গা আলুর উপরকার গায়ের বর্ণ লাল কিন্তু শকরকন্দ আলুর বর্ণ সাদা। অধিকন্তু শকরকন্দ আলু অপেক্ষা ইহাতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ অধিক শর্করা আছে। ইহারা গোল আলুর স্থায় পুষ্টিকর খাদ্য।

দোআঁশ মাটিতে ইহা বেশ জন্মে। জমি উত্তমরূপে চষিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আলুর লতার গাঁটগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া এক হাত অন্তর লাগাইতে হয়। পুরাতন গাছের লতা ২।৩টি চোখ সমেত ৯ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট লম্বা করিয়া কাটিয়া রোপণ করিতে হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় রোপণ করিতে অনেক বিলম্ব হইবে কিন্তু গাছ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে লতা আনিয়া যেরূপ স্থানে জল সেচনের ব্যবস্থা করা যাইবে এরূপ স্থান দেখিয়া হাপোরে দিতে হইবে। যে লতাগুলি বেশ সুপুষ্ট, নিরোগ ও মোটা সেইগুলিই হাপোরে দিবার জন্য মনোনীত করা উচিত। লতা রোপণের পূর্ব্বে পাতাগুলি

ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। গ্রীষ্মের সময় যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জমি ভিজাইয়া লইয়া ‘জো’ বুঝিয়া রোপণ করিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিতে হইলে মেঘলা দিন দেখিয়া লতা রোপণে হাত দিলে সুফল পাওয়া যায়।

আলু পুষ্ট হইতে চার পাঁচ মাস সময় লাগে। আলু পুষ্ট হইলে সাধারণতঃ পাতা পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন দু-একটি আলু তুলিয়া ভাঙ্গিলে যদি দেখা যায় যে সাদা আটা বা কষগুলি বাতাসে বর্ণ পরিবর্ত্তন না করে তাহা হইলে আলু পাকিয়াছে বলিয়া জানা যাইবে। আলু পাকিলে দীর্ঘ দিন জমিতে রাখিয়া দিলে আলু হরিদ্রা-বর্ণের হইয়া যায় ও গন্ধ হইয়া খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। সেজন্য আলু পাকিলেই তুলিয়া ঠাণ্ডা স্থানে রাখিলে ভাল থাকে। যদি এইরূপে আলুর গাছ সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, গোল আলুর চোক সমেত ২।৩টি টুক্‌রা একসঙ্গে জমিতে বাসান যাইতে পারে। গোল আলুর ন্যায় ইহার শিকড়ের গ্রন্থি হইতে আলু জন্মে। বিঘা প্রতি জমিতে ১৫।১৬ মণ গোবর সার ও ৩০।৩৫ সের সালফেট্ অফ এমোনিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে

জমিতে নিড়ান দিয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া ও জল সেচন ভিন্ন ইহার অন্য কোন পাট নাই। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ক্ষেত হইতে আলু সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। জমি বিশেষে বিঘা প্রতি ৭০/০ হইতে ১০০০/০ মণ পর্য্যন্ত ফলন হইতে দেখা যায়। মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে গরীব লোকে শীতকালে এক বেলা ছাতু ও এক বেলা রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবনধারণ করে। ইহার তরকারী, টক, ভাজা, পিষ্টক প্রভৃতি অতি উপাদেয় ও সুস্বাদু। রাঙ্গা আলু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা করিয়া কাটিয়া প্রথমে রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া যাঁতায় ভাঙ্গিয়া লইলে অথবা ঢেঁকিতে কুটিলে সুন্দর ময়দা প্রস্তুত হয়। এই ময়দা গমের ময়দা হইতে সুস্বাদু অথচ মূল্য কম।

লাল আলুতে একপ্রকার পোকা ধরে তাহাকে জুঁয়ে-ধরা বলে। আলুতে জুঁয়ে বা পোকা ধরিলে উহার আস্বাদন তিক্ত হইয়া যায় এবং পোকা-ধরা আলু সহজে সিদ্ধ হইতে চায় না ও গন্ধ হয়।

শূকর এই আলুর পরম শত্রু। সেজন্য যে সমস্ত স্থানে বন্যশূকরের উৎপাত আছে সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারণ শূকর একবার ক্ষেতের সন্ধান পাইলে দুই তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত আলু নষ্ট করিয়া ফেলে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা উষ্ণবীর্য্য, মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুরোগে হিতকর, কফনাশক এবং ভ্রম, পিত্ত ও দাহরোগে হিতকর।

শাঁক আলু

থুবী শকরকন্দ নামক এক জাতীয় শাঁক আলু সিংহল হইতে আনীত হইয়া এই প্রদেশে চাষের জন্য প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে। এই আলুগুলি সাধারণতঃ একত্রে গুচ্ছাকারে জন্মে। ইহার ওজন এক ছটাক হইতে ২—২॥০ সের পর্য্যন্ত হয়।

ইহা দেখিতে শঙ্খের ন্যায় ধপ্‌ধপে সাদা। বোধ হয় সেইজন্যই ইহার 'শাঁক আলু' এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। ইহা রাঙ্গা আলুর ন্যায় মূলজ উদ্ভিদ্ কিন্তু সব্জী নয়। ইহার গায়ের উপরি-ভাগের খোসা ছাড়াইয়া কাঁচা খাওয়া হইয়া থাকে।

রাঙ্গা আলুর ন্যায় একই ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ১ হাত ১॥০ হাত অন্তর দুইটী করিয়া বীজ বপন করিতে পারা যায়। জমি বেলে দোআঁশ হইলে মূল বেশ মিষ্ট ও

রসাল হয়। গাছের লতাও বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইবার পর মাটি বেশ গুঁড়া হইলে শাঁক আলুর বীজ পাতলা করিয়া জমিতে ছড়াইয়া দিলেও চলিতে পারে। জমিতে বীজ বপন করিবার পর চারাগুলি একটু বড় হইলে গাছের গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমিতে গোময় ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শাঁক আলুর চারাগুলি ২।৩ হাতের অধিক ঊর্দ্ধ হইলে নিড়ানি দ্বারা আর একবার গাছের গোড়া নিড়াইয়া দিলে মন্দ হয় না। গাছগুলি অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে গাছের গোড়ার দিকে দুই হাত আন্দাজ রাখিয়া সমস্ত ডালগুলি কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত গাছের মূল বৃদ্ধির প্রয়োজন সেই সকল গাছের শাখা-প্রশাখা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে আবশ্যকীয় মূল বৃদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এবং মূলগুলি তাদৃশ বড় হইতে পায় না। ইহা লতানিয়া গাছ, সেজন্য গাছগুলি বড় হইলে উহাদের পালায় বা মাচায় তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। বেড়ার ধারে ধারে বীজ বপন করিলে গাছগুলি বেড়া অবলম্বন করিয়া বেশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গাছ অধিক বৃদ্ধি পাইতে দিলে মূল ছিবড়াযুক্ত ও লম্বা হয়।

শাঁক আলু মাটির মধ্যে জন্মে। ১০।১২ মাসে উহা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরে জমি হইতে আলু না তুলিয়া রাখিয়া দিলে, দ্বিতীয় বৎসরে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ মূল হইতে পুনরায় গাছ জন্মে। মূলের আকার প্রথম বৎসরে যেরূপ থাকে দ্বিতীয় বৎসরে তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা এক একটি ওজনে ১০।১৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি /২ হইতে /২॥০ সের বীজ লাগে।

শাঁক আলুর বীজ বিষাক্ত; ছোট ছোট ছেলেরা কড়াই ভ্রমে ইহার বীজ খাইতে পারে, এইজন্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার বীজ কখনও মুখে দেওয়া অথবা জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করা উচিত নহে।

শাঁক আলুর গাছ উৎকৃষ্ট পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বরবটী, শণ, ধঞ্চে প্রভৃতির ন্যায় ইহার চাষেও জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে গুণ, যথা—ইহা শীতল, মধুর রস, মূত্রকর, রুচিকর, পিপাসানাশক, কফজনক এবং বায়ুর শান্তিকারক।

চুবড়ি আলু, খাম আলু ও শিমুল আলু

ইহা এ দেশীয় সব্জী। পূর্ব্বে যখন গোল আলু এদেশে আমদানী হয় নাই তখন এই সমস্ত আলুই গোল আলুর স্থান অধিকার করিত। তখন খাম আলু, মেটে আলু, চুবড়ি আলু প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন ছিল কিন্তু অধুনা গোল আলুর চাষ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আবাদ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধারণতঃ বন-জঙ্গলে ইহারা স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। জমিতে ইহার চাষ করিলে এবং ভালরূপ পরিচর্য্যা করিতে পারিলে এই সমস্ত আলু অতি প্রকাণ্ড এবং অত্যধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। জমিতে ২॥০ হাত ৩ হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া বীজ আলু পুঁতিতে হইবে। জমিতে অন্য ফসল দিয়া বেড়ার ধারে ধারে ইহাদের বীজ আলু পুঁতিতে পারিলে চাষের জন্য স্বতন্ত্র স্থানের আবশ্যক হইবে না এবং গাছগুলি বেড়া অবলম্বন করিয়া লতাইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারিবে।

বর্ষার কিছু পূর্ব্বে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ আলু বপন করিতে হইবে। এই সমস্ত আলু লতার পত্র-কক্ষে

যে একপ্রকার ছোট আলু জন্মে উহা হইতেই সাধারণতঃ নূতন গাছ জন্মায় কিন্তু ২।৩ বৎসরের কম সে গাছের কন্দ সেরূপ বড় হয় না। পুরাতন লতার গোড়ার নিম্ন হইতে আলু তুলিয়া লইলেও লতা উপড়াইয়া না দিলে তাহা হইতেও গাছ জন্মায়। গাছের গোড়ায় পুরাতন গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ আলু বপন করিলে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি হইতে ফসল লইতে পারা যায়। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে বিঘা প্রতি ৮০/—৯০/০ মণ ফলন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাদের গুণ, যথা—ইহারা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, বাতশ্লেষ্মানাশক ও ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শরোগ ও বিষদোষে উপকারক।

শিমুল আলু

শিমুল আলু সকল ঋতুতেই জন্মাইতে পারা যায়। লাভের ফসলের মধ্যে ইহা অন্যতম। সাধারণতঃ মাঘ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহার চাষ করা হয়। জমি একইভাবে প্রস্তুত করিয়া ইহার ছোট ছোট বীজ আলু বা ডগা বপন করিতে হয়।

গাছ যাহাতে অধিক উচ্চ না হয় সেজন্য উহার ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলে গাছগুলি খর্ব্ব হইবে এবং শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া ঝাড়াল হইবে। ইহা লাগাইবার পর ১২ হইতে ১৫ মাসের মধ্যে ফসল তৈয়ারী হইয়া থাকে।

শিমুল আলুর মূল অল্পাধিক বিষাক্ত, সেজন্য প্রথমে উহা ফুটন্ত জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইয়া তরকারীতে ব্যবহার করা উচিত। ইহার পাতা গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। শিমুল আলুর মূল হইতে উৎকৃষ্ট পালো প্রস্তুত হয় এবং সেই পালো হইতে এক প্রকার এরারুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। নিম্নে পালো প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইল।

প্রথমে শিমুল আলুর মূলগুলি জমি হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। পরে উহাদের উপরকার গায়ের ছাল ছুরী অথবা বঁটির সাহায্যে ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিতে হইবে। সমস্তগুলি এইরূপে কাটা হইলে সেগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। পরে উহা পরিষ্কার একখণ্ড কাপড় বা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে

হইবে। উক্ত গুঁড়া হইতে মণ্ড ও সেই মণ্ডকে এরারুট বা ময়দা উভয় প্রকারে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই এরারুটকে 'ক্যাসোয়া' ও এই ময়দাকে 'ট্যাপিওকা' বলে।

কচু

কচু মূল জাতীয় সব্জী। ইহা নানাপ্রকার; তন্মধ্যে মানকচু, পঞ্চমুখী কচু, শোলাকচু ও কালকচু প্রধান।

কচুর মধ্যে মানকচু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহা বাঙ্গালায় মানকচু এবং সংস্কৃতে মানকন্দ নামে অভি-হিত। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান দক্ষিণ এসিয়া।

মানকচু

সারযুক্ত দোআঁশ মাটিতে মানকচু ভাল জন্মে। ইহার জন্য উচ্চ শুষ্ক এবং রৌদ্রযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। নিম্ন ও ছায়াযুক্ত ভিজা জমিতে আবাদ করিলে ইহার আস্বাদ বিকৃত হয়। অধিকন্তু ভিতরে ছিবড়া জন্মে ও রন্ধন করিলে ভালরূপ সিদ্ধ হয় না এবং খাইলে মুখ চুলকায়।

মুখী পুতিয়া অথবা চারা রোপণে মানকচুর চাষ করিতে পারা যায়। ক্ষেত্র হইতে কচু উঠাইয়া লইলে মূল কাণ্ডের ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মুখী দেখিতে পাওয়া যায়। মুখী অথবা চারার অভাবে কন্দমূলের উপরিভাগ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া সমস্ত পাতাগুলি ছাড়াইয়া লইয়া উক্ত অংশ জমিতে বসাইতে পারা যায় অথবা মান-কন্দকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া চোক সমেত ২।৩ টুক্‌রা একত্রে জমিতে বসাইতে পারা যায়। বিঘা প্রতি প্রায় ৭০০ হাজার মুখীকচু লাগে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মুখীগুলি হাপোরে বসাইয়া উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হয় এবং চারাগুলি একটু বড় হইলে ক্ষেতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। জমি ১ হাত আন্দাজ গভীর করিয়া কোপাইয়া ২।৩ হাত ব্যবধানে এক একটী চারা রোপণ করিতে পারা যায়।

অন্যান্য কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের মূল যেমন মৃত্তিকা মধ্যে স্থূলতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, মানকচুর কন্দমূল সেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় না। উহা মৃত্তিকার উপরিভাগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কন্দের নিম্নভাগস্থ গাত্রের চারিপার্শ্ব হইতে শিকড় বহির্গত হইয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করে

এবং শিকড়গুলিই মৃত্তিকা মধ্য হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কন্দের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

কন্দমূল বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা হালকা মাটি অথবা ছাই দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। মানকচুর জমিতে পটাস সার ব্যবহার করা দরকার। সালফেট অফ পটাস নামক সার ব্যবহার করিতে পারা যায়, অভাবে কাঠের ছাই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে পটাসিয়ামের ভাগ অধিক থাকে বলিষা মানকচুর মূল দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মানকচুর পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিতে এক বৎসর কাল সময় লাগে। গাছ অত্যধিক তেজাল হইলে কন্দ বৃদ্ধি না পাইয়া গাছের পাতাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কন্দের গাত্রস্থ অল্প সংখ্যক শিকড় ও গাছের ২।১টী পাতা কাটিয়া দিতে হয়। ইহাতে কন্দ পরিপুষ্ট ও উহার আকাড় বড় হইয়া থাকে। মানকচুর ক্ষেত হইতে প্রতি বৎসর না তুলিয়া ২।৩ বৎসর অন্তর অন্তর তুলিতে পারিলে দীর্ঘ ও স্থূল হইয়া থাকে। একটী মানকচু ৪ হাত হইতে ৪৷৷০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। চেষ্টা ও যত্ন করিলে প্রথম বৎসর কচু ।০ দশ সের ওজন পর্য্যন্ত হয়।

সজারু মানকচুর বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। জমিতে

যাহাতে ইহাদের উপদ্রব না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

মানকচু বিশেষ উপকারক ও পুষ্টিকর সজ্জী। ইহা হইতে নানাবিধ উপাদেয় তরকারী প্রস্তুত হয়। অনেকে মানকচুর মিষ্টান্ন ও আচার প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

মানকচু শোথরোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা শীতল, লঘুপাক, রক্তপিত্তনাশক ও শোথনিবারক।

গুঁড়ি কচু

মানকচুর ন্যায় দোআঁশ মাটিতে গুঁড়িকচু উত্তম জন্মে। কেবল বেলে কিংবা আঠাল কাদা মাটিতে এই কচু ভাল জন্মে না। প্রখর রৌদ্রকিরণ কচুর পক্ষে হিতকর।

গুঁড়ি কচু ভাল দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট জাতীয় মুখীকচু চাষের জন্য ব্যবহার করা দরকার। মুখীগুলি বপনের পূর্ব্বে শুষ্ক স্থানে খড়ের বিচালী চাপা দিয়া রাখিলে অল্প দিনের মধ্যেই উহা হইতে কল বাহির হয়। তখন উহা ক্ষেতে বপন করা হইয়া থাকে।

স্থান বিশেষে মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গুঁড়ি কচু বপন করা যাইতে পারে। জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া এক হাত অন্তর অন্তর এক-একটী মুখী বসান আবশ্যক। গাছ একটু বড় হইলে মাটি দিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া

দিতে হয়। রসা জমিতে জল সেচনের আবশ্যক হয় না। পাহাড় অঞ্চলে ও উচ্চ ভূমিতে জল সেচনের আবশ্যক হইয়া থাকে।

মানকচু যেরূপ বৃহদাকার হয়, ইহা সেরূপ হয় না। কচু গাছের মূল কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি কন্নিয়া মুখীকচু জন্মে। কচু তুলিবার সময়ে ছোট ছোট মুখীকচু পরিত্যক্ত স্থানে রাখিয়া মাটি চাপা দিলে পর বৎসর সেই স্থানে পুনরায় কচু গাছ জন্মিবে। বাংলায় প্রায় সর্ব্বত্র মুখীকচুর চাষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। কচুর চাষে পটাস, গোমূত্র ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। বিঘা প্রতি ৩০ সের মুখী লাগে।

আসামের বিভিন্ন স্থানে এবং ময়মনসিংহ জেলায় প্রচুর পরিমাণে পঞ্চমুখী কচু জন্মিতে দেখা যায়। এই জাতীয় কচুর মূল কাণ্ডের পার্শ্বদেশ হইতে চারিটী বা ততোধিক স্বতন্ত্র মুখ বহির্গত হয়।

পঞ্চমুখী কচু

অন্যান্য মুখীকচু অপেক্ষা পঞ্চমুখী কচুর আস্বাদন উৎকৃষ্ট। এই কচু লাগাইতে হইলে ইহার উপরকার অংশ চোক সমেত কাটিয়া মাঘ ফাল্গুন মাসে জমিতে হাপোর দিতে হয় কিংবা ইহার ছোট মুখী লাগাইতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ

মাসে বৃষ্টি হইলে ক্ষেতে স্থায়ীভাবে ১॥ হাত অন্তর লাগাইতে হয়।

শোলা কচু

শোলা কচু, গুঁড়ি কচুর ন্যায় একইভাবে বপন করিতে হয়। ইহা গুঁড়ি কচু অপেক্ষা আকারে দীর্ঘ হইয়া থাকে। হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। সেঁতসেঁতে অল্প জলযুক্ত স্থানে ইহার চাষ হয়।

কাল কচু

বাঙ্গালা দেশে যেখানে-সেখানে কাল কচু স্বভাবতঃ নিজে হইতেই জন্মিতে দেখা যায়। বন্য গাছ বলিয়া কেহ ইহার যত্ন করে না। ইহার ডাঁটার বর্ণ কাল, সেইজন্য ইহা কাল কচু নামে অভিহিত হয়। সব্জী হিসাবে কাল কচুর ডাঁটা ব্যবহার হয়। বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতি কামড়াইলে দষ্টস্থানে কাল কচুর আটা ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

অন্য এক জাতীয় কচু জলাশয়ের ধারে স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখা যায়। উহার মূলের পরিবর্ত্তে ডাঁটাই সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কচু ২৪-পরগণায় যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কচু গুরুপাক, মলভেদক, বায়ু, পিত্ত ও আমদোষ বৃদ্ধিকারক।

ওল

ওল একপ্রকার কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ্। ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। হাওড়া জেলার অন্তর্গত সাঁতরাগাছি নামক স্থান ওলের জন্য বিখ্যাত।

রোদপিঠে উঁচু জমি ওল চাষের জন্য নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। ইহার মাটি দোআঁশ ও হাল্‌কা হওয়া আবশ্যক। ছায়াযুক্ত ভিজা জমিতে ইহা জন্মাইলে উহার আস্বাদ বিকৃত হইয়া থাকে এবং খাইলে মুখ চুলকায়। বিশেষ পরিচর্য্যার সহিত ভাল জাতীয় ওলের আবাদ করিতে পারিলে ইহার যেমন ফলন প্রচুর হয় তেমনি উহা অতি উপাদেয় ও মুখরোচক হইয়া থাকে।

জমি কোদালি দ্বারা উত্তমরূপে কোপাইয়া অথবা জমিতে লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি সমতল করিতে হইবে। পরে দুই হাত অন্তর এক-একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে উনানের ছাই, পোড়া মাটি ও পটাস দ্বারা পূরণ করিয়া

রাখিতে হয়। কচুর ন্যায় ওলের মূলকাণ্ডের চারিপার্শ্বে ছোট ছোট মুখী জন্মিয়া থাকে। উক্ত মুখীগুলি বীজরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ওলের মুখীগুলি হাপোরে বসাইয়া উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। পরে হাপোর হইতে চারাগুলি তুলিয়া পূর্ব্ব কর্ষিত ক্ষেতে যথারীতি স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। গাছ বড় হইলে মাটি দিয়া গোড়ার কাণ্ড ঢাকিয়া দিতে হয়। জমিতে তৃণাদি জন্মিলে তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত।

মাঘ ফাল্গুন মাসে ওলের মুখী বপন করা হয়। ওল উঠাইয়া লইবার সময় প্রত্যেক গর্ত্তে ২।৩টী করিয়া মুখী ওল বসাইয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিলে পর বৎসর সেই স্থানে আর বীজ ওল বসাইবার আবশ্যক হয় না। কেবল গোড়ার মাটি কোপাইয়া আলগা করিয়া সার প্রয়োগ করিলেই চলিবে। পর বৎসর যথাসময়ে সেই স্থান হইতে গাছ জন্মিবে। বীজ বা মুখী ছোট-বড় হিসাবে বিঘা প্রতি ৩০ সের হইতে ১৷৹ মণ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয় এবং ৭০/০ মণ হইতে ১০০/০ মণ পর্য্যন্ত ফসল হইয়া থাকে। ছোট মুখী বসাইলে বীজ কম লাগে কিন্তু ফসল কম হয়।

ওলের মূল এবং ডাঁটা উভয়ই তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওল বিশেষ উপকারী সব্জী এবং নানা রোগে হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা বহুগুণবিশিষ্ট এবং ইহা প্রায় সকল রোগেরই পথ্য। ইহা লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ, বায়ু, কৃমি, শ্বাস, কাস, বমি, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও গ্রহণী রোগে হিতকর এবং অর্শরোগে বিশেষ উপকারক।

আর্টিচোক (জেরুজিলাম)

চলিত ভাষায় ইহাকে 'হাতিচোক' বলে। ইউরোপের দক্ষিণভাগস্থ ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ও উত্তর আফ্রিকায় ইহা স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। ফ্রান্স ও ইউরোপের লোকের ইহা অতি প্রিয় খাদ্য।

আর্টিচোক বা হাতিচোক প্রধানতঃ দুই প্রকার। এক জাতীয় গাছের উপরে ঢেঁড়শের ন্যায় জন্মে, তাহা গ্লোব আর্টিচোক এবং অন্য জাতি মাটির মধ্যে আদা, কচু, হলুদ প্রভৃতির ন্যায় জন্মে, তাহাকে জেরুজিলাম আর্টিচোক কহে।

কচুর ন্যায় জেরুজিলাম আর্টিচোকের মূল জন্মে এবং উহাই আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলুর ন্যায় ইহার জমিতে উত্তমরূপে ও গভীরভাবে চাষ দেওয়া আবশ্যক। জেরুজিলাম আর্টিচোকের মূল বপন করিতে হয়।

সাধারণতঃ মাঘ ফাল্গুন মাসে ইহার মূল জমিতে বপন করা হয়। চেষ্টা করিলে শীত ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই এই ফসলটি জন্মাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে ইহার চাষ করিতে হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসে মূল অথবা গেঁড় জমিতে বপন করিতে হইবে।

হালকা দোআঁশ মাটিতে আর্টিচোক ভাল জন্মে। জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ৩ ফিট অন্তর লাইন দিয়া ১ ফুট ব্যবধানে ৩ ইঞ্চি আন্দাজ গভীর গর্ত্তে আর্টিচোকের বীজ-গেঁড় বসাইতে হইবে।

বীজ-গেঁড় সুপুষ্ট না হইলে ভালরূপ ফলন হয় না। মূল হইতে গাছ বাহির হইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে। মাঘ ফাল্গুন মাসে যে মূল বপন করা হইবে উহার চারা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ২।৩ দিন অন্তর ক্ষেতে জল সেচন করিতে হইবে। গাছগুলি আধ হাত আন্দাজ দীর্ঘ হইলে গোড়ার মাটি তুলিয়া দিয়া দাঁড়া বা পিলী বাঁধিয়া দিতে হইবে। এরূপ করিলে ক্ষেতে জল সেচনের সুবিধা হইবে এবং অধিক বৃষ্টি হইলেও জমিতে জল দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহার গাছগুলি দেখিতে পাট গাছের মত কিন্তু ইহার পাতা পাট গাছের পাতা অপেক্ষা পুরু ও চওড়া। ইহার জমিতে খইল, গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

গাছগুলি সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে ইহাদের মূল আহরণ করিতে হয়। বড় মূলগুলি আহারের জন্য এবং ছোট ছোট মূলগুলি চাষের জন্য বীজ মূল হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। আলুর ন্যায় ইহা হইতে নানাবিধ তরকারী প্রস্তুত হইতে পারে। অনাবৃষ্টিতেও এই ফসল জন্মিয়া থাকে।

বিঘা প্রতি ৩০ সের মূল লাগে এবং ২৫।৩০ মণ ফলন হয়।

গ্লোব আর্টিচোকের কথা পরে বলা হইবে। (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

আদা, আম-আদা ও হলুদ

ইহারা কন্দ বা মূল জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত। আদা, আম-আদা ও হলুদ এই তিনটি উদ্ভিদের পরস্পর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যদিও ইহারা সব্জী নয় তথাপি অধিকাংশ তরকারীতেই আদা ও হলুদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরোক্ত তিনটী উদ্ভিদের চাষ প্রণালী একই প্রকার।

এই তিনটি জিনিষই ঈষৎ ছায়াযুক্ত সরস মাটিতে জন্মান চলে। এই নিমিত্ত অনেকে বাগানে বড় বড়

গাছের ছায়ায় ইহাদের চাষ করিয়া থাকেন। এইরূপে চাষ করার সুবিধা এই যে, জমিটি অকারণ পতিত থাকে না, উপরন্তু এই সমস্ত ফসলের চাষ করার জন্য যে সার জমিতে প্রয়োগ করা হয় তাহাও বড় গাছের প্রয়োজনে আসে। তলায় ইহাদের চাষ করা হয়, এইজন্য ইহাদিগকে 'তলীফসল' বলে।

আদার ভাল নাম আর্দ্রক। চলিত কথায় ইহাকে আদা বলা হয়। আদার মূল কল সমেত রোপণ করিতে হয়।

আদা

সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে আদার মূল লাগান হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুন মাসে জমি ৫।৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া কোপাইয়া বিঘা প্রতি ২০।২২ মণ গোবর সার, ১০ সের সালফেট অফ এমোনিয়া ও ১৫ সের সালফেট অফ পটাস বা ছাই ১ মাস পূর্ব্বে জমিতে দিয়া রাখিতে হয়। পরে বীজমূলগুলিকে খড়ের মধ্যে ৫।৬ দিন রাখিতে হইবে। কল বাহির হইলে জমিতে তিন পোয়া অন্তর ব্যবধানে ৫।৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া উহার মূল বসাইতে হইবে।

গাছগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে মাটি দিয়া উহাদের গোড়া উঁচু করিয়া দিতে হইবে। কারণ বর্ষায় গাছের

গোড়ায় জল বসিলে উহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এজন্য বর্ষার জল যাহাতে অধিকক্ষণ ক্ষেতে জমিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছের গোড়া উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিলে মধ্যে মধ্যে যে নালা থাকিয়া যায় উহা হইতে জল নিষ্ক্রামণের সুবিধা হয়। গাছের গোড়া যাহাতে আলগা এবং পরিষ্কার থাকে এবং জমিতে অগাছা জন্মাইতে না পারে সেজন্য যত্ন লওয়া উচিত।

পৌষ মাঘ মাস হইতে গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয়। গাছগুলি শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্বে মূল সম্পূর্ণ পুষ্ট হয় না। গাছ সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে কোদাল বা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা জমি হইতে আদা তুলিয়া লইতে হয়। পরে মূলগুলি জলে ধুইয়া কাঁচা ব্যবহার করা হয়।

আদা রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিলে শুঁঠ প্রস্তুত হয়। আদা কাঁচা এবং শুক্‌না উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদার ছোট ছোট মুখগুলি ও মোথা বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি প্রায় ১ মণ মূল লাগে এবং ৫০/০ হইতে ৭৫/০ মণ ফলন হইয়া থাকে।

আদা বিশেষ উপকারী দ্রব্য। অনেক রোগে ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা রুচিকারক, শুক্রজনক, অগ্নি ও স্বরবর্দ্ধক এবং শূলরোগের শান্তি-

কারক। আদা হইতে একপ্রকার তৈলও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হলুদ

হলুদের ভাল নাম হরিদ্রা। আদার ন্যায় ইহার জমি একই ভাবে চাষ করিতে হয় এবং একই সময়ে ইহার বীজ মূল জমিতে রোপণ করিতে হয়। খনার বচনে ইহা আদার সমসাময়িক ফসল। গাছ শুষ্ক হইলে হলুদ উঠাইয়া লইতে হয়। হলুদ সিদ্ধ করিয়া তাহার শুঁঠ প্রস্তুত করিতে হয়। হরিদ্রা কম সিদ্ধ হইলে 'দরকোচা' পড়িয়া যায় শুঁঠ প্রস্তুত হয় না; অধিক সিদ্ধ হইলে, রং জ্বলিয়া যায়। সেইজন্য সিদ্ধ করিবার ভাগ জানা চাই। বড় 'তোলো' হাঁড়িতে গোময় জল দিয়া উনানে রাখিতে হয়। অন্য দিকে একটা ছোট ঝুড়িতে হলুদ রাখিয়া, হাঁড়ির জল গরম হইলে তাহার মধ্যে ঝুড়ি সমেত হলুদ ডুবাইয়া দিতে হয়। দুইবার উৎলাইয়া উঠিলেই তাড়াতাড়ি নামাইয়া ঢালিয়া চাটাই চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে ছালা দিয়া ডলিয়া দিলে বেশ গোল ভাবে শুকাইয়া শুঁঠ প্রস্তুত হয়। না ডলিলে সমান ভাবে হলুদ শুষ্ক হয় না। অন্য প্রকারেও হলুদ সিদ্ধ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রতি মণ কাঁচা হলুদে ১

তোলা কলিচূণ দ্বারা উপরোক্ত প্রকারে সিদ্ধ করিলে ভাল রং ফলে। হলুদ প্রায় সমস্ত তরকারীতে মশলা-রূপে ব্যবহৃত হয়। রং করিবার নিমিত্তও ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

হিন্দুদের প্রত্যেক শুভকার্য্যে ইহা একটী বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার বহুবিধ গুণ আছে, যথা—উষ্ণবীর্য্য, বর্ণবর্দ্ধক, রুক্ষ, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক ও দাহনিবারক এবং কফ, বাত, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বকদোষ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, প্রমেহ, অরুচি ও বিষদোষে উপকারক।

আম আদা

আম-আদা আদা জাতীয় উদ্ভিদ্। হলুদ ও আম-আদা গাছের পাতার ও মূলের আকার একই প্রকার, বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে কচি আমের গন্ধ অনুভূত হওয়ায় 'আম-আদা' এইরূপ নাম হইয়াছে। ইহা হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আম-আদা বিশুদ্ধ ভাষায় কর্পূর হরিদ্রা এবং হিন্দিতে কর্পূর হলদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার গুণ বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, শীতল, মধুর-তিক্ত রস এবং কণ্ডুর শান্তিকারক।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজ মূল জাতীয় উদ্ভিদ্। মধ্য এশিয়া অথবা পশ্চিম এশিয়া ইহার আদি জন্মস্থান বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। পূর্ব্বে ইহা হিন্দুর অভক্ষ্য ছিল। কিন্তু আজকাল প্রায় অনেক গৃহেই পেঁয়াজ তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাছ মাংসের সহিত পেঁয়াজ না হইলে চলে না। মাংসে পেঁয়াজ দিয়া রন্ধন করিলে উহা অতি সহজে সুসিদ্ধ হয় এবং ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয়। গন্ধের জন্য ইহা মশলারূপেও তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে মুড়ী প্রভৃতির সহিত কাঁচা পেঁয়াজ আহার করিয়া থাকেন।

পেঁয়াজ নানাজাতীয় আছে কিন্তু এদেশে সাধারণতঃ পাটনাই ও ছাঁচি এই দুই প্রকারের পেঁয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়। পাটনাই পেঁয়াজের আকার বড় এবং ছাঁচি পেঁয়াজের আকার ক্ষুদ্র ও তীব্র গন্ধযুক্ত। আজকাল এদেশে সিল্‌ভার কিং, প্রাইজ টেকার জায়েণ্ট, ফ্ল্যাট ট্রিপলি, বারমুড়া, জায়েণ্ট জিটাও, রেড বার্লিন প্রভৃতি বিদেশী পেঁয়াজও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বীজ হইতে চারা বাহির করিয়া অথবা গেঁড় পুঁতিয়া উভয় প্রকারেই ইহার চাষ করিতে পারা যায়। ছাঁচি পিঁয়াজের গেঁড় বপন করিলে উহার গোড়ায় অনেকগুলি ছোট ছোট পেঁয়াজ জন্মে। কিন্তু পাটনাই পেঁয়াজের একটি মাত্র মূল জন্মে।

ছায়াবিহীন হালকা দোআঁশ জমিতে পেঁয়াজ চাষের স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। পেঁয়াজের জমি চষিয়া যতই আলগা ও হালকা করিতে পারা যায় ততই ভাল। বীজগুলি প্রথমতঃ বুনিয়া দিয়া তাহার উপর সরস হালকা মাটি ছড়াইয়া বীজগুলিকে খেজুর চাটাই বা দর্ম্মা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। চারা বাহির হইলে আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিবে। প্রয়োজন মত ঝাঁঝরা করিয়া জল প্রয়োগ করিবে। এইরূপে চারা প্রস্তুত করিয়া চারাগুলি একটু বড় হইলে ৯" ইঞ্চি অন্তর অন্তর হালকা দোআঁশ মাটিতে জল দিয়া কাদা করিয়া চারাগুলি এমন ভাবে বসাইতে হইবে যেন চারার শিকড় মাত্র কাঁদায় লাগিয়া থাকে এবং গেঁড় মাটির উপর থাকে। রোপণের ৪।৫ দিন বাদে সেচ দিতে হইবে। ইহাকে 'নাগাড় সেচ' কহে। তারপর জমি শুকাইলে কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিয়া ৮।১০ দিন অন্তর এক-একটা সেচ দিবে। সেচের পর

জো হইলেই ছাই ও খইল মিশ্রিত করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া খুসিয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলে পেঁয়াজ বড় হয়। কোন কোন স্থানে বীজ ছিটাইয়া বপন করা হইয়া থাকে। কিন্তু ছিটাইয়া বীজ বপন করা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত প্রথায় চারা নাড়িয়া বসানই যুক্তিসংগত।

শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বীজ এবং অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত উহার মূল বপন করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি জমিতে আট তোলা বীজ বা ৩০।৩৫ সের মূল বা গেঁড় লাগে এবং ২৫/ মণ হইতে ৪০/ পর্য্যন্ত ফলন হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১॥ মণ খইল, ৪০/ মণ গোবর সার ও ৩০ সের পটাস সার ব্যবহার করিতে পারা যায়। গাছ একটু বড় হইলে বিঘা প্রতি ১/০ মণ কি সওয়া মণ সালফেট অফ এমোনিয়া জলে গুলিয়া জমিতে ছিটাইয়া দিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পেঁয়াজের জমিতে প্রথম হইতেই জল সেচনের বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। মধ্যে মধ্যে জমি নিড়ান আবশ্যক।

পেঁয়াজের ফুলবৃন্তকে 'কলি' বলে। বীজ হইতে যে চারা উৎপন্ন হয় তাহাতে প্রথম বৎসর কলি জন্মে না। দ্বিতীয় বৎসর হইতে কলি জন্মিয়া থাকে। পেঁয়াজের

কলি মধ্যে মধ্যে কাটিয়া না দিলে মূল পরিপুষ্ট হয় না। অধিকন্তু পেঁয়াজও ছোট হইয়া যায়।

পেঁয়াজের কলি যতই কাটিয়া লওয়া যায় ততই ভাল। পেঁয়াজের কলি সব্জীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিলে প্রথম বৎসর প্রতি চারার গোড়ায় একটি করিয়া পেঁয়াজ জন্মে। মূল হইতে জন্মান পেঁয়াজ অপেক্ষা বীজ হইতে উৎপন্ন পেঁয়াজ অধিক দিবস গৃহে রাখা চলে। পেঁয়াজের কলির মাথায় একপ্রকার সাদা বর্ণের বীজ-কোষ জন্মে। এই বীজ-কোষের মধ্যে বীজ থাকে। বীজ রাখিতে হইলে এই কলিগুলিকে পরিপক্ক হইতে দিতে হয়। অতঃপর কোষগুলিকে কাটিয়া আনিয়া বীজ বাহির করিয়া লইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইয়া বায়ুরুদ্ধ স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিতে হয়। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বীজের উৎপাদিকা-শক্তি দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় কিন্তু আমাদের দেশে এক বৎসরের বেশী স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ চৈত্র মাসে পেঁয়াজ উত্তোলন করা হইয়া থাকে। গাছ সম্পূর্ণ শুকাইয়া না গেলে পেঁয়াজ উত্তোলন করা উচিত নয়। গাছ শুকাইবার পূর্ব্বে পেঁয়াজ অপুষ্ট অবস্থায় থাকে।

পেঁয়াজ বহুবিধ গুণসম্পন্ন, ইহা ব্যবহার করিলে গায়ে খোস-পাঁচড়া হয় না এবং জ্বর, গুল্ম, শ্লেষ্মা, শূল প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অধিকন্তু ইহা রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত, পিত্ত ও কফনাশক এবং বমন-নিবারক। ইহা কর্ণশূলরোগে বিশেষ উপকারক। বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি কামড়াইলে ইহার রস ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

লশুন

সচরাচর ইহাকে রসুন নামে অভিহিত করা হয় কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম লশুন। আমরা সচরাচর শ্বেতবর্ণের লশুন দেখিয়া থাকি কিন্তু লালবর্ণেরও এক জাতীয় লশুন আছে। ইহার মূল হইতেই চারা প্রস্তুত করিতে হয়। চাষ ও পরিচর্য্যা সমস্তই মূল হইতে জন্মান পেঁয়াজের মত কিন্তু লশুনের কলি বহির্গত হয় না।

পেঁয়াজ অপেক্ষা লশুন বিশেষ উপকারক। লশুন হইতে একপ্রকার কবিরাজি তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমবাত

রোগে ইহার প্রলেপ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে লশুনের বিবিধ গুণ আছে, যথা—ইহা গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং অজীর্ণ, হৃদরোগ, অরুচি, কুক্ষিশূল, মূত্র-কৃচ্ছ্র, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য ও বাতশ্লেষ্মাজনিত পীড়া সমূহের শান্তিকারক। ডাক্তারী মতে ইহা ক্যাল-সিয়াম প্রধান। বসন্তকালে লশুন খাওয়া হিতকর। এই সময়ে ইহা ব্যবহার করিলে বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। আমাদের দেশে ক্ষতরোগে ও বাতরোগে লশুনের পুলটিস দেওয়া প্রচলিত আছে। এই সমস্ত রোগে লশুনের পুলটিস দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় ইতালীবাসীরা অধিক লশুন খাইয়া থাকে, সেইজন্য সেখানে রোগের প্রাদুর্ভাব কম।

লীক

ইহা পেঁয়াজ জাতীয় সব্জী বিশেষ। ইহার পাতা লম্বা। ইহার পাতায় পেঁয়াজের গন্ধ অনুভূত হয়। লীকের জমি পেঁয়াজের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা পেঁয়াজের গোত্র হইলেও পেঁয়াজের জমি যে পরিমাণ শুষ্ক হইলেও ক্ষতি হয় না ইহার জমি তদপেক্ষা ভিজা অর্থাৎ রসপান্তা হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে একটী বড় গামলায় বা ভাটীতে বীজ বপন করিয়া চারাগুলি একটু বড় হইলে জমিতে লাগাইতে হইবে। ইহার বীজ জমিতে ছড়াইয়া বপন করাও চলে। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে।

হালকা দোআঁশ ও সারাল মাটিতে লীকের চাষ করা আবশ্যক। লীকের জমিতে গোবর ও খইল সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। জমি প্রস্তুত হইলে এক হাত আন্দাজ লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ১০।১২ ইঞ্চি আন্দাজ ব্যবধানে চারা লাগাইতে পারা যায়। গাছ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার মূল মাটি দিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক,—যেন উহা উপরে জাগিয়া না থাকে। গাছের গোড়ায়

মাটি মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া আলগা করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। জমিতে যাহাতে কোন আগাছা না জন্মে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন মত জমিতে জল সেচন আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৩।৪ তোলা বীজ লাগে। ২।৩ মাসে উহা আহারের উপযোগী হইয়া থাকে।

মূলা

ইহা একপ্রকার কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ্। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্-গণের মতে উত্তর ভারতবর্ষ ও চীন প্রদেশই মূলার স্বাভাবিক জন্মস্থান। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বা ভারতের উপকূলবর্ত্তী দ্বীপ সমূহ হইতে লইয়া গিয়া ইউরোপে ইহার চাষ আরম্ভ হয়।

শীতের সব্জীর মধ্যে মূলা অন্যতম। চেষ্টা করিলে ইহা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায়।

হালকা বেলে দোআঁশ জমি মূলার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিলে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ক্ষেত হইতে ফসল তুলিতে পারা

যায়। এই সময়ের মূলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের মূলাবীজ চৈত্র মাসে, বর্ষাতি মূলাবীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং শীতের মূলাবীজ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে।

মূলার জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক সার মিশাইয়া মাটি আলগা করিয়া রাখা উচিত। সকল প্রকার মূলার মাটি ঝুরা এবং সারবান হওয়া চাই। মূলার জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিতে পারিলে মূলা বড় হয় ও শীঘ্র জন্মে। গ্রীষ্মকালে যে মূলা উৎপন্ন করিতে হইবে তাহাতে অধিক জল সেচন আবশ্যক।

মূলার জমিতে পুরাতন গোবর ও খইল সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ৪০/০—৫০/০ মণ গোবর সার ও ৬।৭ মণ খইল সার অথবা বিঘা প্রতি ১ মণ সালফেট অফ এমোনিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বর্ষাকালে যাহাতে জমিতে জল না বসে এজন্য বর্ষার মূলা ঈষৎ উচ্চ জমিতে চাষ করা উচিত। মূলার মাটি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক গুঁড়াইয়া ধূলার মত করিতে হইবে। মাটি ভালরূপ চূর্ণ না হইলে তাহাতে মূলা ভাল জন্মে না।

মূলার জমি যে উত্তমরূপে কর্ষণ করা এবং মাটি উত্তমরূপে চূর্ণিত হওয়া দরকার তাহা নিম্নলিখিত খনার বচন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"শতেক চাষে মূলা তার অর্দ্ধেক তূলা"

মূলাবীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। বীজের সহিত অল্প পরিমাণ শুষ্ক ঝুরা মাটি মিশাইয়া ছড়াইলে বীজ জমিতে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে। বপনের পর বীজগুলি যাহাতে উপরে জাগিয়া না থাকে এজন্য হস্ত দ্বারা মৃদুভাবে মাটি ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া দিতে হয়। অধিক জমিতে মূলা চাষ করিলে জমিতে মই টানিয়া সমান করিয়া দেওয়া উচিত। বিঘা প্রতি পাটনাই বীজ /২ সের এবং অন্যান্য জাতি /॥ সের হইতে /১ সের লাগে।

যে স্থানে চারা ঘনভাবে জন্মিবে সেইস্থান হইতে আবশ্যক মত ২।৪টি চারা উঠাইয়া পাতলা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক চারা যেন অন্ততঃ ৬।৭ ইঞ্চি পৃথক্ ভাবে থাকে। এক স্থানে অনেকগুলি চারা ঘনভাবে থাকিলে উহাদের মূল বৃদ্ধির পথে বিশেষ অন্তরায় ঘটিবে।

এক মাস হইতে দেড় মাসের মধ্যেই মূলা আহারের উপযোগী হইয়া থাকে। অধিক দিন জমিতে রাখিতে পারিলে মূলার আকার বড় হয় বটে কিন্তু উহার কোন আস্বাদন থাকে না, অধিকন্তু ভিতরে ছিবড়া জন্মে ও ভালরূপ সিদ্ধ হয় না। এজন্য মূলা কচি অবস্থায় আহার করা উচিত। হিন্দুরা মূলা মাঘ মাসে খায় না। সেইজন্য যাহাতে পৌষ মাসের মধ্যে মূলা বিক্রয় হইয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করা উচিত।

দেশী ও বিদেশী নানাজাতীয় মূলা আছে। তন্মধ্যে সাদা, লাল, হলদে, কাল, বেগুণে প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গের এবং লম্বা, গোল, চ্যাপ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির মূলা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে মেদিনীপুরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূলার চাষ হইয়া থাকে। দেশী মূলার মধ্যে কাঁথির ও বোম্বাই মূলা আয়তনে ও আস্বাদনে উৎকৃষ্ট। মূলার এত অধিক জাতি আছে যে তাহা বর্ণনা করা যায় না, তবে বাজারে কাঁথির ও বোম্বাই মূলাই অধিক প্রচলিত এবং ব্যবসার পক্ষে ইহাই লাভজনক।

জাপানী মূলা

জাপানী মূলাও বিভিন্ন আকারের আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি ধামার মত, কতকগুলি বোতলের মত, কতক-গুলি কলসীর মত, কতকগুলি বা সর্পের ন্যায়। জাতি-বিশেষে এক-একটী মূলার ওজন ১৫ সের পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই মূলাগুলি বড় হয় বলিয়া ইহাদের ঘন করিয়া বপন করিতে নাই। ইহাদের চাষের জমিও কিছু বেশী গভীর করিয়া চাষ দেওয়া আবশ্যক। এই মূলাগুলি প্রস্তুত হইতে ২।৩ মাস সময় লাগে।

এদেশে মূলা হইতে নানাবিধ তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মূলার কচি পাতাও শাকের ন্যায় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে চতুর্থী তিথিতে মূলা ভক্ষণ নিষেধ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে মূলার গুণ, যথা—কচি মূলা উষ্ণ-বীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, স্বর-পরিষ্কারক, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগে উপকারক। বড় মূলা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও ত্রিদোষ-নাশক। শুষ্ক মূলা লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক ও শোথ-নিবারক। মূলার বীজ হইতে একপ্রকার ঔষধি তৈল

হইয়া থাকে। উহা তীক্ষ্ণ, সারক, বায়ু, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, ত্বকদোষ ও শিররোগে হিতকর। মূলার বীজ হইতে সরিষার তৈলের ন্যায় তৈল পাওয়া যায়। মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে উক্ত তৈলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

গাজর

গাজর মূল জাতীয় সজ্জী। ইহাকে ভাল কথায় গর্জ্জর কহে। ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান ইউরোপ ও পশ্চিম হিমালয়।

সাধারণ দোআঁস মাটিতে গাজরের চাষ করা যাইতে পারে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসই গাজরের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। স্থান বিশেষে ইহা ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলে।

. ইহার জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করা উচিত। চারা নাড়িয়া বসাইবার আবশ্যক হয় না। মূলার ন্যায় উহার বীজ জমিতে ছিটাইয়া বপন করা চলে, তবে স্থানে স্থানে ঘন চারা জন্মিলে তাহার মধ্য হইতে কিছু চারা তুলিয়া সেগুলিকে ফাঁক ফাঁক করিয়া দিতে

হয়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে অন্ততঃ ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া উহা বাতাসে শুকাইয়া লইয়া জমিতে বপন করিতে হয়। বীজ ভিজাইয়া বপন করিলে উহা হইতে শীঘ্র শীঘ্র চারা বাহির হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বীজ হইতে চারা বাহির হইতে ৮।১০ দিন লাগে।

চাষের ২।৩ মাস পূর্ব্বে গাজরের জমিতে বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ গোবর সার, ১/০ মণ খইলচুর্ণ, ২০ সের সালফেট অফ এমোনিয়া ও ১৫ সের সালফেট অফ পটাস ব্যবহার করিতে পারা যায়।

গাজরের ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করা বিশেষ আবশ্যক। সময় সময় নিড়ান দিয়া গোড়া খুলিয়া আল্‌গা করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। জমিতে তৃণাদি আগাছা থাকিলে তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত। বিঘা প্রতি দেশী (পাটনাই) গাজরের বীজ /২॥ সের ও বিদেশী বীজ /৸ পোয়া লাগে। বিঘা প্রতি ফলন প্রায় ৫০/ মণ হইতে ৬০/ মণ হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দেশী ও বিদেশী গাজর আছে। তন্মধ্যে লং অরেঞ্জ, নেনটাস, হাফলং, ফ্রেঞ্চহর্ণ, আল্ট্রিংহাম, অক্সহার্ট প্রভৃতি গাজর মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত। কারণ ইহারা সরস এবং সুগন্ধযুক্ত, অধিকন্তু ইহাতে

ছিবড়া থাকে না। সব্জী হিসাবে যেগুলি চাষ করা হয় তাহা পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই ব্যবহার করা উচিত, নতুবা বিস্বাদ হইয়া যায় ও ছিবড়াযুক্ত হয়। কচি অবস্থায় ইহার আস্বাদ কোমল ও সুগন্ধযুক্ত থাকে।

গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি জন্তুদিগকে গাজর খাওয়াইলে উহারা বলিষ্ঠ ও স্থূলকায় হয় এবং অধিক দুগ্ধ প্রদান করে। আমাদের দেশে বিদেশী গাজর সব্জীরূপে এবং পাটনাই, বেলজিয়ান, সাহারাণপুর প্রভৃতি জাতীয় গাজর পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত। যে সমস্ত জাতীয় গাজর পশু-খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের জন্য আড়াই ফুট আন্দাজ গভীর করিয়া এবং যাহা মনুষ্য-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহার জন্য ১৫ ইঞ্চি গভীর করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে গবাদি পশুদিগকে খাওয়াইবার জন্য ছিবড়াযুক্ত গাজরের প্রচুর পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে।

গাজর মুলার ন্যায় সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহা মধুররস, রুচিকারক, কফ ও পিত্তনাশক এবং ক্রিমি, শূল, দাহ ও তৃষ্ণায় শান্তিকারক।

বীট

ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ। হিন্দিতে ইহা চুকন্দর এবং বাঙ্গালায় বীট নামে অভিহিত।

ছায়াবিহীন হাল্‌কা দোআঁশ জমিতে বীট চাষ করিতে পারা যায়। যে জমিতে বীট চাষ করিতে হইবে তাহা অতি উত্তমরূপে কর্ষণের প্রয়োজন। জমি যত গভীর ও উত্তম কর্ষিত হয়, ফসলও তত উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। ইহার জমিতে বিঘা প্রতি ১৭।১৮ মণ গোবর সার, ৩০ সের খইলচূর্ণ ও রাসায়নিক সার গাজরের স্থায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। বীট চাষে বিঘা প্রতি /৫ সের লবণ সাররূপে ব্যবহার করা চলে। জমিতে লবণ প্রয়োগ করিবার সময় উহা জলে গুলিয়া ব্যবহার করা উচিত।

বীটের বীজ দেখিতে অনেকটা পালম শাকের স্থায়। ইহার বীজ অতি স্থূল। এক-একটা বীজে অনেকগুলি চারা হয়। খুব ছোট অবস্থায় তাহাদের পৃথক্ করিয়া

দেওয়া উচিত। বীজ হইতে চারা বাহির হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এইজন্য বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ২৫।৩০ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া গোবর ও পাঁশ মাখাইয়া কচুপাতায় কিংবা কলাপাতায় প্যাক করিয়া পাঁশ গাদায় ৩।৪ দিন রাখিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। বীজ পাতলা ভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে পারা যায়। নতুবা ভাটীতে বীজ ছড়াইয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া ৪।৫ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে পূর্ব্ব কর্ষিত জমিতে এক হাত অন্তর লাইন দিয়া অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে রোপণ করা বিধেয়।

চারাগুলি বেশ বসিয়া গেলে উহার গোড়া মাটি দিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হইবে, যেন গাছের মূল উপরে জাগিয়া উঠিতে না পায়। জমিতে আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল সেচন করা ও নিড়ানি দিয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

বীট নানাজাতীয় আছে ; তন্মধ্যে ইজিপ্‌সিয়ান, হাফলং ব্লড, ফায়ারবল, গ্লোব, ব্লাডরেড প্রভৃতি মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যাঙ্গোল্ড নামক এক জাতীয় বীট আছে উহা গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। একারণ পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই

পশু-খাদ্য বীট বিঘা প্রতি ২৫ টন ফলে এবং তিন মাসে হয়।

বীট পালমের পাতাও দেখিতে অনেকটা পালম শাকের মত। গাছে অত্যধিক পাতা জন্মিলে উহার মূলকাণ্ড বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এইজন্য গাছে অধিক পাতা জন্মিতে দিতে নাই। ইহার পাতা শাকের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ⁄৮ পোয়া হইতে ⁄১ সের বীজ লাগে। ২॥০ মাস হইতে তিন মাসের মধ্যে বীজ আহারের উপযোগী হইয়া থাকে।

অন্যান্য মিষ্ট সব্জীর মধ্যে বীট অন্যতম। জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে বীট হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১০০ টন বীট হইতে ১৮ টন চিনি হয়।

পার্সনিপ

ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান ইউরোপ। ইহা গাজরের ন্যায় মূল জাতীয় সব্জী। ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। গাজরের বীজ যে সময় বপন করা হয়, পার্সনিপ বীজ তাহা অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বে বপন করা হইয়া থাকে। ইহার বীজ সকল সময়ে সমান ভাবে অঙ্কুরিত হয় না, এজন্য পুনরায় বীজ বপনের আবশ্যক হয়। সাধারণতঃ টান জমিতে ইহার বীজ ভালরূপ অঙ্কুরিত হয় না। ইহার ফসল সহজে নষ্ট হয় না, সেইজন্য জমিতে অধিক দিন পর্য্যন্ত রাখা চলে। অনেকস্থলে জমি হইতে তুলিয়া ইহা বালি অথবা ছায়ের গাদার মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হয়। বীজ বপনের পর হইতে তিন মাসের মধ্যে ইহা আহারের উপযোগী হয়। ইহাদের আবাদ প্রণালী গাজরের ন্যায় প্রায় একই প্রকার। হলোক্রাউন, হাফলং, ষ্টুডেণ্ট প্রভৃতি ইহার কয়েকটি জাতি আছে। এদেশে পার্সনিপের চাষ বিশেষ প্রচলিত হয় নাই।

সালসিফাই (সব্জী সামুক)

ইহা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। গ্রেট ব্রীটেন ও য়ুরোপের অন্যান্য অংশ ইহার জন্মস্থান।

গাজরের ন্যায় এই উদ্ভিদের মূল উপাদেয় খাদ্য সব্জীর অন্তর্গত। ভারতে ইহার ব্যবহার অতি বিরল। সামান্য যত্নে গাজর ও শালগমের ন্যায় ইহা জন্মান যায়। মূলা, বীট, গাজর ও শালগমের যেমন নিজস্ব একটা গন্ধ আছে ইহারও মৃদু গন্ধ স্বতঃই শামুকের কথা মনে করাইয়া দেয়। সেইজন্য ইহাকে সব্জী শামুক বা Vegetable oyster বলে। ইহা পুষ্টিকর ও বলকারক সব্জী। কচি পাতা সালাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাজরের ন্যায় মূল লম্বা, শাদা, মসৃণ খোসা ও শস্য শাদা। পত্রগুলি ছাই রঙের সবুজ, সরু ও লম্বা। দেখিতে অনেকটা ঘাসের পাতার মত।

গভীর ভাবে কর্ষিত আঠাল দোআঁশ রসপাস্তা সারযুক্ত মাটিতে ইহা ভাল জন্মায়। মূল খাদ্যোপযোগী হইতে ৩৷৹ মাস সময় লাগে। উপযুক্তরূপে প্রস্তুত জমিতে ১ফুট ব্যবধান জুলিতে ৪-৫ ইঞ্চি দূরে দূরে ১ ইঞ্চি মাটি দিয়া বীজ চাপা দিতে হয়। শুষ্ক মাটিতে ইহার বীজ জন্মায় না,

আবার অতিরিক্ত ভিজা জমিতেও বীজ পচিয়া যায়। সেজন্য সমস্ত বীজ একবারে না পুতিয়া পরীক্ষা করিয়া যো বুঝিয়া বপন করা বিধেয়। বীজগুলি কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া বপন করা ভাল। শীতপ্রধান স্থানেও ঢাকা না দিয়া ইহারা জন্মায়। কুয়াসা ও বরফপাতের সময় তুলিয়া ঘরে রাখাও চলে ও পুনরায় বপন করিলে গাছ জন্মায়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ মূল পাওয়া যায়।

ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে বীজ বপন প্রশস্ত। বিঘা প্রতি ৩ পাউণ্ড বীজ প্রয়োজন।

ইহা বেশম দিয়া ভাজিয়া খাইতে খুব সুস্বাদু লাগে। তা'ছাড়া বীট ও গাজরের ন্যায় রান্না করিয়াও খাওয়া যায়। পেটের পীড়ার পক্ষে ইহা উপকারী।

স্করজোনেরা বা কাল সালসিফাই :—স্পেন দেশের চিরস্থায়ী মূলজ উদ্ভিদ্। ইহার মূল শাঁসাল, অনেকটা পালম শাকের মোটা শিকড়ের ন্যায়; গন্ধ ও আকার স্যালসিফাইএর ন্যায় কিন্তু রং কাল। স্যালসিফাইএর ন্যায় ইহার চাষ করিতে হয়। মূল অত্যন্ত ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত ও খাদ্যোপযোগী হয়। সেইজন্য জমিতে বহুদিন রাখিলেও ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে। ইহা অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপসিয়া রোগের পক্ষে উপকারক।

রন্ধনের পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া ধৌত করিয়া লইতে হয়। ভাব্‌না দিয়া নরম হইলে ভাজিয়া তরকারী রন্ধন করিতে হয়।

ওলকপি

ইহা কন্দ জাতীয় গোলাকার সজ্জী। অনেকে ইহার আদি জন্মস্থান জার্ম্মাণী বলিয়া অনুমান করেন। অন্যান্য কন্দ জাতীয় সজ্জী মৃত্তিকার মধ্যে জন্মে কিন্তু ওলকপির কন্দ মাটির উপরিভাগে জন্মিয়া থাকে। চারা রোপণের পর গাছ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডের গোড়াটী স্ফীত হইতে থাকে এবং ক্রমে উহা গোল কন্দে পরিণত হয়। ওলকপির পাতার সহিত কপি পাতার সাদৃশ্য থাকায় এবং কন্দের আকৃতি অনেকটা ওলের মত বলিয়া বোধ হওয়ায় ইহা ওলকপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সারযুক্ত দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। এইজন্য ছায়াবিহীন দোআঁশ জমি ইহার চাষের জন্য নির্ব্বাচন করা উচিত। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক উহাতে সার মিশ্রিত

করিতে হইবে। ইহার জমিতে বিঘা প্রতি ২০।২২ মণ গোবর সার, ৩০ সের সালফেট অফ এমোনিয়া ও ২০ সের সালফেট অফ পটাস এবং চারা জমিতে নাড়িয়া বসাইবার ১৫।১৬ দিন পরে এক মণ রেড়ি অথবা সারষার খইলচূর্ণ ব্যবহার করিতে পারা যায়। মৃত্তিকা প্রস্তুত, বীজ বপন ও চারা রোপণ প্রণালী বাঁধাকপির ন্যায় একই প্রকার। সাধারণতঃ ভাদ্র আশ্বিন মাসে ওলকপির বীজ বপন করা হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত হইলে ও চারাগুলি ৩।৪ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে হাপোর হইতে উঠাইয়া জমীতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি এক হাত অন্তর লাইন দিয়া আধ হাত ব্যবধানে বসানই যুক্তিসঙ্গত। বাঁধাকপি বা ফুলকপির ন্যায় ইহার চাষ তত আয়াসসাধ্য নহে। ইহা অতি সহজেই জন্মিয়া থাকে। জমিতে আগাছা জমিতে না দেওয়া, গাছের গোড়ার মাটি নিড়ানি দ্বারা আলগা করিয়া দেওয়া এবং জমিতে জল সেচন ভিন্ন ইহার অন্য কোন পাট নাই। বিঘা প্রতি ৩।৪ তোলা বীজ লাগে এবং দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যেই ওলকপি আহারের উপযোগী হয়।

মৃত্তিকার উপরিভাগে থাকে বলিয়া ওলকপির কন্দ অধিক বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। বেশী বড় করিবার

চেষ্টা করিলে ওলকপি ক্রমশঃ শক্ত হইয়া যায় এবং ভিতরে ছিবড়া জন্মে। ওলকপির কন্দ অধিক বড় হইতে না দিয়া আহারের জন্য কোমল অবস্থায় তুলিয়া লওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে তরল সার প্রয়োগ করিতে পারিলে ওলকপি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গাছে তরল সার দিলে পত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। অধিক পাতা জন্মিলে সামান্য দুই চারিটি মাত্র পাতা রাখিয়া পুরাতন পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে নতুবা, কাণ্ড পরিপুষ্ট হইতে পারিবে না।

জাতিভেদে ওলকপি সাদা, সবুজ ও বেগুণে প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঁধাকপি বা ফুলকপির ন্যায় ইহা সকলের প্রিয় নহে। বাঁধাকপি বা ফুলকপির ন্যায় ইহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না সত্য, তথাপি ইহার চাষে লাভ নিতান্ত মন্দ নহে।

শালগম

ইহা মূলজ সজী। অনেক দিন হইতে এদেশে ইহার চাষ হইয়া আসিতেছে। ইহার আদি জন্মস্থান যে কোথায় তাহা ঠিক জানা যায় নাই, তবে কেহ কেহ ইহা ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। ওল-কপির সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ওলকপির কন্দ মাটির উপরে জন্মে এবং শালগমের মূল এগুা মূলার ন্যায় কতকাংশ মাটির মধ্যে জন্মে।

ইহার জন্য হাল্‌কা দোআঁশ মাটি আবশ্যক। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত শালগমের বীজ বপন করা যাইতে পারে। মূলার ন্যায় উত্তমরূপে চষিয়া শালগমের জমি প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার জমিতে ১৪।১৫ মণ গোবর, ১৴০ মণ খইল সার, ২৫ সের সালফেট অফ এমোনিয়া ও ১৫ সের পটাস সার ব্যবহার করা চলে। মাটি কোমল ও সারবান হইলে মূল দ্রুত বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে পারে। জমি প্রস্তুত হইলে মূলার ন্যায় ইহার বীজও ফাঁক ফাঁক করিয়া ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। আবশ্যক হইলে গামলায় অথবা ভাটীতে চারা

প্রস্তুত করিয়া ৭।৮টী পাতা বাহির হইলে সেগুলি নাড়িয়া জমিতে ৭।৮ ইঞ্চি অন্তর বসান চলে। বিঘা প্রতি প্রায় /।৶০ দেড় পোয়া বীজ লাগে এবং ৩০।৪০ মণ ফলন হয়। তুই কিংবা আড়াই মাসের মধ্যে শালগম আহারের উপযোগী হইয়া থাকে। টান মাটিতে এবং গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহার জমিতে অধিক পরিমাণে জল সেচনের আবশ্যক হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দেশী ও বিদেশী শালগম আছে, তন্মধ্যে স্নোবল, ফ্ল্যাটডাচ, রেডটপ, পার্পলটপ প্রভৃতি বিদেশী শালগম সব্জীরূপে ব্যবহারের জন্য চাষ করা উচিত। দেশী শালগমের মধ্যে পাটনাই, সাহারাণপুর, কাশ্মীর প্রভৃতি জাতি সহজে জন্মিলেও আস্বাদনে বিদেশী জাতির সমতুল্য নহে। রুটাবাগা, সুইডিস্, পাটনাই প্রভৃতি কয়েক জাতীয় শালগমের ভিতরে ছিবড়া জন্মে। এইজন্য উহা গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঁধাকপি

বিগত প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ইহার নামও কেহ জানিত না। আজকাল আমাদের মধ্যে ইহা বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি ইহা আমাদের দেশে শীতকালের প্রধান সব্জী মধ্যে পরিগণিত। ইংলণ্ড, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এবং ভূমধ্য-সাগরের উপকূলবর্ত্তী অরণ্যময় প্রদেশই ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান।

পূর্ব্বে কেহ বাঁধাকপির চাষ জানিত না, বন-জঙ্গলে ইহা স্থান পাইত। ওয়েল্‌স্‌ ও হল্যাণ্ডবাসীরা প্রথমে ইহা সব্জী হিসাবে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ইহা ভারতে আনীত হয়। আজকাল ইহার চাষ এদেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে ইহা স্বভাবতঃ জন্মায় সেই সমস্ত স্থানে ইহার জন্য বিশেষভাবে চাষের আবশ্যক করে না।

ইহা শীতপ্রধান দেশের সব্জী, সেজন্য উহা উষ্ণপ্রধান স্থানে শীতকাল ব্যতীত অন্য সময়ে জন্মাইতে পারা যায় না। এদেশে শীতপ্রধান পার্ব্বত্য স্থান সমূহে ইহার চাষে বেশ সুফল লাভ করা যায়। একটু চেষ্টা করিলে দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থান সমূহে বাঁধাকপি বারমাস জন্মাইতে পারা যায়। বাঁধাকপির অনেক বিভিন্ন জাতি আছে, সবগুলি একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না। ইহাকে সাধারণতঃ জলদি, মাধ্যমিক এবং নাবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জাতি বিশেষে ইহারা অগ্র-পশ্চাৎ জন্মিয়া থাকে এবং আকার, গঠন ও বর্ণভেদে ইহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; যথা—জার্সিওয়েক-ফিল্ড বা নারিকেলা, আর্লি ফ্লাট ডাচ, মাউণ্টেন হেড, ড্রামহেড, ড্যানিস বলহেড, ফ্লোরিডা হেডার, প্রাইজ মেডেল, ব্রান্স হউক, সুগার লোফ, স্যাভয়, রেডক্যাবেজ ইত্যাদি।

যাঁহারা সময়ের বহুপূর্ব্বে ফসল উৎপন্ন করিতে চান তাঁহাদের জলদি (early), সময়ের জন্য মাধ্যমিক (intermediate) এবং যাঁহারা দেরীতে অর্থাৎ সময়ের শেষে উহা পাইবার জন্য চাষ করিতে চান তাঁহাদের নাবী জাতীয় (late) বাঁধাকপির চাষ করা উচিত। একটু

বিবেচনা পূর্ব্বক হিসাব করিয়া জলদি, মাধ্যমিক ও নাবী জাতির চাষ করিলে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কপি ব্যবহার করিতে পারা যায়, অর্থাৎ জলদি জাতি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক জাতি ফুরাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নাবী জাতির ফলন পাওয়া যাইবে। বাঁধাকপির মধ্যে চ্যাপ্টা, চওড়ামাথা, বলের ন্যায় গোল মাথা, মোচাকার মাথা, কোঁকড়ান পাতা, লাল পাতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি চাষী ও গৃহস্থ নিজ নিজ আবশ্যক ও ইচ্ছানুসারে চাষ করিতে পারেন। স্থান ও মৃত্তিকাভেদে আশু, মাধ্যমিক ও নাবী জাতীয় বাঁধাকপির বীজ শ্রাবণ হইতে ভাদ্র, ভাদ্র হইতে আশ্বিন এবং আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ দোআঁশ মৃত্তিকাই বাঁধাকপি চাষের উপযোগী। জমি অতিরিক্ত টক হইলে কপির গোড়ায় স্ফীতরোগ (club root) জন্মায়। ইহার প্রতীকারের জন্য চুণের জল ব্যবহার করা উচিত।

যে জমিতে ইহার চাষ করিতে হইবে তাহার জল নিষ্ক্রামণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এইজন্য জমি প্রস্তুত করিবার সময় অল্প ঢালু করিয়া লইতে হয়। যে

জমি বৃষ্টির কিছুক্ষণ পরেই জল টানিয়া লয় এবং জমি শুষ্ক করিয়া ফেলে সেই জমির ঢাল খুব সামান্য হইলেও ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ যে জমির জল স্বাভাবিক উপায়ে নিষ্ক্রামণ হইয়া যায় তাহা খুব সামান্য ঢাল করিলেই চলিতে পারে কিন্তু যে জমির জল নিষ্ক্রামণের শক্তি কম তাহার ঢাল বেশী করা উচিত। অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থা হয় যে জমি হইতে জল কিছু নিম্নে গিয়া শক্ত মাটির সংস্পর্শে আসিয়া তথায় জমিতে থাকে। অর্থাৎ জমির উপরিভাগে কোন প্রকার জল দেখা যায় না কিন্তু নীচের মাটি শক্ত থাকায় তথা হইতে জল সরিতে দেরী হয়। এরূপ জমিতে চলতি কথায় 'জলবসা' জমি কহে। ইহা সজী চাষের, বিশেষত কপি চাষের মোটেই অনুকূল নহে। এইরূপ জমিকে ঠিক অবস্থায় আনিতে হইলে ৩।৪ ফুট গভীর করিয়া মাটি খুঁড়িয়া উল্টাইয়া উপরের মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই প্রকারে জমির মাটি বারংবার ওলটপালট করিলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জলবসা জমিতে কোন পাট না করিয়া চাষ করিলে ক্রমশঃ উপরের মাটি শক্ত খারাপ হইয়া যায় এবং পরে জমি ঠিক করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

জমিকে চাষের উপযোগী করিতে হইলে অন্ততঃ ২।৩ ফিট গভীর করিয়া কর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত মাটিকে আলোক, বাতাস ও রৌদ্র খাওয়ান উচিত এবং জমির মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করা বিশেষ আবশ্যক। মাটি বিশেষভাবে চূর্ণিত না হইলে উহার মধ্যে যে সমস্ত মিশ্রিত উদ্ভিজ্জ-খাদ্য থাকে, উদ্ভিদ্ তাহা ঠিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং ফসল ভাল হইতে পারে না। মাটিকে ২।১ দিনের মধ্যে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলে তাহাতে কাজ ভাল হয় না। ধীরে ধীরে একদিক হইতে কোপাইয়া মাটি ওলটপালট করিয়া ৫।৬ দিন ধরিয়া রৌদ্র, আলোক ও বাতাস খাওয়ান উচিত। এইরূপ করিলে মাটির অভ্যন্তরস্থ উদ্ভিজ্জ-খাদ্য গলিয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ ৫।৭ বার করিলেই মাটি স্বাভাবিক ভাবেই চূর্ণ হইয়া যায় এবং সমস্ত মাটিতেই উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র, আলোক ও বাতাস পায় বলিয়া ফসল আশানুরূপ হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যেই বাঁধাকপির চাষের জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক।

উদ্ভিদ্ মাটি হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। উদ্ভিদ্‌গণ পত্রদ্বারা বায়ু হইতেও কার্ব্বনিক

এ্যাসিড, গ্যাস, অম্লজান ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করে কিন্তু জমিতে উদ্ভিদের আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ভূমি হইতে আহারোপযোগী খাদ্য না পাইলে উদ্ভিদ্‌গণ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। কোন জমিতেই অফুরন্ত খাদ্য থাকে না। একবার ফসল উঠাইয়া লইবার সঙ্গে জমিতে উদ্ভিদের খাদ্যাংশ কমিয়া যায়। মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকিলেও অধিকাংশ খাদ্য অদ্রবণীয় ভাবে অবস্থান করে। আবার দ্রবণীয় খাদ্যের কিয়দংশ বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়। এইজন্য জমিতে সার প্রয়োগ প্রয়োজন। সার দেওয়ার উদ্দেশ্য বেশী ফসল পাওয়া। এমন ভাবে সার দেওয়ার আবশ্যক যেন জমি খারাপ না হয়। জৈব সার ব্যবহারে অথবা যে সমস্ত সার প্রয়োগে জমিতে আস্তে আস্তে কাজ করে ঐ সমস্ত সার ব্যবহারে জমি ভাল থাকে।

শুষ্ক জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। জমিতে রস থাকিতে থাকিতে উহা প্রয়োগ করা আবশ্যক। রাসায়নিক সার প্রয়োগের পর জমির মাটি জলে ভিজাইয়া দিলে ভাল হয়। উক্ত সার বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করা আবশ্যক, কারণ প্রয়োগকালে গাছে বা পাতায় লাগিলে উহার তেজে গাছ জ্বলিয়া

যায়। সম্ভব হইলে উহা তরল আকারে দেওয়া যাইতে পারে।

পতিত জমিকে চাষের উপযুক্ত করিতে হইলে চূণ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ চাষের ২-২॥ মাস পূর্ব্বে যেন চূণ প্রয়োগ করা হয়। বিঘা প্রতি ৮।১০ সের চূণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে জমিতে বারংবার লাঙ্গল মই দিয়া মাটি গুঁড়াইয়া সমতল করিয়া ফেলিতে হইবে। স্থান অল্প হইলে কোদালি দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই সময়ে জমিতে সার দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা জানিয়া রাখা দরকার যে মাটি যত আলগা ও ঝুরা হইবে ততই উহা কপি চাষের উপযুক্ত হইবে। বাঁধাকপির ক্ষেতে বিঘা প্রতি ৪০।৫০ মণ গোবর সার, ১ মণ সালফেট অফ এমোনিয়া ও ৩০ সের সালফেট অফ পটাশ এবং আবশ্যক-মত গাছ বড় হইলেও ২ মণ সরিষার খইল জলের সহিত মিশাইয়া তরল আকারে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বৃষ্টির আধিক্য হেতু এ সময় টব বা গামলার মধ্যে সাধারণতঃ বীজ বপন করা হইয়া থাকে। তলায় ছিদ্র-যুক্ত প্রশস্ত টব বা গামলা হালকা সারযুক্ত মাটি দ্বারা

পূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হইবে। বীজপাত্র সেঁতসেঁতে ও আলোকহীন স্থানে রাখিয়া দেওয়া আদৌ উচিত নহে। ঐরূপ স্থানে রাখিয়া দিলে চারাগুলি লম্বা ও বক্র হইয়া লতাইয়াযাইবার সম্ভাবনা, কারণ চারাগুলি স্বভাবতঃ আলোর দিকে হেলিতে চেষ্টা করে এবং আলোক অভাবে বক্রভাব ধারণ করে। তজ্জন্য চারাগুলিকে নিয়মিত ভাবে আলোক ও শিশির খাওয়ান উচিত। ইহাতে চারা বেশ শক্ত, সতেজ ও সরল হইয়া থাকে।

অল্প চারার প্রয়োজন হইলে টব বা গামলায় উহা জন্মান যাইতে পারে কিন্তু অধিক সংখ্যক চারা উহাতে জন্মান সহজ নহে। সেইজন্য বীজতলা বা হাপরের আবশ্যক হয়। যে স্থানে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে বীজতলা বা হাপোর বলে। হাপোরের জন্য স্থান নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যেখানে-সেখানে হাপোরের জমি মনোনীত করিলে তাহাতে বীজ ভাল অঙ্কুরিত হয় না এবং অঙ্কুরিত চারাও অনেক সময় সতেজ হয় না। অনেক সময় অঙ্কুরিত চারাগুলি পোকায় কাটিয়া ফেলে। হাপোরের জমি নির্ব্বাচন ঠিক না হইলে কেবলমাত্র সার প্রয়োগ দ্বারা এই সকল দোষ সংশোধন করা যায় না।

হাপোরের জমির চতুঃপার্শ্ব উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

প্রয়োজন অনুসারে এ সময় বৃষ্টির জন্য উপরে হোগলা বা ত্রিপল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া উচিত। যতদিন চারা ক্ষুদ্র থাকে এবং রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম না হয় ততদিন আচ্ছাদন রাখা আবশ্যক। হাপোরের জন্য ক্ষেতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। হাপোরের নিকটে যাহাতে কোন প্রকার জঙ্গলাদি না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ নিকটে জঙ্গলাদি থাকিলে পোকা-মাকড় আসিয়া চারার অনিষ্ট করিতে পারে।

হাপোরের জমি দৈর্ঘ্যে ৫ হাত এবং প্রস্থে দুই হাতের অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন অনুসারে দৈর্ঘ্য কমান যাইতে পারে কিন্তু প্রস্থ অধিক না কমাইলেই ভাল হয়। এইরূপে জমি নির্ব্বাচন করিয়া সেই জমির ৯ ইঞ্চি পরিমাণ সমস্ত মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে উহার নিম্নভাগ ঝামা অথবা শক্ত মাটি দ্বারা ৪ ইঞ্চি আন্দাজ সমস্ত স্থান ভরিয়া ইহার উপর হালকা দোআঁশ ঝুরা সারমাটি দ্বারা ভরিয়া দেওয়া উচিত। হাপোরের চতুঃপার্শ্বে শক্ত মাটি থাকা প্রয়োজন এবং লম্বা দিকে একটু ঢাল রাখিলে ভাল হয়। হাপোরের উপর যে মাটি ভরিয়া দেওয়া হইবে তাহা ধূলার ন্যায় গুঁড়া করিয়া

তাহাতে যে সার মিশ্রিত করিতে হইবে তাহাও সরু চালুনি দ্বারা চালিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। এই মাটি দোআঁশ হওয়া আবশ্যক। পাতাসার ও পুরাতন গোবর সার ইহার সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। মাটি একটু চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক।

বীজ কিভাবে বপন করিতে হইবে এখন সে বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। হাপোরে, গামলায় কিংবা বীজ-তলায় যে কোন স্থানেই বীজ বপন করা হউক না কেন, উহার মাটি বেশ সারযুক্ত হাল্‌কা ও ঝুরা হওয়া প্রয়োজন। বীজ বপনের সময় মাটি যেন বেশি ভিজা বা কর্দ্দমাক্ত না থাকে। বীজ বপনের সময় চলিয়া যাইতেছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি কর্দ্দমাক্ত মাটিতে বীজ বপন করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই অধিক হইয়া থাকে এবং অনেক সময় চারা না উঠায় পুনরায় বীজ বপন করিতে হয় এবং ইহাতে আরও বেশি বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। যে দিবস বীজ বপন করা হইবে উক্ত দিবস শুষ্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে বীজ বপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

পাতাসার অথবা পুরাতন গোবর মাটির সহিত মিশ্রিত থাকিলে বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ

ছড়াইবার সময়েও খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যা'তা' করিয়া বীজ ছড়াইলে কোন স্থানে চারা খুব বেশী ঘনভাবে জন্মে এবং কোন স্থানে খুব পাতলা ভাবে জন্মে এবং কোন স্থানে হয়ত বা মোটেই জন্মে না। বীজ বপনের সময় যাহাতে সমস্ত বীজ সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কিঞ্চিৎ বালি বা ঝুরা মাটি মিশ্রিত করিয়া বীজ ছড়াইলে বীজগুলি সমভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

অনেকে বলেন যে বীজ ছড়াইবার পর তাহার উপর বীজের স্থূলতা অনুসারে মৃত্তিকা চাপা দেওয়া উচিত, অর্থাৎ বীজের যতটুকু স্থূলতা বীজ ছড়াইবার পর তাহার উপর সেই পরিমাণে মাটি চাপা দেওয়া উচিত। কিন্তু অত অল্প পরিমাণে মাটি চাপা দিলে অনেক সময় জল দিতে গিয়া বীজ বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে চারা ভাল ফুটিতে পারে না এবং পক্ষী, পিপীলিকা ও নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গাদি অনেক সময় উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে; সুতরাং বীজের স্থূলতা অপেক্ষা কিছু বেশী মাটি বীজের উপরে চাপা দেওয়া উচিত এবং তাহা নীচের মাটি অপেক্ষা অধিক সারযুক্ত ঝুরা ও হালকা হওয়া প্রয়োজন। বীজ বপন করিবার পর মাটি শুষ্ক থাকিলে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত

ঝারি দ্বারা জল সেচন পূর্ব্বক জমি ঈষৎ ভিজাইয়া মাটি সরস করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে না পারিবেন তাঁহারা হাপোরের চতুষ্পার্শ্বে নালা কাটিয়া তাহাতে কিছুক্ষণ জল রাখিয়া মাটিকে সরস করিয়া লইতে পারেন। প্রত্যেক বীজেরই অঙ্কুরিত হইবার একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। বাঁধাকপির বীজ অঙ্কুরিত হইতে প্রায় ৪।৫ দিন সময় লাগে। নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার পরও যদি দেখা যায় যে বীজ অঙ্কুরিত হইল না, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় বীজ বপন করা উচিত। বীজ ছড়াইবার পর কোন হাল্‌কা অপ্রশস্ত সমতল তক্তা দ্বারা মাটি ঈষৎ চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। কোন প্রকার অপুষ্ট অথবা পুরাতন বীজ জমিতে বপন করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই অধিক হইয়া থাকে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা ২।৩ ঘণ্টা খুব পাতলা তুঁতের অথবা লবণের জলে ভিজাইয়া জমিতে বীজ বপন করা যাইতে পারে। এরূপ করিলে পোকার উপদ্রব কম হয় কিন্তু তুঁতের জলে অধিকক্ষণ কোন বীজ ভিজাইয়া

রাখাও উচিত নহে। অনেকে অবিশ্বস্ত স্থান হইতে পুরাতন বীজ ক্রয় করিয়া আনেন এবং জমিতে বপন করিবার পর চারা বাহির না হইলে শেষে হতাশ হইয়া পড়েন। বিশেষত যাঁহারা সখ করিয়া চাষ করেন তাঁহারা কোনক্রমে একবার অকৃতকার্য্য হইলে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন, সুতরাং পুনরায় ইহার চাষে আর তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে না। জমিতে বীজ বপনের পর কিয়ৎ পরিমাণে গন্ধকের গুঁড়া সেই জমিতে ছড়াইলে কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা বীজ বা অঙ্কুর নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

বীজ হইতে চারা প্রস্তুত হইলে উক্ত চারা রক্ষা করাও বহু যত্নসাধ্য ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যায় যে চারা মাটি হইতে বাহির হইয়াই অনেক লম্বা হইয়া উঠে ও তাহার আকার ক্ষীণ হয়। যে হাপোরে এই প্রকার চারা বাহির হয়, সেইস্থানে কিছু ঝুরা মাটি দিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপ না করিলে উক্ত চারাগুলি হেলিয়া যায় এবং দুর্ব্বল ও বক্র হইয়া পড়ে।

অধিক রৌদ্র অথবা বৃষ্টির সময় চারা আবৃত স্থানে রাখা উচিত। কোমল চারাগুলির উপর কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া না দিলে অধিক বৃষ্টিতে গাছের গোড়া কাটিয়া যাইবার এবং অধিক রৌদ্রে উহা শুকাইয়া অথবা

ঝল্‌সাইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সন্ধ্যাকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া রাখা উচিত, কারণ রাত্রের শিশির কপি চারার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চারাগুলি ৩।৪টি পত্রবিশিষ্ট হইলে গামলা অথবা বীজতলা হইতে তুলিয়া কিছুদিনের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ভাটীতে ২।৩ ইঞ্চি অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে, অন্ততঃ তুইবার এইরূপ করা প্রয়োজন। চারাগুলি তুলিয়াই জমিতে স্থায়ীভাবে বসাইলে উহা শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে পারে না, এজন্য উহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট ভাটীতে লাগাইতে হয়। ইহাতে গাছগুলি শীঘ্র তেজাল হইয়া উঠে। ভাটীর মাটি দোআঁশ, হাল্‌কা ও সারবান হওয়া চাই। হাপোরের ন্যায় ইহার মাটিও উত্তমরূপে চূর্ণ করা আবশ্যক। শীতের সমস্ত বিদেশী সজ্জীর চারা প্রথমে ভাটীতে লাগাইয়া পরে জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলিকে প্রখর রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য হোগলার আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আবশ্যক হইলে ঝারি দ্বারা অল্প অল্প জল ছিটাইতে পারা যায়। চারাগুলি ৭।৮টী পত্রবিশিষ্ট হইলে ভাটী হইতে তুলিয়া দেড় হাত অন্তর লাইন দিয়া

সওয়া এক হাত আন্দাজ ব্যবধানে প্রস্তুত জ।মতে স্থায়ী-ভাবে রোপণ করিতে হইবে। রোপণ-কার্য্য অপরাহ্নকালেই সম্পাদন করা প্রশস্ত। চারা তুলিয়া নাড়িয়া বসাইবার সময় বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। যে কোন প্রকারে চারা তুলিয়া জমিতে রোপণ করিলে সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া যায়। খুব সরু খুরপি অথবা বাঁশের শক্ত কাঠি দ্বারা উত্তোলন করিলে ভাল হয়। চারা উঠাইবার সময় যাহাতে শিকড়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। চারা তুলিবার দিন সকালে অথবা পূর্ব্বদিন বৈকালে উত্তমরূপে জল সিঞ্চন দ্বারা জমি সিক্ত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে গাছের গোড়া নরম থাকে, সুতরাং চারা উঠাইতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না এবং চারাগুলির শিকড়ে আঘাত প্রাপ্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না।

চারাগুলি রোপণ করিবার পূর্ব্বে যে জমিতে উহা স্থায়ীভাবে রোপণ করা হইবে তাহার পাট সম্পূর্ণ করিয়া রাখা আবশ্যক। পরে নিরূপিত স্থানে চারার শিকড়ের যতটুকু দৈর্ঘ্য তাহা অপেক্ষা কিছু বড় করিয়া গর্ত্ত খনন করিয়া চারা রোপণ করা প্রয়োজন। চারাগুলি রোপণ করিবার সময় উহাদের শিকড় যেন গর্ত্তে কুঞ্চিত অবস্থায়

না থাকে। গোবর ও সার-গোলা কাদাজলে চারার শিকড় ডুবাইয়া লইয়া চারা রোপণে ফল ভাল হয়। অধিক বৃষ্টির পর চারা বসান উচিত নয়। সামান্য বৃষ্টিতে মাটি অল্প ভিজিয়া গেলে চারা রোপণ করা যাইতে পারে। যতদিন না চারা রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে ততদিন কলাপাতা, কলাখোলা, পেঁপেপাতা বা ঐরূপ যে কোন আচ্ছাদন দ্বারা ঢাকিয়া রাখা এবং ক্রমে ক্রমে রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করাইয়া লওয়া আবশ্যক। রৌদ্র পড়িয়া গেলেই আচ্ছাদন খুলিয়া রাখা এবং রৌদ্রের তেজ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই আচ্ছাদনাবৃত করিয়া দেওয়া উচিত। চারার শিকড় মাটিতে বসিয়া গেলে আর ঢাকা দিবার আবশ্যক হইবে না।

চারাগুলি বেশ বসিয়া গেলে দু'পাশ হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়া উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাকে এক কথায় 'পিলিবাঁধা' বলে। এরূপ করিলে লাইনের মধ্যে মধ্যে যে খাদ বা জুলি থাকিয়া যায় তাহাতে জল-সেচনের সুবিধা হয় এবং অধিক বৃষ্টিতে জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না, বা জল বসিয়া গাছের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এরূপভাবে জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে যেন একটীতে জল সেচন করিলে সব

জুলিতে জল যায়। সময় সময় গাছের গোড়ায় খইলের তরল সার প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কোন পাত্রে খইল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। উহা বেশ ভিজিয়া গেলে ৫।৬ দিন পরে জলের সহিত মিশাইয়া উহা জমিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

অনেকের বিশ্বাস বাঁধিয়া না দিলে বাঁধাকপি বাঁধে না কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। উহা স্বভাবতঃই আপনা হইতেই বাঁধিয়া থাকে। কচিৎ কোন সময় কপির মাথা বাঁধা হয় না। সে ক্ষেত্রে নীচের ২।৪টী পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গোড়াতে দড়ি দিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে, অথবা সরু কাটির গোঁজা কপির মাথার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। কপির জমিতে ঢিল-পাটকেল থাকা এবং আগাছা জন্মিতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। জমিতে জল সেচন করিলে গোড়ার মাটি চাপ বাঁধিয়া যায়, এজন্য গাছের গোড়ার মাটি মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া আলগা করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার জমিতে রীতিমত জল-সেচন আবশ্যক।

রীতিমত জল-সেচনের ব্যবস্থা না করিলে সব্জীর ফলন ভাল হয় না। সাধারণতঃ কূপ, নলকূপ, নদী ও পুষ্করি জল সব্জীক্ষেতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ কলসী দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া ক্ষেতে দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্ট-সাধ্য। সামান্য ২।৪ কাঠা জমিতে এইভাবে জল দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু জমির পরিমাণ অধিক হইলে সিউনী বা ছেঁচনী দ্বারা জল সেচন করিতে পারা যায়। নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে সিউনী দ্বারা জল-সেচন সুবিধা-জনক। অধিক জমি হইলে দেশী প্রথানুসারে ডোঙ্গা-কলের সাহায্যে জমিতে জল সেচন করিতে পারা যায়। পাম্পিং মেসিন দ্বারাও জমিতে জল সেচন করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ বীজ বপনের পর ৪।৫ মাসের মধ্যে বাঁধা-কপি আহারের উপযোগী হয়। জল্‌দি জাতীয় বাঁধাকপি ২৷৹ মাস হইতে ৩ মাসের মধ্যে খাইবার উপযোগী হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় প্রায় ৩৫০০ জল্‌দি ও ৩৮০০ নাবী জাতীয় কপি জন্মে। নাবী অপেক্ষা জল্‌দি জাতীয় কপির চারা ঘনভাবে বসাইতে পারা যায়। সাধারণতঃ জল্‌দি উৎপন্ন করিতে পারিলেই লাভ বেশী হয়। বিঘা প্রতি ৪।৫ তোলা বীজ লাগে।

বাঁধাকপি মুখরোচক বলিয়া অনেকের প্রিয় কিন্তু ইহা গুরুপাক, শীঘ্র হজম হয় না। অধিক আহারে অগ্নিমান্দ্য

রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা শীতপ্রধান দেশের সব্জী, এইজন্য সেখানকার লোকের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক ব্যবহারের উপযোগী নহে বা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহা আলু প্রভৃতির ন্যায় নিত্য ব্যবহার্য্য সব্জী মধ্যে পরিগণিত। তথায় সিদ্ধ কপি মাষ্টার্ড ও লবণ সংযোগে ভক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইহা দ্বারা নানাপ্রকার তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বাঁধাকপির আচারও প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ টাট্‌কা সব্জীই তরকারীরূপে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সকল সময়ে তরিতরকারী পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক অভাব ভোগ করিতে হয়। অনেক স্থানে শুষ্ক মৎস্য ব্যবহারেরও প্রচলন আছে। অনেক সব্জীও বিভিন্ন উপায়ে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করা চলিতে পারে কিন্তু সকলে শুষ্ক করিবার সঠিক কৌশল অবগত নহেন। বাঁধাকপি শুষ্ক করিয়া অন্যান্য সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাঁহারা অসময়ে বাঁধাকপি খাইতে ইচ্ছা করেন, বা যে স্থানে সকল সময় তরিতরকারী পাওয়া দুর্ঘট তাঁহারা নিম্নোক্ত উপায়ে বাঁধাকপি শুকাইয়া ব্যবহারের উপযোগী কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে

পারেন। আমাদের মনে হয় ঠিক মত শুকাইয়া ভাল-ভাবে বায়ুরুদ্ধ পাত্রে সযত্নে রক্ষা করিতে পারিলে ইহার আস্বাদন, টাট্‌কা রান্না বাঁধাকপি অপেক্ষা কোনক্রমেই নিকৃষ্ট হয় না, অধিকন্তু অসময়েও ইহা বেশ উপকারে লাগে।

ভাল তাজা পোকাশূন্য বাঁধাকপি লইয়া উহার নিচের দিক্‌কার বড় ও পাকা পাকা পাতা এবং স্থূল ডাঁটাটী ফেলিয়া দিতে হইবে, পরে মাঝের জমাট-বাঁধা অংশ ৫।৬ খণ্ডে কাটিয়া পরিষ্কার জলে ভালরূপে ধুইয়া কেবল বাষ্প দ্বারা (vapour) অল্প নামমাত্র সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে এবং পরে পরিষ্কার এক এক খণ্ড পাতলা কাপড়ের টুক্‌রা দ্বারা আলগাভাবে জড়াইয়া কোন অনাবৃত স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। উক্ত কার্য্য প্রাতঃকালে সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত। রৌদ্রের উত্তাপে এবং বাতাসে ভালরূপ শুষ্ক হইলে পরিষ্কার বায়ুরুদ্ধ পাত্রে উহা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং পরে আবশ্যক মত উহা বাহির করিয়া ব্যবহার করা চলিবে।

এদেশে পাটনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ফুলকপির বীজ জন্মান হইয়া থাকে কিন্তু বাঁধাকপির বীজ জন্মাইতে পারা যায় না। সাধারণতঃ বাঁধাকপির পুষ্পদণ্ড উহার মস্তকের

কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না। এদেশে বাঁধাকপি পুষ্পিত হইবার সময়েই বর্ষা আসিয়া পড়ায় বৃষ্টির জলে উহার পুষ্পরেণু ধুইয়া যায় এবং গর্ভ-কোষে জল ঢুকিয়া উহা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং বীজ জন্মিবার সুযোগ পায় না।

কপিগাছ নানাবিধ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা না করিলে উহারা বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। বপনের দোষে বীজ উপরে জাগিয়া থাকিলে পক্ষীরা উহা খাইয়া ফেলে। একপ্রকার লাল পিপীলিকা কপি বীজ বহিয়া লইয়া যায়। হাপোরে বা গামলায় চারা প্রস্তুত করিলেও ইহারা ক্ষুদ্র চারা গাছের গোড়া কুরিয়া খাইয়া গাছ মারিয়া ফেলে। একপ্রকার মাঠ-ফড়িংও চারা গাছের কচি কচি ডগা ও পাতা খাইয়া গাছ-গুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ক্ষেতে গাছ বসাইবার পর উইচিংড়ি গাছের গোড়া কাটিয়া দেয়। অনেক সময় চোরাপোকা দ্বারাও এইরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে দেখা যায়। কপি বাঁধিলে লেদাপোকা কপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক অভ্যন্তর ভাগ খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। কপির গাছে সময় সময় জাব পোকা লাগে এবং একই সময়ে সমস্ত গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। শীঘ্র প্রতিকারের

ব্যবস্থা না করিলে ইহারা ক্ষেত্রস্থিত সমস্ত গাছে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুরুই পোকার প্রজাপতি কপির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। ৬।৭ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া কীড়ারা বাহির হয় এবং পাতার উপরের ছাল কুরিয়া খাইতে খাইতে ভিতরে প্রবেশ করে। ১২।১৪ দিনের মধ্যেই কীড়াগুলি পুত্তলি আকার ধারণ করে এবং পরে উহা হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। একপ্রকার সুতলী পোকা ও লাল মাকড় কপিগাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা কপিগাছের পাতার নিম্নভাগে বাসা বাঁধিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত পাতা ক্রমে কোঁকড়াইয়া যাইতে থাকে।

লেড আর্সিনিয়েট অথবা ক্রুড অয়েল ইমলসান জল পিচকারী দ্বারা ছিটাইয়া পোকার উপদ্রব নিবারণ করিতে পারা যায়। লেড আর্সিনিয়েটের জল ছিটাইলে পোকা মরে সত্য কিন্তু ইহা একপ্রকার বিষ এজন্য কপির উপর উহার প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত নয়। তামাকের জল, গন্ধকের ধূম, কেরোসিন জল প্রয়োগে সময় সময় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ঔষধ দ্বারা পিপীলিকার উপদ্রব নিবারণ সহজ নহে। জমির মধ্যে স্থানে স্থানে গুড় অথবা চিনি ছড়াইয়া দিলে

উহারা একত্রিত হয়। সেই সময় অগ্নিদ্বারা উহাদের বিনাশ-সাধন করা যাইতে পারে।

/১ সের তামাক সের দুই জলে ভিজাইতে হয় এবং /।০ পোয়া সাবান টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া /১ সের জলে বেশ করিয়া ফুটাইয়া লইতে হয়। পরে উহা একত্রিত করিয়া ১০ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা ছিটাইলে পোকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। কোন প্রকার বিষ ব্যবহারের পূর্ব্বে পোকাগুলি হস্ত দ্বারা বাছিয়া মারিয়া ফেলাই সহজ পন্থা। লবণ-গোলা জল শোঁয়াপোকার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১ আউন্স লবণ ২ গ্যালন জলে গুলিলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। লেদাপোকার জন্য বিষাক্ত টোপ ন্যাপথলিন অথবা বরিক এসিড গুঁড়া ছিটাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।

হিসাব মত চাষ করিতে পারিলে বাঁধাকপির চাষে বেশ লাভবান হওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ইহার চাষে খরচ-খরচা বাদে যে পরিমাণ লাভ হইতে পারে তাহার একটী মোটামুটী হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ বিঘা জমির খাজনা	৫৲
১ বিঘা জমিতে বেড়া দিবার ব্যয়	১০৲
লাঙ্গন ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে ব্যয়	১৫৲

সার আনয়নের ও জমিতে সার প্রদানের ব্যয়	৮৲
বীজের মূল্য	৪৲
হাপোরে চারা বপন করিবার ব্যয়	২৲
চারা তুলিতে ও ভাটীতে চারা বসাইতে ব্যয়	৮৲
জমিতে স্থায়ীভাবে চারা রোপণের ব্যয়	৮৲
জল-সেচনের ব্যয়	১৬৲
জমিতে নিড়ানি দিতে ও পরিচর্য্যা করিতে ব্যয়	১২৲
পোকার উপদ্রব দমনের জন্য ঔষধ ও উহা প্রদানের ব্যয়	৬৲
একজন মালির মাহিনা	২০৲
সারের মূল্য	৪০৲
	১৫২৲

এক বিঘা জমির পরিমাণ ৮০ × ৮০ হাত। দেড় হাত অন্তর লাইন দিয়া এক হাত ব্যবধানে চারা রোপণ করিলে এক বিঘা জমিতে প্রায় ৪৩৭৪টী চারা রোপণ করিতে পারা যায়। ভাল ভাবে জমিতে সার দিয়া চাষ করিলে এক একটী বাঁধাকপি অন্ততঃ দুই আনা হইতে ৶০ আনা মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। ৪৩৭৪ কপির মধ্যে ৪০০০ কপি গড়ে দেড় আনা হিসাবে ধরিলেও ৩৭৫৲ টাকা মূল্য

হইয়া থাকে। এক বিঘা জমি চাষের ব্যয় দেখান হইয়াছে ১৫২৲ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে ইহার চাষে খরচ-খরচা বাদে (৩৭৫৲ – ১৫২৲ = ২২৩৲) টাকা লাভ দাঁড়ায়। ২৩৲ টাকা বাদ দিলেও ২০০৲ টাকা বিঘা প্রতি লাভ হইতে পারে। *

এদেশের জল-বায়ুর উপযোগী কয়েক জাতীয় উৎকৃষ্ট বাঁধাকপির নাম ও বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

আশু জাতীয়

জার্সিওয়েকফিল্ড :—জন্মস্থান আমেরিকা। এদেশীয় চাষীদের মধ্যে ইহা নারিকেলী বলিয়াই পরিচিত। জল্‌দি কপির মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। কপি মোচার ন্যায় আকৃতির, জল্‌দি জন্মে। নিরেট ও মাঝারি সাইজের কপি, ৭০।৭৫ দিনে বাঁধে। যাঁহারা জল্‌দি কপি জন্মাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা জার্সিওয়েকফিল্ডের চাষ করিতে পারেন। এদেশে ইহার চাষে বেশ সুফল পাওয়া যায়, সহজে জন্মে, ওজনে ৫।৭ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

* পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দা হওয়ায় সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই পড়িয়া গিয়াছে। সেজন্য উপরোক্ত আয়ের হিসাবের তারতম্য হইবে।

গ্লোব গ্লোরী :—খুব নিরেট কপি, আকৃতি বলের ন্যায় গোল। কপিগুলি একসঙ্গে সমানভাবে বাঁধে ও সহজে ফাটিয়া যায় না। সব দেশের জল-হাওয়া সহ্য করিতে পারে। গোলমাথা বাঁধাকপির মধ্যে ইহা সবচেয়ে জল্‌দি ও টাইট্‌। কপি চাষে লাভ করিতে হইলে 'গ্লোব গ্লোরী'র চাষ করাই বাঞ্ছনীয়। চাষীদিগের মধ্যে ইহার চাষ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ৬৫ দিনে হয়।

ফ্ল্যাট্‌ডাচ :—জন্মস্থান হল্যাণ্ড। কপির মাথা চ্যাপ্টা, নিরেট ও মাঝারি আকারের। খুব জল্‌দি না হইলেও জল্‌দি কপির মধ্যেই পরিগণিত। ইহা ৯০ দিনে বাঁধে এবং ওজনে ৬।৭ সের হয়।

একষ্ট্রা আর্লি এক্সপ্রেস :—চওড়া মাথা, খুব বড় ও অসম্ভব জল্‌দি। চওড়া-মাথা কপির মধ্যে ইহা অপেক্ষা জল্‌দি কপি আর নাই, সহজে নিষ্ফল হয় না। ইহা ২॥০ মাসে হয়।

অলহেড আর্লি :—ইহা খুব চওড়াও নহে গোলও নহে। মাথা খুব শক্ত ও বেশ ভারী। ইহা ৯০ দিন বাঁধে এবং ওজনে ৬।৭ সের হয়।

রিডল্যাণ্ড :—উৎকৃষ্ট জাতীয় বাঁধাকপি, আকারে

বৃহৎ, মাথা চ্যাপ্টা, নিরেট ও শক্ত। সকল দেশের জলবায়ু সহ্য করিতে পারে এবং ৭৫ দিনে হয়।

আর্লি কেপ :—জলদি কপির অন্তর্ভুক্ত, বর্ণ শ্বেত, আকারে ক্ষুদ্র ও সুস্বাদু। ওজনে ৩।৪ সের হয় এবং ৭০ দিনে জন্মে।

গোল্ডেন একার ৬৫ দিনে হয়, কোপেন হেগেন মার্কেট ৭০ দিনে হয়, চার্লসটন ওয়েকফিল্ড ৮০ দিনে হয়, প্রাইড অফ ইণ্ডিয়া ৭০ দিনে হয়, সুগারলোফ ৭০ দিনে হয়।

মাধ্যমিক জাতীয়

ব্রান্সউইক :—আকারে বড়, সহজে জন্মায়, নিরেট, চওড়া মাথা। ইহা মাধ্যমিক জাতির অন্তর্গত। ১০০ দিনে বাঁধে, বিশেষ আদরের জিনিষ, ওজনে ৭।৮ সের হয়।

কোহিনুর ড্রামহেড :—আকারে বৃহৎ, মাথা অল্প গোল ধরণের, নিরেট ও ভারী, ১১২ দিনে বাঁধে।

অটম কিং :—ইহার জন্মস্থান লংদ্বীপ। ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় বাঁধাকপির অন্তর্ভুক্ত। কপি নীরেট ও ভারী। ১০।১২ সের ওজনে হয় এবং ১১০ দিনে বাঁধে।

লুইসভেলী ড্রামহেড :—মাধ্যমিক জাতির অন্তর্গত। চওড়া মাথা, নিরেট, ৮।১০ সের ওজনে হয় এবং ১২২ দিনে বাঁধে।

নাবী জাতীয়

ফ্লোরিডা হেডার :—আমেরিকার ফ্লোরিডা নামক প্রদেশই ইহার জন্মস্থান। নাবী জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কপির মধ্যে ইহা অন্যতম এবং আকারে বড়, মাথা চওড়া, খুব ভারি, নিরেট ও শক্ত। এক-একটী কপি ওজনে এখানে পনর সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ১২০ দিনে বাঁধে।

মাউণ্টেন হেড :—ইহা অসম্ভব বড়, ভারি, নিরেট ও শক্ত এবং মাথা চওড়া। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক। সকল দেশে সমান ভাবে বাঁধে। কৃষক ও সৌখীন লোকের আদরের জিনিষ। ১২০ দিনে হয়।

ডেনিস বলহেড :—জন্মস্থান ডেনমার্ক। মাথা গোল ও নিরেট। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা গাছ কিছু অধিক লম্বা হয়। ১১৬ দিনে বাঁধে এবং ওজনে ৬।৭ সের হয়।

প্রাইজ মেডেল :—ইহা উন্নত শ্রেণীর ড্রামহেড জাতীয় বাঁধাকপি। সমানভাবে বাঁধে, মাথা চওড়া ও টাইট এবং ১১৬ দিনে হয়। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহার চাষে লাভ আছে।

মার্কেট গার্ডেনার্স :—ইহা বৃহৎ জাতীয় বাঁধাকপি। ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক। এইজন্য ইহা চাষীদের দ্বারা

বিশেষরূপে আদৃত ।মাথা নিরেট, শক্ত ও চওড়া, ওজনে ১০।১২ সের হয় এবং ১১৬ দিনে বাঁধে।

সিওর হেড :—ইহা ১১৬ দিনে হয়।

লার্জলেট ড্রামহেড :—আকার বড়, আস্বাদনে উৎকৃষ্ট, মাথা নিরেট ও শক্ত। ১৮ দিনে বাঁধে এবং ওজনে ৭।৮ সের হয়।

জায়েণ্ট ড্রামহেড :—আস্বাদন উৎকৃষ্ট না হইলেও ইহার আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ওজনে ২৫।৩০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মূলের ডাঁটা দীর্ঘ হয় না, মাটির সহিত লাগিয়া থাকে। ইহাকে অনেকে 'রাক্কুসে' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

অন্যান্য বাঁধাকপি

স্যাভয় :—ইহা এক নূতন জাতীয় বাঁধাকপি। কপির শিরাগুলি পাতার সহিত এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে দেখিতে অনেকটা জাফরির মত। এইজন্য অনেকে ইহাকে জাফরি বা কাফ্রিকপি নামে অভিহিত করেন। এই জাতীয় কপির প্রত্যেকটী পাতা কোঁকড়ান হয়। খুব প্রকাণ্ড না হইলেও ইহা আকারে সাধারণ বাঁধাকপির ন্যায় বড় ও শক্ত হয়। গাছ জন্মাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না, কারণ সাধারণ

বাঁধাকপি অপেক্ষা ইহা রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, সহজে মরে না। ইহার বর্ণ ঘন সবুজ ; মস্তকের সবুজবর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হইলেই আহারের উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শিশির পড়িলে এই কপি অতি সুস্বাদু, নরম ও সৌগন্ধময় হয়। অন্য জাতীয় বাঁধাকপি অপেক্ষা ইহা সাহেবদের অতি প্রিয়। রন্ধন করিলে ইহাতে অনেকটা ফুলকপির আস্বাদন অনুভূত হয়। অন্যান্য বাঁধাকপির ন্যায় ইহার চাষ এদেশে অধিক হয় না। ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্তও ইহার বীজ বপন করিতে পারা যায়। ইহার কয়েকটি বিভিন্ন জাতি আছে।

লার্জ্জ ড্রামহেড স্যাভয় :—আকার ড্রামহেড বাঁধাকপির ন্যায়, পাতা কোঁকড়ান, শিশির পড়িলে অতি কোমল ও সুস্বাদু হয়। কপি নিরেট, মাথা চ্যাপ্টা ও বড়। শীত-প্রধান দেশে ইহার উপর তুষারপাত হইলে বিশেষ কোমল ও সুস্বাদু হইয়া থাকে।

পারফেক্সান স্যাভয় :—স্যাভয় বাঁধাকপির মধ্যে ইহা বৃহৎ জাতীয়। ইহার বর্ণ সবুজ, পাতা কোঁকড়ান, কোমল ও সুস্বাদু, মাথা নিরেট ও ভারী। শীতপ্রধান দেশে ইহার যথেষ্ট আদর আছে।

লালবর্ণের বাঁধাকপি :—অন্যান্য জাতীয় সজ্জীর ন্যায়

ইহার তেমন অধিক চাষ হয় না। কপির ক্ষেতে জন্মাইলে ইহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। অন্য জাতীয় বাঁধাকপির ন্যায় খাদ্য হিসাবে ইহার অধিক প্রচলন নাই। সাধারণতঃ ইহা হইতে একপ্রকার আচার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সাহেবদের মধ্যে এই কপি-সিদ্ধ লবণ ও মাষ্টার্ড সংযোগে আহারের প্রচলন আছে। কপির আকার খুব বেশী বড় হয় না, বর্ণ লাল, সহজে জন্মায়। ইহার কয়েকটী জাতি আছে।

ম্যামথ রক হেড :—লালবর্ণের বাঁধাকপির মধ্যে ইহা বৃহৎ জাতীয়, বর্ণ গাঢ় লাল, মাথা টাইট ও নিরেট। ওজনে ৭।৮ সের হয়।

রেড ডাচ :—ইহা মাঝারি আকারের লালবর্ণের বাঁধাকপি। ইহার বর্ণ বেগুণে লাল, মাথা টাইট ও শক্ত। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বর্ণ গাঢ় হইতে থাকে।

রেড ড্রামহেড :—ইহা বড় জাতীয় লালবর্ণের বাঁধাকপি। আকারে ড্রামহেড বাঁধাকপির মত কিন্তু বর্ণ ঘোর লাল, মাথা চওড়া, টাইট ও শক্ত।

বারমেসে বাঁধাকপি :—ইহা যে কোনও সময়ে লাগান চলিতে পারে। গ্রীষ্মকালে চাষ করিলে অধিক পরিমাণে জল সেচনের এবং যত্ন ও পরিচর্য্যার আবশ্যক

হয়। সময়ের কপি যেমন বড় হয় অসময়ে সেরূপ হয় না। এদেশে ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে। ইহা শীত-প্রধান দেশের উপযুক্ত। ভারতের শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে চেষ্টা করিলে অসময়ে ইহার চাষ করিতে পারা যায়। ইহা জন্মিতে তিন মাস সময় লাগে।

বাঁধাকপি—পশু-খাদ্যের জন্য

বাঁধাকপির কয়েকটী জাতি আছে তাহাদের কোমলতা মোটেই দৃষ্ট হয় না, অধিকন্তু ছিবড়া জন্মে কিন্তু উহা আকারে বড় ও ওজনে ভারী হইয়া থাকে; সুতরাং এদেশে উহা মানুষের খাদ্যের জন্য চাষ না করিয়া গবাদি পশু-খাদ্যের জন্য চাষ করা যাইতে পারে। আমেরিকা, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গবাদি জন্তুর আহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এই জাতীয় কপির চাষ করা হইয়া থাকে। পশু-খাদ্যের জন্য যে কপির চাষ করা হয় ঐ সমস্ত দেশে তাহাকে Cattle Cabbage বলে।

বোরিকোল বা কেল

ইহা বাঁধাকপির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সাধারণ বাঁধাকপি অপেক্ষা ইহার আকৃতির বিভিন্নতা আছে। বাঁধাকপির ন্যায় ইহা বাঁধে না। ইহার পাতাগুলি আলগা, কোঁকড়ান এবং পালকের আকারে সজ্জিত। প্রত্যেকটী পাতা স্বতন্ত্র এবং থোবাযুক্ত ও জমাটবাঁধা। জাতি বিশেষে কতক-গুলির পাতা উন্নত এবং কতকগুলির নিম্নমুখী হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে ডালকপি বা ডাল বাঁধাকপি বলে। ইহা যে কেবল সব্জী হিসাবে আহারের জন্যই ব্যবহৃত হয় এমন নহে, ইহার শোভাবর্দ্ধক আকৃতি থাকায় টবে জন্মাইয়া সুশোভিত করিবার জন্যও ইহার ব্যবহার প্রচ-লিত। ইহার পাতাই সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমতল বা উচ্চ দোআঁশ জমিতে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ বপন করা চলে। ইহার চাষ বাঁধা-কপির ন্যায়, তবে বাঁধাকপির চারাগুলি যেমন ২।৩ বার স্থানান্তরিত করিতে হয় ইহার সেরূপ আবশ্যক হয় না। বীজগুলি একটু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে পারা যায়। এদেশে ইহার তাদৃশ প্রচলন নাই। ইহারও বিভিন্ন জাতি আছে। প্রত্যেক জাতি যেন এক বিচিত্র রকমের।

ব্রাসেলস্ স্প্রাউট

ইহার আদি জন্মস্থান বেলজিয়াম। ইহাও বাঁধাকপি জাতীয় সব্জী, তবে বাঁধাকপির যেমন কেবলমাত্র একটী মাথা থাকে, ব্রাসেলস্ স্প্রাউটের সেরূপ থাকে না। ইহার গাছ ১॥ হাত ২ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং ইহার কাণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থিতে বাঁধাকপির আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কপি জন্মে। কোন কোন স্থানে ইহাকে চোক কপি বলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে ইহা ভাল জন্মে। বীজ হইতে গামলায় বা বীজতলায় চারা প্রস্তুত করিয়া উহা ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে জমিতে স্থায়ীভাবে ১॥ হাত অন্তর লাইন দিয়া ১ হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ২ তোলা বীজ লাগে।

স্থান বিশেষে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করিলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে উহা নাড়িয়া বসাইবার উপযোগী হয়। অতিরিক্ত বর্ষায় বীজ বপন করিলে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বীজতলার উপরে হোগলা বা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। ইহার জমিতে ২৫।৩০ মণ গোবর সার, ৭ মণ

খইলচূর্ণ ও ১ মণ সালফেট অফ এমোনিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। ২।৩ দিন অন্তর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করা উচিত। ব্রাসেলস্ স্প্রাউটের চাষ বাঁধাকপির অনুরূপ। রীতিমত পরিচর্য্যা করিতে পারিলে এক-একটী গাছে ১৫।২০ হইতে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপি জন্মে। জাতি বিশেষে কোন গাছের অগ্রভাগে অধিক কপি অথবা গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত সমানভাবে অধিক সংখ্যক কপি জন্মে। এদেশে ইহার চাষ বিশেষ দৃষ্ট হয় না।

চেষ্টা করিলে ব্রাসেলস্ স্প্রাউটের কাণ্ডস্থ কপিগুলি আকারে বড় করিতে পারা যায়। গাছগুলি জমিতে স্থায়ীভাবে নাড়িয়া বসাইবার পর বেশ বাড়িয়া উঠিলে ব্রাসেলস্ স্প্রাউটের মস্তকস্থ কপিটী বাঁধিবার পূর্ব্বেই উহা কাটিয়া দিতে হয় এবং গাছের গোড়া নিড়াইয়া দিয়া খইল সার জলের সহিত মিশাইয়া তরল আকারে প্রয়োগ করিতে হয়। এরূপ করিলে কাণ্ডস্থ কপিগুলি বৃদ্ধি পাইতে পারে, কারণ গাছ মাটি হইতে যে রস গ্রহণ করে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক মস্তকের শাখা কপিটী গ্রহণ করে। অনেকের মতে উহা নষ্ট না করাই ভাল, কারণ উহা শীত, জল ও রৌদ্র হইতে কাণ্ডস্থ কপিগুলিকে রক্ষা করে। ইহার জমিতে রীতিমত জল-সেচনের বিশেষ আবশ্যক।

ইহার কয়েকটী জলদি ও নাবী জাতি আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গাছ ১৷৷ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে, আবার কতকগুলি গাছ খর্ব্বাকৃতি হয় এবং কাণ্ডগাত্রস্থ কপি কতকগুলি একটু পৃথক্‌ভাবে থাকে এবং কতকগুলি ঘনভাবে জন্মে। সারাল জমি ব্যতীত ব্রাসেলস্ স্প্রাউটের চাষ করা উচিত নয়।

সালউঙ বা চিনাকপি

ইহার আদি জন্মস্থান চীনদেশে। ইহাকে ঠিক বাঁধা-কপি বলা যায় না, কেননা ইহা ঠিক বাঁধাকপির ন্যায় বাঁধে না। ইহার আকৃতি অনেকটা সিলেরী বা কস জাতীয় ছালাদের (লেটুস) ন্যায়, সুতরাং ইহাকে চিনা-কপি বলা যাইতে পারে। চীনদেশে ইহা 'প্রাক চই, ওয়াংবক ও পেটসাই' নামে পরিচিত। চীনদেশে সজ্জী হিসাবে ইহার বেশ সুখ্যাতি আছে। ইহার বর্ণ গাঢ় সবুজ। ওজনে ইহা এক-একটী ৩।৪ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রন্ধনকালে ইহা হইতে সুগন্ধি বাহির হয়।

ইহার চাষে একটী সুবিধা এই যে বৃষ্টিতে ইহা সহজে নষ্ট হয় না এবং গাছগুলি অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। বীজ হইতেই গাছ জন্মান হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলে এক হাত অন্তর লাইন দিয়া এক হাত ব্যবধানে রোপণ করিতে পারা যায়। সিলেরী বা কস জাতীয় ছালাদের ন্যায় ইহার পাতাগুলি আলগাভাবে একত্র বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাতে পত্রগুলি কোমল থাকে ও বিবর্ণ হইতে পারে না। ইহার চাষ বাঁধাকপির ন্যায়। চেষ্টা করিলে বারমাসই ইহা সহজে জন্মাইতে পারা যায়।

ফুলকপি

ফুলকপি এদেশীয় সব্জী নহে, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান। এদেশীয় সব্জী না হইলেও অনেক দিন হইতেই এদেশে ফুলকপির চাষ হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য সাধারণ লোকও ইহার চাষ করিতে শিখিয়াছে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যে ফুলকপির বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই দেশী

নামে খ্যাত। পূর্ব্বে এদেশে ফুলকপির বীজ জন্মাইত না, ক্রমে কৃষকগণের বহু যত্নে ও পরিশ্রমে বর্ত্তমানে উহা এদেশে উৎপন্ন হইতেছে।

সময়ের কিছু অগ্রপশ্চাৎ জন্মে বলিয়া ফুলকপিকেও জলদি, মাধ্যমিক ও নাবী এই তিন জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। জলদি ফুলকপির বীজ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বপন করিতে হয়, ইহা খুব শীঘ্র জন্মিয়া থাকে। মাধ্যমিক এবং নাবী জাতীয় ফুলকপি অপেক্ষা ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। কেবলমাত্র সময়ের পূর্ব্বে পাওয়া যায় বলিয়া জলদি ফুলকপির বেশী আদর। মাধ্যমিক জাতি শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এবং নাবী জাতীয় বীজ ভাদ্র আশ্বিনে বপন করিতে হয়। দেশের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া মৃত্তিকা ভেদে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্তও নাবী জাতীয় বীজ বপন করা যাইতে পারে। শীতকালে যে ফুলকপি দেখা যায় তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত জলদি ফুলকপি অপেক্ষা আকারে ও স্বাদে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। যে সমস্ত দেশে শীত অধিক দিন স্থায়ী হয় তথায় নাবী জাতীয় এবং যে দেশে শীত অল্প দিন স্থায়ী হয় তথায় জলদি জাতীয় ফুলকপির চাষ লাভজনক।

চাষী ও গৃহস্থ ইচ্ছামত জলদি, মাধ্যমিক ও নাবী

জাতির চাষ করিতে পারেন। একটু হিসাব করিয়া চাষ করিলে একই ক্ষেতে জলদি, মাধ্যমিক ও নাবী জাতীয় ফুলকপির চাষ করা যাইতে পারে। ইহাতে জলদি কপি ফুরাইতে ফুরাইতে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক কপি ফুরাই-বার পর নাবী কপির ফসল পাওয়া যায়। স্নোবল, রয়েল, প্রাইজকুইন, ইম্পিরিয়াল, আলজিয়ার্স, ওয়ালচিরাণ, আর্লিপ্যারিস, লির্ণম্যাণ্ড, অটমজায়েণ্ট, গ্লোববেটার, পাটনাই, বেণারসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় কপি চাষী ও গৃহস্থ নিজ নিজ আবশ্যক বা ইচ্ছানুযায়ী চাষ করিতে পারেন।

সাধারণতঃ দোআঁশ মৃত্তিকাই ইহার চাষের উপযোগী। বাঁধাকপির জমি যে ভাবে চষিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ফুলকপির জন্যও ঠিক সেইভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই জমিতে লাঙ্গল ও মই দিয়া গভীর-ভাবে উত্তমরূপে কষণ করিতে হইবে এবং উহাতে খইল, গোবর সার দিয়া মাটি ওলটপালট করিয়া দিতে হইবে। মাটি যাহাতে গুঁড়াইয়া ঝুরা হইয়া যায় এবং জমিতে প্রদত্ত সার মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া যায় এজন্য একাধিকবার জমিতে লাঙ্গল ও মই দেওয়া প্রয়োজন। ফুলকপির জমিতে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর সার,

২ মণ সালফেট অফ এমোনিয়া ও ২ মণ রেড়ির খইল জমি প্রস্তুত করিবার সময় এবং ফুল ধরিবার পূর্ব্বে ১০।১২ মণ গোবর সার ও ২ মণ সুপার ফস্ফেট জলের সহিত মিশাইয়া তরল আকারে প্রয়োগ করা আবশ্যক। রাসায়নিক সার প্রয়োগকালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ ইহা গাছের গায়ে লাগিলে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

অত্যধিক বর্ষা নিবন্ধন এ সময় টব, গামলা বা অন্য কোন প্রশস্ত পাত্রে বীজ বপন করা যাইতে পারে।

বীজপাত্রে চারা না জন্মাইয়া বীজতলা বা হাপোরেও উহা জন্মাইতে পারা যায়। তবে উপরে হোগলা, ত্রিপল বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়, যাহাতে কোনক্রমে চারাগুলিতে বৃষ্টির জল না পায়। হাপোরের মাটিও দোআঁশ, হাল্‌কা এবং সারযুক্ত হওয়া ও ধূলার ন্যায় চূর্ণিত হওয়া আবশ্যক। হাপোরের জন্য উচ্চ জমি নির্ব্বাচন করা এবং উহা দৈর্ঘ্য ৫ হাত এবং প্রস্থে ২ হাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আবশ্যকমত উহা প্রস্থে না বাড়াইয়া দৈর্ঘ্যে বেশী কম করা যাইতে পারে।

চারা বাহির হইলে বীজপাত্র দিবাভাগে ছায়াযুক্ত স্থানে ও রাত্রে শিশিরে দিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষুদ্র

কোমল চারাগুলি রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। উহাদিগকে খুব সাবধানের সহিত ক্রমে ক্রমে শীত-তাপ সহ্য করাইয়া লইতে হইবে। চারাগুলি ২।৩ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে বীজপাত্রের মৃত্তিকা অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে চারাগুলি শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। জল দিবার আবশ্যক হইলে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ঝারি দ্বারা অল্প অল্প জল সেচন করা আবশ্যক। হাপোরস্থিত ক্ষুদ্র কপি চারারও ঠিক একই ভাবে যত্ন লইতে হয়। বাঁধা-কপির ন্যায় ইহার পরিচর্য্যা আবশ্যক।

চারাগুলি ৩।৪টী পত্রবিশিষ্ট হইলে গামলা অথবা বীজতলা হইতে তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট ভাটীতে কিছুদিনের জন্য ২।৩ ইঞ্চি অন্তর অন্তর রোপণ করিতে হইবে। ভাটীতে রোপণ করায় চারাগুলি শীঘ্র বর্দ্ধিত ও তেজাল হইয়া উঠে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভাটীর মাটি বীজতলার মাটির ন্যায় চূর্ণ হওয়া এবং উহা অপেক্ষা অধিক কোমল ও সারবান হওয়া আবশ্যক। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে রাত্রে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেওয়া উচিত।

চারাগুলি যে জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করা হইবে

তাহার পাট পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা উচিত। প্রস্তুত জমিতে এক হাত অন্তর লাইন দিয়া এক হাত ব্যবধানে এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে এক মুঠা হিসাবে রেড়ির খইল প্রদান করিতে হইবে। মাটিতে লাঙ্গন দিবার অথবা মাটি কোপাইবার সময় রেড়ির খইল ব্যবহার না করিয়া উহা এই সময় ব্যবহার করা উচিত। গর্ত্তগুলি আধ হাত আন্দাজ গভীর এবং ৫।৬ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এক বিঘা জমির পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮০ × ৮০ হাত, সুতরাং এক হাত অন্তর লাইন দিয়া এক হাত ব্যবধানে এক-একটী করিয়া গর্ত্ত করিলে ৬৫৬১টী গর্ত্ত করা যাইতে পারে।

চারাগুলি ৭।৮টী পত্রবিশিষ্ট হইলে ভাটী হইতে তুলিয়া জমিতে স্থায়ীভাবে প্রতি গর্ত্তে এক-একটী করিয়া বসাইতে হইবে। প্রত্যেকবার চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হইলে শিকড়গুলি গোবর ও সারমাটী-গোলা জলে ডুবাইয়া লইতে হয়। ইহাতে চারার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। চারা রোপণ-কার্য্য অপরাহ্নকালে করা উচিত। কারণ এ-সময় রৌদ্রের তেজ থাকে না এবং সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা ও শিশির পাইয়া উহারা সুস্থ থাকে। চারাগুলি তুলিয়া আনিয়া জমিতে বসাইবার পূর্ব্বে ভাটীর মাটি জল দিয়া

ভিজাইয়া সম্পূর্ণ সিক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। হাপোর হইতে তুলিয়া আনিয়া ভাটীতে লাগাইবার সময়ও এইরূপ করা আবশ্যক। ক্ষেতে রোপিত হইবার পরই উহারা রৌদ্রের উত্তাপ অথবা বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য দিবাভাগে রৌদ্রের সময় কচুপাতা অথবা কলার পেটো দ্বারা চারাগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। শিকড় বসিয়া গেলে ঢাকা দিবার আবশ্যক থাকে না। চারা উত্তোলন প্রণালী এবং অন্যান্য পরিচর্য্যা বাঁধাকপির ন্যায় একই প্রকার।

চারাগুলি একটু বড় হইলে এবং উহার শিকড় বেশ মাটিতে বসিয়া বেলে শ্রেণীবদ্ধ চারাগুলির দুই লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে মাটি উঠাইয়া গাছের গোড়ায় আইল দিবার মত উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে জমির মধ্যে মধ্যে যে নালা বা খাদ থাকিয়া যায় সেই নালায় জল-সেচনের সুবিধা হয় এবং অধিক বৃষ্টিতেও জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। একটী বড় নালা কাটিয়া জমির মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া উহা শ্রেণীবদ্ধ গাছের মধ্যস্থিত সমস্ত ক্ষুদ্র নালার সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ ব্যবস্থায় ঐ বড় নালাটীতে জল সেচন করিলে ক্ষেত্রস্থ সমস্ত নালায় জল

যাইবে। জমিতে আবশ্যক মত ৪।৫ দিন অন্তর জল-সেচন প্রয়োজন। গাছের গোড়ার মাটি চাপ বাঁধিয়া গেলে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দ্বারা উহা আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মিলে তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত। জল-সেচন প্রণালী ও অন্যান্য পরিচর্য্যা বাঁধাকপির ন্যায় একই প্রকার।

জমিতে ফস্‌ফরিক এ্যাসিড সার এবং নাইট্রোজেন সার অথবা অবস্থা বুঝিয়া পটাস্‌ সার দিলে ফসল খুব ভাল হয়। ইহার জমিতে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। সার অভাবে যেমন গাছ বৃদ্ধি পায় না ও ফসল ভাল জন্মে না, অধিক সার দিলেও আবার গাছের পত্রসংখ্যা ও আয়তনই কেবল বৃদ্ধি পাইবে, অধিকন্তু গাছে ফুল ধরিবে না এবং যদিও ধরে তাহা আকারে ক্ষুদ্র হইবে। অধিক সার দিলে গাছ ষাঁড়াইয়া যায়। গাছে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ গোবর ও ২ মণ সুপার ফস্ফেট জলের সহিত গুলিয়া জমিতে ব্যবহার করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। একসঙ্গে না দিয়া ২।৩ বারে উহা তরল আকারে ব্যবহার করা উচিত। ফুল দেখা দিলে গাছের নিম্নভাগস্থ ২।১টী পাতা ভাঙ্গিয়া লইয়া ফুলের উপরে ঢাকা দিতে পারিলে খুব ভাল হয়।

এরূপ করিলে ফুলের কোমলতা নষ্ট হয় না এবং রৌদ্রের উত্তাপে ফুল বিবর্ণ হইতে পারে না। ফুলকপির ফুলের উপর রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে উহার আস্বাদন বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ৩।৪ মাসের মধ্যেই ফুলকপি আহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে। জলদি ফুলকপি আরও শীঘ্র জন্মে। জলদি অপেক্ষা নাবী ফুলকপির আস্বাদন উৎকৃষ্ট এবং আকারে বৃহৎ হইলেও জলদি ফুলকপির আদর অধিক এবং জলদির চাষে লাভ অধিক হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৪।৫ তোলা বীজ লাগে।

বাঁধাকপি অপেক্ষা ফুলকপির আস্বাদন উৎকৃষ্ট এবং উহা অধিক আদৃত। ইহা মুখরোচক, গুরুপাক এবং অগ্নিমান্দ্যকারী। এইজন্য উহা অধিক ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

পাটনা, লক্ষ্ণৌ, সাহারাণপুর, বেনারস, হাজিপুর, ফয়জাবাদ প্রভৃতি স্থানে ফুলকপির বীজ জন্মান হইয়া থাকে। বাংলা দেশেও বিদেশী বীজোৎপন্ন ফুলকপির গাছ হইতে বীজ জন্মান যাইতে পারে। পাটনাই, সাহারাণপুর, কাশী প্রভৃতি স্থানের বীজের গুণের তারতম্য বিশেষ লক্ষিত হয় না, উহা এদেশের জল-বায়ু সহনীয় করিয়া লওয়া

হইয়াছে। ফুলকপির বীজ প্রস্তুত করিতে হইলে ফুল সমেত উৎকৃষ্ট জাতীয় সতেজ ও নীরোগ গাছ ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া মূল শিকড়ের অগ্রভাগ চিরিয়া তাহা পুনরায় হাপোরে বসাইয়া দিতে হয় এবং এক টুক্‌রা পরিষ্কার পাতলা কাপড় দ্বারা ফুলটী আলগাভাবে বাঁধিয়া দিতে হয়। মূল শিকড়ের অগ্রভাগ চিরিয়া দিলে গাছের তেজ ও বৃদ্ধি কমিয়া ফুলটিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে ও উহাতে বীজ জন্মে। কোন কোন গাছে বীজ শীঘ্র জন্মে আবার কোন কোন গাছে উহা জন্মিতে বিলম্ব হয়। যে বীজ শীঘ্র জন্মে তাহা জলদি এবং যাহা বিলম্বে জন্মে তাহা নাবী জাতীয় বীজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ফুলকপি গাছে মাঝে মাঝে পোকার বিশেষ উপদ্রব দেখা যায়। জমির নিকটবর্ত্তী স্থানে জঙ্গল থাকিলে অথবা জলবসা জমি হইলে পোকার উপদ্রব অধিক হইয়া থাকে। একপ্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গ ও লাল পিঁপড়া গাছ কুরিয়া পাতা খাইয়া ফেলে এবং গোড়া কাটিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় গাছে অল্প অল্প তুঁতের জল ছিটাইয়া দিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। জমির মধ্যে মধ্যে গুড় অথবা চিনি ছড়াইয়া দিলে ক্ষেত্রস্থিত সমুদয় পিঁপড়া তথায় একত্রিত হইয়া থাকে। তখন উহাদের মারিয়া

ফেলা সহজসাধ্য হয়। মাঠফড়িং, চোরাপোকা প্রভৃতি কপিগাছের পাতা খাইয়া অনিষ্ট করে এবং লেদাপোকা ও সুরুই পোকা কপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে। ফুলকপি বড় হইলে একপ্রকার সুতলী পোকা ফুলের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ঢুকিয়া ফুল নষ্ট করে। এই পোকাগুলি বড় হইলে প্রজাপতির আকার ধারণ করে। এই সুতলী পোকার প্রজাপতি দিনের বেলায় কপিক্ষেতে উড়িয়া বেড়ায় এবং কপির পাতা ও ফুলের উপর বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। ৬।৭ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট কীড়া বাহির হয়। ইহারা কপির ফুলের মধ্যে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করিয়া ফুল খাইতে থাকে এবং অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট করিয়া ফেলে। একপ্রকার শুঁয়াপোকার প্রজাপতি কপিপাতার দুই ধারে এক স্থানে অনেকগুলি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়ারা প্রথমে পাতার ছাল খায়, পরে পাতা খাইয়া ডাঁটা অসার করিয়া ফেলে। কীড়াগুলি বড় হইলে প্রজাপতি আকারে বহির্গত হয় এবং কিছুদিন পরে পুনরায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত পোকা যাহাতে ক্ষেতে বিস্তৃত হইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই পোকা যে পাতায় ডিম পাড়ে

ডিম সমেত সেই পাতাগুলি ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। তামাক ও সাবানের জল এবং সাবান ও কেরোসিনের জল পিচকারী দ্বারা গাছে ছিটাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য প্রতীকার-পন্থার জন্য বাঁধাকপি দ্রষ্টব্য।

ফুলকপির চাষে বেশ লাভ আছে। এক বিঘা জমিতে খরচ-খরচা বাদে যে পরিমাণ লাভ হইতে পারে তাহার একটী মোটামুটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১ বিঘা জমির খাজনা	৩৲
জমিতে বেড়া দিবার ব্যয়	১০৲
লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে ব্যয়	১৪৲
সার আনয়নের ও জমিতে সার প্রদানের ব্যয়	৮৲
বীজের মূল্য	৬৲
হাপোরে চারা রোপণ করিতে ব্যয়	৩৲
চারা উঠাইতে ও ভাটীতে রোপণ করিতে ব্যয়	৮৲
জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণের জন্য ব্যয়	৮৲
জল-সেচনের ব্যয়	১৩৲
জমিতে নিড়ানি দিতে ও পরিচর্য্যা করিতে ব্যয়	১২৲
পোকার উপদ্রব দমনের জন্য ঔষধ খরচ ও উহা প্রদানের ব্যয়	৬৲

একজন মালির মাহিনা	২০৲
সারের মূল্য	৩৫৲
	১৪৬৲

এক বিঘা জমির পরিমাণ ৮০ × ৮০ হাত। এক হাত অন্তর লাইন দিয়া এক হাত ব্যবধানে চারা রোপণ করিলে এক বিঘা জমিতে ৮১ × ৮১ = ৬৫৬১টী গাছ বসান চলে।

সব গাছ নাও বাঁচিতে পারে, স্নুতরাং ১ বিঘা জমিতে ৬১টী গাছ নষ্ট হইলেও ৬৫০০ গাছের ফলন পাওয়া যায়। ভালরূপে সার দিয়া যত্ন ও পরিচর্য্যা করিতে পারিলে এক-একটী কপি ।০ আনা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। গড়ে /০ আনা হিসাবে ধরিলেও ৬৫০০ আনা অর্থাৎ ৪০৬।০ আনা মূল্য পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ব্যয় দেখান হইয়াছে ১৪৬৲ টাকা এবং আয় হইতেছে ৪০৬।০ ; অতএব ইহার চাষে ৪০৬৲ – ১৪৬৲ = ২৬০৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। ৬০৲ টাকা বাদ দিলেও ২০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। নিম্নে এদেশের জল-বায়ুর উপযোগী কয়েক জাতীয় উৎকৃষ্ট ফুলকপির নাম ও বিবরণ দেওয়া হইল।

আশু জাতীয়

আর্লি স্নোবল :—ফুলকপির মধ্যে ইহা শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইজন্য ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই আদৃত ও সুপরিচিত। ইহার বর্ণ শুভ্র, আকৃতি ক্ষীণ, ফুল টাইট নিরেট। ৪।৫ সের ওজনে হয়। ইহার আস্বাদনও সুন্দর। এজন্য চাষী ও সৌখীন লোকের আদরের বস্তু। ইহা ৯৬ দিনে আহারের উপযুক্ত হয়।

আর্লি অটম জয়েন্ট :—ইহার বর্ণ ধব্‌ধবে সাদা, মাথা নিরেট, আকৃতি খর্ব্ব, আস্বাদন উৎকৃষ্ট। ইহা ওজনে ২।৩ সের হয় এবং ৯৫ দিনে জন্মে।

আর্লি প্যারিস :—ফরাসি দেশের অন্তর্গত প্যারিস ইহার জন্মস্থান। কপির বর্ণ শ্বেত, খুব টাইট। ইহা ২৷৷-৩ সের ওজনে হয় এবং ৯০ দিনে জন্মে।

ইক্লিপ্স :—ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় ফুলকপি। আকার বড়, জলদি, বর্ণ শ্বেত, মাথা টাইট। ইহা ৪।৫ সের ওজনে হয় এবং ৯৫ দিনে জন্মে।

এসিয়াটীক :—ইহা শীঘ্র জন্মে, ফুলের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেত, খুব টাইট। ইহা ওজনে ২।৩ সের হয় এবং ৯০ দিনে জন্মে।

এরফার্ট ঃ—ইহার জন্মস্থান জার্ম্মানী। দেখিতে সুন্দর ও সহজে জন্মায়, জলদি জাতির অন্তর্গত, কপি শুভ্র-বর্ণযুক্ত, নিরেট ও বৃহদাকার। ইহা ওজনে ৬।৭ সের পর্য্যন্ত হয় এবং ৯৫ হইতে ১০০ দিনে বাঁধে।

বারমেসে ঃ—এদেশে শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায়, অন্যস্থানে সুফল পাওয়া যায় না। ইহা শীতপ্রধান দেশেরই সমধিক উপযোগী। সেখানে ইহা অনায়াসে জন্মিয়া থাকে।

পাটনাই জলদি ঃ—ইহা দেশী ফুলকপি। আমাদের দেশে সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। কপির আকার বড় হয় না এবং বর্ণও শুভ্র হয় না, কতকটা হরিদ্রাভ। ৭৫ দিনে ফলন পাওয়া যায়।

ইম্পিরিয়াল ঃ—ইহা জলদি জাতির অন্তর্ভুক্ত। আকৃতি ও স্বাদে অনেকটা এরফার্টের সমতুল্য। পাতার বর্ণ ঘন সবুজ। ফুল খুব ঘন, টাইট ও সুস্বাদু, আকারে বড় এবং শুভ্র। ইহার চাষে বিশেষ লাভ আছে। ইহা ৯৫ দিনে জন্মে।

বেনারসী জলদি (কাশীর) ঃ—ইহাও পাটনাই জলদি ফুলকপির ন্যায় খুব শীঘ্র জন্মিয়া থাকে। আকারে বেশ বড় হয়। চেষ্টা করিলে ও জমিতে কিছুদিন রাখিয়া দিলে

/২ সের /২॥ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাতা খুব বেশী হয় এবং ৯০ দিনে ফলন পাওয়া যায়।

বেনারসী ও পাটনাই ফুলকপির কয়েকটী বিভিন্ন জাতি আছে। কতকগুলি কার্ত্তিক মাসে, কতকগুলি অগ্রহায়ণ মাসে এবং কতকগুলি পৌষ ও মাঘ মাসে খাইবার উপযুক্ত হয়। বীজ-বপন-কার্য্য কিছু অগ্রপশ্চাৎ করিয়া সমাধা করিতে হয়। চাষীরা চলিত কথায় যে জাতি কার্ত্তিক মাসে উঠে তাহাকে কাৎকা, যাহা অগ্রহায়ণ মাসে উঠে তাহাকে অঘানি, যাহা পৌষে উঠে তাহাকে পৌষালি এবং মাঘে যাহা উঠে তাহাকে মাঘি নামে অভিহিত করে।

মাধ্যমিক জাতীয়

গ্রাষ বেটার:—কপির বর্ণ শুভ্র, মাথা টাইট ও নিরেট, আকার বৃহৎ এবং খাইতে সুস্বাদু। এইজন্য ইহা বিশেষ প্রশংসিত। ইহা ওজনে ৪।৫ সের হয় এবং ১০০ দিনে জন্মে।

আলজিয়ার্স:—কপির ফুল শুভ্র ও সুস্বাদু, আকার বড়, নিরেট ও টাইট বাঁধে। গাছ সহজে মরে না, ফলন

অনিবার্য্য। এইজন্য সব্জী ব্যবসায়ীর নিকট ইহা বিশেষ পরিচিত। ইহা ওজনে ২॥ সের ৩ সের হয় এবং ১১০ দিনে জন্মে।

প্রাইজ কুইন :—ফুল খুব শুভ্র ও বাঁধা, আকার বড়, আস্বাদন উৎকৃষ্ট। বিশেষ লাভের জিনিষ। ইহা ওজনে ৩।৪ সের হয় এবং ১০০ দিনে জন্মে।

ওয়ালচিরাণ :—ফুল বড় এবং শক্ত, বর্ণ শুভ্র, সহজে এবং সকল স্থানে সুন্দর ভাবে জন্মে। অতি আদরের জিনিষ। ইহা ২॥ সের ৩ সের ওজনে হয় এবং ১১০ দিনে জন্মে।

রয়েল :—ইহা মাধ্যমিক জাতীয় উৎকৃষ্ট ফুলকপি। ফুল মধ্যমাকৃতি, মাথা খুব টাইট ও ঠাস, দেখিতে সুন্দর, আস্বাদন উৎকৃষ্ট। চাষীদের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে আদৃত। ইহা ১০০ দিনে জন্মে।

রিলাইবেল :—সকল দেশেই জন্মে, ফুল টাইট ও শক্ত। ইহা ওজনে ৩।৪ সের হয় এবং ১১৫ দিনে জন্মে।

নাবী জাতীয়

লেট্ স্নোবল :—ফুলকপির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, গুণ আর্লি স্নোবলের ন্যায়। ইহা ১২০ দিনে হয়।

লেট অটম জায়েণ্ট :—গুণে ও তুলনায় অটম জায়েণ্টের মত কিন্তু ইহা বিলম্বে জন্মে এবং আকার অটম জায়েণ্ট অপেক্ষা একটু বড়। ইহা ওজনে ৫।৬ সের হয় এবং ২২৭ দিনে জন্মে।

লির্ণমেণ্ড :—ইহা ওজনে ৪।৫ সের হয়, ফুল নিরেট ও সুস্বাদু, আকারে ও তুলনায় অন্যান্য উৎকৃষ্ট জাতীয় কপি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে এবং ১২০ দিনে হয়।

পাটনাই ও বেনারসী ফুলকপি, জলদি ও নাবী উভয় প্রকারের আছে।

রাক্কুসে :—ইহা অতি বিলম্বে জন্মে এবং আকারে অতি প্রকাণ্ড হইয়া থাকে কিন্তু আস্বাদনে খুব ভাল নয়। এক-একটী কপি ওজনে ১৪।১৫ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহা ১৪০ দিনে জন্মে কিন্তু সকল স্থানে জন্মে না।

ব্রোকোলী

ব্রোকোলী ও ফুলকপির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ব্রোকোলী ফুলকপিরই রূপান্তরমাত্র। ফুলকপি অপেক্ষা ব্রোকোলীর পত্রসংখ্যা অধিক হয় এবং

পাতা চওড়া হয় কিন্তু ফুলকপির ন্যায় পাতা মসৃণ হয় না। ইহার পত্রবৃন্ত এবং পত্রস্থ শিরা সকল ফুলকপি অপেক্ষা মোটা ও শুভ্র।

ফুলকপির ন্যায় ইহা একই ভাবে ও একই সময়ে চাষ করিতে হয়। ইহা স্বভাবতঃই একটু বিলম্বে জন্মিয়া থাকে। ব্রোকোলী এদেশের জলবায়ুর তেমন উপযোগী নয়, শীতপ্রধান দেশে ইহা ভাল জন্মে। ফুলকপি অপেক্ষা ইহা কোমল ও আস্বাদনে সুমিষ্ট। ভারতবর্ষে শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং যে স্থানে শীত অধিক দিন স্থায়ী হয় তথায় ইহার চাষ করা যাইতে পারে। ইহার চাষ বিশেষ শ্রমসাধ্য এবং ফুলকপি অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিচর্য্যার আবশ্যক। জলদি ও নাবী ভেদে ইহার কয়েকটি বিভিন্ন জাতি আছে।

ছালাদ বা লেটুস

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতবর্ষই ছালাদের আদি জন্মস্থান। হিমালয়ের পাদদেশে ইহাকে বন্য অবস্থায় আপনা হইতে জন্মিতে দেখা যাইত। ইহার চাষও কেহ জানিত না এবং ব্যবহারও বড় একটা কেহ করিত না।

আমরা আজকাল যে লেটুস বা ছালাদ সজ্জী হিসাবে ব্যবহার করি তাহা এই বন্য ছালাদ হইতে উৎপন্ন উন্নত জাতি। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই ছালাদ সজ্জীরূপে প্রথম ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের সজ্জী হইলেও এদেশে ইহার বেশী আদর নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশেই উৎকৃষ্ট সজ্জী হিসাবে ইহার আদর অধিক। বিদেশের দেখাদেখি আজকাল ইহার চাষ এদেশে বেশ প্রসার লাভ করিতেছে এবং লোকে ইহার আদর করিতে শিখিতেছে। কোন কোন স্থলে ইহা লেটুস এবং কোন কোন স্থানে ছালাদ বা কাহু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ছালাদ বা লেটুস প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা—বাঁধা ছালাদ, কাটিং ছালাদ ও কস ছালাদ। একপ্রকার নারিকেলী বাঁধাকপির ন্যায় উপরের দিক লম্বা এবং অন্য জাতি স্বভাবতঃ চ্যাপ্টা হইয়া থাকে। লম্বা জাতিকে কস এবং চ্যাপ্টা জাতিকে ক্যাবেজ লেটুস বলে। ক্যাবেজ লেটুসের আকৃতি ঠিক বাঁধাকপির ন্যায় কিন্তু বাঁধাকপির পাতা যেমন ঠাস বাঁধে ও নিরেট হয় ইহার ঠিক ততটা হয় না। কাটিং ছালাদের পাতা শাকের ন্যায় কাটিয়া ব্যবহার করা হয়।

হালকা দোআঁশ জমিতে লেটুস ভালরূপ জন্মায়।

ছালাদের জমি ভালরূপে কর্ষণ করা আবশ্যক। বাঁধাকপির ন্যায় ইহার জমি উত্তমরূপে চষিয়া সার মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার জমিতে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর সার, ১॥ মণ সালফেট অফ এমোনিয়া ও অর্দ্ধ মণ সালফেট অফ পটাস জমি প্রস্তুত করিবার সময় ও ২ মণ রেড়ি অথবা সরিষার খইলচূর্ণ লেটুসের মাথা বাঁধিবার কিছু পূর্ব্বে জলের সহিত মিশাইয়া তরল আকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে লেটুস শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

প্রথমতঃ বাঁধাকপির ন্যায় একটী বড় গামলা বা কাঠের বাক্সে চারা প্রস্তুত করিয়া চারাগুলি ৫।৬টী পত্র-বিশিষ্ট হইলে প্রস্তুত জমিতে স্থায়ীভাবে নাড়িয়া বসান আবশ্যক। জমিতে ১॥০ হাত অন্তর লাইন দিয়া ১ হাত, তিন পোয়া আন্দাজ ব্যবধানে চারা রোপণ করিতে হইবে। ক্যাবেজ লেটুসের আকৃতি বাঁধাকপির অনুরূপই হয় এবং এজন্য বাঁধাকপির ন্যায় অন্তর অন্তর ইহার চারা রোপণের আবশ্যক। এক ছটাক বীজের উৎপন্ন চারাতে প্রায় এক বিঘা জমি চাষ করা যায়। লেটুস বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১৫।১৬ দিন সময় লাগে।

জমিতে চারা বপন করিবার পর উহার শিকড় মাটিতে

ভালরূপে না বসা পর্য্যন্ত রৌদ্রের সময় কলাপাতা, পেঁপে-পাতা অথবা কলার পেটো দ্বারা চারাগুলি আবৃত করিয়া রাখিতে হয় এবং রৌদ্র অবসানের সঙ্গে আবরণ উন্মোচন করিয়া দিতে হয়। চারাগুলি জমিতে বসিয়া গেলে নূতন পাতা গজাইতে থাকে। পাতাগুলি বড় হইলে কলার সিটা দ্বারা একত্রে আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। কেবল কস জাতীয় লেটুসে উক্ত নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক। লেটুস গাছের গোড়ার মাটি নিড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া এবং জমিতে ৩।৪ দিন অন্তর আবশ্যক মত জল-সেচন প্রয়োজন। ইহার পাতাগুলি অত্যন্ত কোমল। অতিরিক্ত রৌদ্রের উত্তাপে যাহাতে পাতাগুলি বিবর্ণ হইতে বা শুকাইয়া যাইতে না পারে এজন্য জমির উপরে হোগলা বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা পাতলা আচ্ছাদন করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। বর্ষা ছাড়া অন্য সমস্ত ঋতুতেই ছালাদ বা লেটুস চাষ করা যাইতে পারে। গাছগুলি জমিতে অধিক দিন রাখিয়া দিলে উহার মধ্য হইতে মূলা বা সরিষার শীষের ন্যায় লম্বা শীষ বাহির হয়। উহাতে ফুল ধরে এবং সেই ফুল হইতেই বীজ জন্মিয়া থাকে। সতেজ গাছ হইতে লেটুসের বীজ উৎপন্ন করা আবশ্যক; ইহার বীজও এদেশে জন্মাইতে পারা যায়।

লেটুস গাছে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে উহা কাটিয়া আহারের জন্য সব্জী হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। নতুবা ইহার কোমলতা ও সুগন্ধ নষ্ট হয়। সাধারণতঃ ৪০।৪৫ দিনে লেটুস ব্যবহারের উপযোগী হয়। ইহা বাঙ্গালী অপেক্ষা সাহেবদের অতি প্রিয় খাদ্য। এদেশে উহা শাকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

আর একপ্রকার ছালাদ আছে তাহার লম্বা ডাঁটা হয় এবং ডাঁটাগুলিও দেখিতে অনেকটা এসপ্যারাগাসের ন্যায় এবং পাতাগুলি লম্বাকৃতি ছালাদের ন্যায়। এই জাতীয় ছালাদ গাছ ১ ফুট ১॥ ফুট লম্বা হয়। ইহার চাষ ও পরিচর্য্যা সাধারণ ছালাদের ন্যায়। এই জাতীয় ছালাদকে এসপ্যারাগাস ছালাদ বলা হয়। আমাদের দেশে এই জাতীয় ছালাদের বিশেষ প্রচলন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

শশাকী বর্গীয় সব্জী

লাউ, করলা, শশা, তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি সব্জীগুলি উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে শশাকী বর্গীয় (Cucurbitaceæ) শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের জন্মমৃত্যু, জীবনধারণ, পরিচর্য্যা সমস্তই প্রায় একই রকম। এই শশাকী বর্গীয় প্রত্যেক গাছটি বর্ষজীবী ও লতানিয়া স্বভাববিশিষ্ট। অনেক সময় অনেকে আমাদিগের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তাঁহার গাছগুলি বেশ সতেজ হইয়াছে ও যথেষ্ট ফুল ধরিতেছে কিন্তু ফুল বা ফল গাছে বৃদ্ধি না পাইয়া ঝরিয়া যায় এবং ফল হয় না কেন? এই জাতীয় গাছের প্রত্যেকের পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্প বিভিন্ন বৃন্তে প্রস্ফুটিত হয়। মাছি মৌমাছি প্রভৃতি পুংরেণু বহন করিয়া স্ত্রীরেণুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। এই মাছির অভাব হইলে এই ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। সে সময় যদি একটি পুং পুষ্প তুলিয়া আনিয়া পরিষ্কার নরম তুলি বা পালক দ্বারা পুং

পুষ্প হইতে পুংরেণু বা পরাগ স্ত্রী পুষ্পের মধ্যে দেওয়া হয় তাহা হইলে অফুরন্ত ফল পাওয়া যাইবে। ইহাকে artificial pollination বলে। উৎসাহী ব্যক্তি এই উপায়ে শশাকীর বিভিন্ন জাতীয় সব্জীর পুষ্পরেণু সংযোগে নূতন গুণযুক্ত শঙ্কর সব্জীর সৃষ্টি করিতে পারেন। আমেরিকা ও য়ুরোপে এই উপায়ে এত নূতন নূতন গাছের সৃষ্টি হইতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। লুথার বুরব্যাঙ্ক এই উপায়ে বহু নূতন নূতন গাছ সৃষ্টি করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন।

উচ্ছে

কেবল বেলে মাটি ছাড়া অন্য সমস্ত মাটিতেই উচ্ছে ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার। একপ্রকার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করিলে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ফসল পাওয়া যায়। ইহাকে চৈতালী বা ক্ষেতি উচ্ছে বলে। অন্য প্রকার ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বীজ বপন করিলে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ফসল পাওয়া যায়। ইহাকে বর্ষাতি উচ্ছে বলে। চৈতালী উচ্ছে মাটিতে হয় বলিয়া

ইহাকে ভূঁয়ে এবং বর্ষাতি উচ্ছে মাচায় হয় বলিয়া ইহাকে পালা উচ্ছে বলে। ইহাকে যত্ন করিয়া চাষ করিলে বারমাসই ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি দেড় পোয়া বীজ লাগে।

জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া বিঘা প্রতি ৮।১০ মণ গোবর সার মিশাইতে হইবে। পরে জমিতে ৩।৪ ফিট অন্তর এক-একটী মাদা করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। ৭।৮ দিনের মধ্যেই বীজ হইতে চারা বাহির হইবে। বীজ জমিতে বপন করিবার পূর্ব্বে ৬।৭ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। বীজ হইতে চারা বাহির হইলে সবল চারাগুলি রাখিয়া জমি হইতে অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল চারাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। উচ্ছে গাছে প্রয়োজন মত নিয়মিত ভাবে জল-সেচন আবশ্যক।

ইহার ফল পাতা প্রভৃতি ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উচ্ছের প্রস্তুত তরকারী তিক্ত বলিয়া সকলের প্রিয় না হইলেও ইহা কফ-পিত্তনাশক, রুচি ও বলকারক প্রভৃতি গুণ থাকাতে জ্বরমুক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির বিশেষ উপকারী। এক ছটাক আন্দাজ উচ্ছে পাতার রসের সহিত সামান্য পরিমাণে বিট লবণ মিশ্রিত করিয়া

খাওয়াইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্যক, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচিনাশক এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, রক্তদোষ, কমলা, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

করলা

ইহা দেখিতে উচ্ছের ন্যায় কিন্তু আকারে উচ্ছে অপেক্ষা অনেক বড়। ইহা পত্রের শিরা অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ত্রিশিরা ও চতুঃশিরা।

করলা গ্রীষ্ম ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই জন্মিয়া থাকে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে যে বীজ বপন করা হয় তাহার ফলন ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পাওয়া যায়। ইহাকে গ্রীষ্মের বা চৈতালী করলা বলে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে আর এক দফা বীজ বপন করিতে হয় তাহার ফলন আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পাওয়া যায়। ইহাকে বর্ষাতি করলা বলে। করলার গাছে রীতিমত জল-সেচন ও পরিচর্য্যা করিতে পারিলে ইহার ফলন প্রায় বারমাসই পাওয়া যায়।

করলার জমিতে পর পর আটটা চাষ দিয়া ৩।৪ ফিট অন্তর এক-একটী মাদায় ২।৩টী বীজ পুঁতিয়া দিলে ৭।৮

দিনের মধ্যে চারা বহির্গত হয়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে একদিন জলে ফিজাইয়া রাখিতে হয়। সতেজ চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া ফেলা উচিত। বিঘা প্রতি ⁄।।০ সের বীজ লাগে।

খইল ইহার উৎকৃষ্ট সার কিন্তু আলুর জমিতে ইহা বপন করিলে প্রথমে সার প্রয়োগের কোন আবশ্যক হয় না। প্রতি বিঘায় ৬⁄০ হইতে ৮⁄০ মণ খইল দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে অর্দ্ধ মণ পরিমিত লাইনের মাঝে দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া ঐ মাটি ক্রমশঃ গাছের গোড়ায় টানিয়া উঁচু করিয়া দিতে হয়। করলার ক্ষেত সর্ব্বদা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। জমির উপর ৪।।০ ফুট উচ্চ বাঁশ ও কঞ্চি দিয়া মাচা বাঁধিতে হইবে। মাচায় উঠিবার পূর্ব্বে গাছ হইতে পাশগজা বা ফেঁকড়ি বাহির হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে মাচায় উঠিবার পর গাছ খুব তেজাল হইয়া সম্যক্ বিস্তার লাভ করিবে। গাছ হইতে প্রত্যহ পাকা ও পোকাধরা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে করলা মাটিতে লতাইয়া চাষ করেন বটে কিন্তু তাহাতে ইহার ফসল সুবিধাজনক হয় না। বিঘা প্রতি ১০০⁄০ মণ ফসল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, ক্রিমি, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। করলার পাতা বিরেচক, ফুল মলরোধক ও রক্তপিত্তে উপকারক। করলা পাতার রস কাঁচা হরিদ্রা রসের সহিত সেবন করিলে হামজ্বর, বিস্ফোটক ও বসন্ত ভাল হয়। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ সকালে উচ্ছে বা করলার বীজ খাইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

কাঁকরোল

ইহা করলা, ঝিঙ্গে, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার বীজ অনেকটা দেখিতে করলার বীজের ন্যায় কিন্তু করলার মত ইহার বীজের গাছ ভাল ও সুফলপ্রসূ হয় না। এজন্য ইহার গেঁড় বা মূল হইতেই গাছ জন্মান প্রশস্ত। সাধারণতঃ দুই জাতীয় কাঁকরোল দেখা যায়। ছোট জাতির বীজে গাছ হয়, বড় জাতীয় বীজে গাছ ভাল হয় না। কোন

এক স্থানে ইহার মূল রোপণ করিলে প্রতি বৎসরই সেইস্থানেই গাছ বাহির হইয়া থাকে। বীজ হইতে গাছ প্রস্তুত করিলে ফসল পাইতে দুই বৎসর সময় লাগে। শীত সমাগমে ইহার গাছ মরিয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে গাছ বর্দ্ধিত হইয়া বর্ষায় ফুল ফল প্রসব করে। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানেও ইহার চাষ করা চলে।

দোআঁশ বা পলি মাটিতে ইহা খুব ভাল জন্মে। কেবল অধিক বেলে বা এঁটেল জমিতে ইহা ভাল জন্মে না। এইরূপ জমিতে চাষ করিতে হইলে লতাপাতা ও গোয়ালের আবর্জ্জনাদি-পচা সার, কচুরি পানা পচা, ছাই, গোবর প্রভৃতি মিশাইয়া লইতে হয়। জমিতে ৪ হাত অন্তর লাইন দিয়া ঐরূপ ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া তাহাতে মূল রোপণ করিতে হয়। মাদাগুলি এক হাত গোলাকার ভাবে ও আধ হাতের উপর গভীর করিয়া খুঁড়িতে হইবে। গাছ বাহির হইলে ও একটু বড় হইয়া উঠিলে মাচায় বা পালায় তুলিয়া দিতে হয়। ইহা জমিতে লতাইয়া ফল দিতে পারে না। বিশেষত বর্ষায় ইহার ফল জন্মে এজন্য ঝিঙ্গা করলা প্রভৃতির ন্যায় কোন কিছু অবলম্বনের আবশ্যক হয়। আবশ্যক মত জল সেচন ও আগাছা তুলিয়া ফেলা ভিন্ন ইহার চাষে আর অন্য

কোন পাটের আবশ্যক নাই। বিঘা প্রতি ৴॥০ সের বীজ লাগে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার মূল বপন করিতে হয় এবং শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া থাকে। পটলের ন্যায় ইহার মূল লাগাইতে হয়। এদেশে বিস্তৃত ভাবে ইহার চাষ হইতে দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে বন্য ভাবে জন্মিয়া থাকে এবং সময়মত ফুল ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। যত্ন পূর্ব্বক চাষ ও পরিচর্য্যা করিতে পারিলে ইহার ফল আকারে বড় এবং অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। সাধারণতঃ উচ্ছে বা করলার ন্যায় ইহার আস্বাদ তিক্ত নহে। ইহাতে শর্করার ভাগ অধিক থাকে বলিয়া মিষ্ট-আস্বাদযুক্ত, রুচিকর এবং অনেকের প্রিয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—ইহা মধুর-কষায় রস, লঘু, শীতল, রুক্ষ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বমি, রক্তদোষ ও শ্লেষ্মানাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরি ও নেত্ররোগে হিতকর।

ঝিঙ্গা

ঝিঙ্গা প্রধানতঃ দুই প্রকার ; এক প্রকার মাটিতে লতাইয়া ফল প্রদান করে তাহাকে ভুঁয়ে, চৈতে বা গ্রীষ্মের এবং অন্য প্রকার যাহা মাচায় বা পালায় উঠাইয়া দিতে হয় তাহাকে পালা বা বর্ষার ঝিঙ্গা বলে। ভুঁয়ে ঝিঙ্গার গাছগুলি বেশী দীর্ঘ হয় না কিন্তু পালা ঝিঙ্গার গাছগুলি দীর্ঘপ্রসারী। অন্য একপ্রকার পালা ঝিঙ্গা গাছ এদেশে জন্মিয়া থাকে উহার এক-একটী বৃন্তে পটলের ন্যায় ৪।৫টী ছোট ছোট ঝিঙ্গা জন্মিয়া থাকে। জব্বলপুরে একপ্রকার পালা ঝিঙ্গা পাওয়া যায়, উহা ২-২॥০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

ভুঁয়ে ঝিঙ্গার বীজ পৌষ হইতে ফাল্গুন এবং পালা ঝিঙ্গার বীজ বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে। ভুঁয়ে ঝিঙ্গার জন্য জমিতে তিন ফিট অন্তর এবং পালা ঝিঙ্গার জন্য ৫ ফিট অন্তর মাদা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোয়ালের আবর্জ্জনা ও পুরাতন গোবর-সার প্রয়োগ করিতে হইবে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ৮।১০ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী

করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। চারা বাহির হইলে জমি হইতে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, জমি হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা ও আবশ্যক মত গাছে জল-সেচন ভিন্ন ইহার আর কোন পাট নাই।

বীজ ঝিঙ্গা বড় এবং নিখুঁত দেখিয়া রাখা আবশ্যক। পাকিয়া শুকাইয়া যাওয়ার পর উহা গাছ হইতে তুলিতে হইবে। ঝিঙ্গা-জালতি গাত্রমার্জ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। একপ্রকার ঝিঙ্গা এদেশে আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়; উহার ফল তিক্ত। ক্ষেতে এরূপ ঝিঙ্গার চাষ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিঘ প্রতি প্রায় তিন ছটাক বীজ লাগে এবং দেড় মাস হইতে দুই মাসের মধ্যে গাছে ফলন আরম্ভ হয়। স্থান বিশেষে ঝিঙ্গা বীজ মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ঝিঙ্গা—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতল ও ত্রিদোষনাশক এবং মলরোধক ও আধ্মানের শান্তিকারক।

চিচিঙ্গা (হোঁপা)

ইহা একপ্রকার লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। সাধারণ দোআঁশ মাটিতেই ইহার চাষ করা যাইতে পারে। জমিতে ৬ ফিট লাইন দিয়া ৩ ফিট অন্তর ব্যবধানে এক একটি মাদা করিয়া তাহাতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা মিশাইতে হইবে। প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। বীজ বপনের পূর্ব্বে উহা ১০।১২ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া লইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গা*, ধুন্দুল প্রভৃতির ন্যায় চিচিঙ্গা গাছেরও মাচা আবশ্যক। গাছগুলি একটু বড় হইলে কঞ্চি সাহায্যে পালায় বা মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। জমিতে সবল গাছ রাখিয়া বাকি দুর্ব্বল চারাগুলি তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। সাধারণতঃ একপ্রকার খর্ব্বকায় চিচিঙ্গা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার আস্বাদন তিক্ত; এজন্য

* অনেক সময় ঝিঙ্গা ও শশা ভাল বীজ হইতে জন্মাইলেও তিক্ত আস্বাদযুক্ত হয়। অনেকে বলেন মূল শিকড় হাঁড়ি বা কলসী-ভাঙ্গা খাপরায় লাগিলে ফল তিক্ত হয়।

ভাল জাতীয় বীজ বিশ্বস্ত স্থান হইতে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। চিচিঙ্গা ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে কলার পেটো বা সূতার একদিকে ঢিল বাঁধিয়া অন্যদিকে চিচিঙ্গার নিম্নভাগের সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে। যে ঢিল বাঁধা হইবে তাহার ভার যেন ফলটী সহ্য করিতে পারে। ঢিল বাঁধিয়া না দিলে অনেক স্থলে চিচিঙ্গা লম্বা না হইয়া তালগোল পাকাইয়া যায়। এইজন্য চিচিঙ্গাতে ঢিল বাঁধিয়া দিবার নিয়ম প্রচলিত।

এদেশে সাদা এবং কাল ডোরাযুক্ত চিচিঙ্গা দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চলে দীর্ঘ লম্বাকৃতি চিচিঙ্গা জন্মে। উহা অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশের চিচিঙ্গার আস্বাদন উৎকৃষ্ট। কচি অবস্থাতেই চিচিঙ্গা রন্ধন করিয়া খাওয়া যুক্তিসঙ্গত; কারণ, পরিপুষ্ট চিচিঙ্গা উত্তমরূপে রন্ধন করিলেও উহাতে একপ্রকার গন্ধ অনুভূত হয়।

চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। বীজ বপনের পর হইতে ২ মাস ২॥০ মাসের মধ্যে গাছে ফলন আরম্ভ হয়। বিঘা প্রতি ১০।১২ তোলা বীজ লাগে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, তুষ্টিকর, শ্রান্তি, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা ও

পিত্তবিকারে হিতকর এবং শোথরোগের পথ্য। ইহার পক্ক ফল—গুরুপাক, রক্তবর্দ্ধক এবং দাহ ও তৃষ্ণাকারক।

ধুন্দুল

ইহা ঝিঙ্গার স্থায় লতানিয়া উদ্ভিদ্। ইহার জন্য মাচার আবশ্যক কিন্তু ইহার গাছ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া লতাইয়া যায় বলিয়া অনেক স্থলে উহা ডালপালা বিশিষ্ট গাছে তুলিয়া দেওয়া হয়। ইহার কয়েকটি জাতি আছে, যথা—সাদা, সবুজ ও তিক্ত। তিক্তগুলি বন্য জাতীয়।

চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। গোবর সারই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণ জমিতে ইহার বীজ ৭।৮ হাত অন্তর বপন করা চলে। বিঘা প্রতি ৮।১০ তোলা বীজ লাগে এবং ১॥০ মাস হইতে ২ মাসের মধ্যেই গাছে ফলন আরম্ভ হয়। ধুন্দুল সাধারণতঃ এক হাত লম্বা হইয়া থাকে কিন্তু কোন কোন স্থলে উহা ১॥০ হাত পর্য্যন্তও জম্মিতে দেখা যায়। জাপানি ধুন্দুল খুব বেশী লম্বা ও মোটা হয়। এক-একটী গাছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধুন্দুল ফলিয়া থাকে।

কচি ধুন্দুল হইতে সুন্দর ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। সামান্য ছিবড়া বাঁধিলেও উহা চচ্চড়ি প্রভৃতি তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধুন্দুল পাকিয়া গেলে আহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। উহার শুষ্ক ছাল সদৃশ আবরণকে জালি বা জালতি বলে। উহা গাত্র-ধৌতকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক, ব্রণরোধক, বায়ু এবং রক্তপিত্ত রোগে উপকারক।

লাউ

সংস্কৃত অলাবু শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষায় লাউ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আর এক সংস্কৃত নাম তুম্ব। পিত্ত নাশ করে বলিয়া উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। মুসলমানদের সময় হইতেই ইহা সংক্ষেপে কদু নামে পরিচিত। ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ্।

অলাবুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই জন্মে। গ্রীষ্মের লাউ বীজ ফাল্গুন হইতে

জ্যৈষ্ঠ এবং শীতের বীজ আশ্বিন হইতে পৌষ মাসের মধ্যে বপন করা আবশ্যক।

জাতিভেদে লম্বা, গোল ও বোতলাকৃতি প্রভৃতি বহুপ্রকার লাউ আছে। জমিতে গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মাছ-ধোয়া আঁশ-জল, চাল-ধোয়া জল এবং বাসি ফেন লাউগাছের উত্তম সার।

জমিতে ৫।৬ ফিট অন্তর ৩ ফিট ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া তাহাতে ছাই, গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা মিশাইতে হইবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলি ৮।১০ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী করিয়া বপন করা যাইতে পারে। চারা বাহির হইলে সবল চারাগুলি রাখিয়া জমি হইতে দুর্ব্বল চারাগুলি তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। বিঘা প্রতি আধপোয়া আন্দাজ বীজ আবশ্যক হয়।

লাউগাছ মাটিতে লতাইয়া ফল প্রসব করিতে পারে না, এইজন্য উহা মাচায় তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। বাস্তুকৃষি হিসাবে পল্লীগ্রামের গৃহস্থবাটীতে, বাটীর আশেপাশে লাউ-এর চাষ করা হইয়া থাকে। এরূপস্থলে গাছগুলি খোড়ো চালে উঠাইয়া দেওয়া হয়। পুষ্করিণীর পাড়ে লাউ-

গাছ রোপণ করিলেই সেই গাছে অধিক ফলন হয় এবং লাউও বড় হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বীজ বপনের পর দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যে গাছে লাউ ফলিতে আরম্ভ হয়।

আর্দ্র বায়ুতে লাউ বৃহদাকারে জন্মে। এইজন্য অনেক স্থলে লাউ-মাচার নিম্নে অথবা প্রত্যেক লাউয়ের তলায় জলপূর্ণ প্রশস্ত পাত্র রাখিবার প্রথা আছে। পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী গাছের লাউ বড় হইবার এবং অধিক ফলবতী হইবার ইহাই অন্যতম কারণ। এক প্রকারে লাউকে বীজশূন্য ও বৃহৎ করা যাইতে পারে। লাউয়ের উপরি-ভাগস্থ বীজের গাছের ভাল সতেজ চারা ১।।০ ফিট আন্দাজ বড় হইয়া উঠিলে সেই গাছের সর্ব্বনিম্নভাগের গাঁইটের উপরিভাগ হইতে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কিছু-দিন পরে ঐ গাঁইটের পাশ হইতেই একটী ডগা বাহির হইবে। ঐ ডগাটী পূর্ব্বের ন্যায় কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ঐরূপে ডগা বাহির হইলে পর পর সাতবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাটিয়া দিতে হইবে। সাতবারের পর যে ডগা বাহির হইবে তাহাই সযত্নে রক্ষা করিয়া মাচায় উঠাইয়া দিতে হইবে। উহাতে যে ফল হইবে তাহা আকারে বৃহৎ এবং বীজশূন্য হইবে।

লাউ হইতে নানাবিধ তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার চাটনি অতি মুখরোচক খাদ্য। কচি লাউয়ের ঝোল স্নিগ্ধকারক। ইহার ডাঁটা, পাতা, ফুল ও বীজ খাদ্য ও ঔষধ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কচি লাউ খুব সরু সরু করিয়া কাটিয়া পায়সের ন্যায় দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে বেশ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। তাহাকে 'লাউ-দুল' কহে। প্রস্রাব বন্ধ হইলে লাউ পাতার অথবা ডাঁটার রস খাওয়াইলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। লাউচূর্ণের মোদক চিনি ও মধুসহ সেবনে প্রদররোগ আরোগ্য করে। লাউ-বীজ-চূর্ণ মেষদুগ্ধ ও মধুসহ সেবনে অশ্মরী রোগের উপশম হয়। লাউ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মাষকলাই-এর সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভাদ্র ও চৈত্র মাসে হিন্দুদের মধ্যে লাউ ভক্ষণ করিবার রীতি নাই। এই সময়ে লাউ পরিপক্ক ও শক্ত হইয়া খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বোধ হয়, এইজন্যই হিন্দুদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। হিন্দুশাস্ত্র মতে নবমী তিথিতেও লাউ ভক্ষণ নিষেধ।

দেরাডুন (Dehradun) অঞ্চলে একপ্রকার ক্ষুদ্র গোলাকার তিক্ত লাউ জন্মিয়া থাকে। উহা আহারের জন্য ব্যবহৃত হয় না। ঐরূপ সুপক্ক লাউয়ের খোলা হইতে

সেতার, একতারা, তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে লাউ—মধুররস, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রজনক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং ধাতু-পুষ্টিকারক।

ইহা লঘুপাক এবং পাণ্ডু, কৃমি, কফ, বায়ু, ব্রণ, বিষ, শ্বাস, কাস ও মূত্ররোগে হিতকর।

চাল বা ছাঁচি কুমড়া

সাধারণতঃ ঘরের চালে শোভা পাইয়া থাকে বলিয়া ইহা চালকুমড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে জমিতে বর্ষার জল দাঁড়ায় সেরূপ জমি ইহার চাষের অনুপযুক্ত। ছায়াযুক্ত স্থানে ইহা ভাল জন্মে না। সরস মৃত্তিকায় ইহার চাষ করা উচিত। দোআঁশ, এঁটেল ও পলিমাটিতে ইহা ভাল জন্মে। পুরাতন গোবর, ছাই ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সাররূপে ব্যবহার করিতে হয়।

যেস্থানে ইহার বীজ বপন করিতে হইবে সেইস্থানে এক হাত আন্দাজ গর্ত্ত করিয়া উহাতে সার প্রয়োগ করিয়া ৩।৪ দিন উহাতে অল্প অল্প জল ঢালিতে হইবে। ইহার ৩।৪ দিন পরে নিড়ানি দ্বারা মাটি উস্কাইয়া দিয়া ছাঁচি কুমড়ার বীজ ৩।৪টী করিয়া বপন করিতে হইবে। চারা বাহির হইলে দুর্ব্বল চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। চারাগুলি ১ হাত আন্দাজ দীর্ঘ হইলে কোন অবলম্বন দেওয়া আবশ্যক। ইহা মাচায়, গাছের উপর বা ঘরের চালে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঘরের চালে তুলিয়া দিলে ইহার ফলন বেশী পাওয়া যায়।

চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। ইহার আকার একটু লম্বা। সাধারণতঃ গৃহস্থের বাটীতে বাস্তুসব্জী হিসাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফল পরিপুষ্ট হয়। সুপক্ক কুমড়া মাচায় ঝুলাইয়া রাখিলে দীর্ঘ দিন ঠিক-ভাবে থাকে।

বাঙ্গালাদেশে অনেক গৃহস্থবাটীতে শীতকালে এই কুমড়ার ভিতরকার শাঁস কুরিয়া লইয়া মাসকলাই-এর ডালের সহিত বাটিয়া অন্যান্য মসলা সহযোগে একপ্রকার বড়ি প্রস্তুত করা হয়; রন্ধন করিলে উহা অতি উপাদেয়

হইয়া থাকে। পূজার সময় বলির কার্য্যে এই কুমড়া ব্যবহৃত হয়। এইজন্য অনেকে ইহাকে বলির কুমড়াও বলে। হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ।

চাল কুমড়া হইতে অনেক কবিরাজি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুষ্মাণ্ড হইতে যে সুরা বা মদ প্রস্তুত হয় তাহাকে 'কুষ্মাণ্ড সুরা' বলে। এই সুরা গুরুপাক, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধনকারক। আয়ুর্ব্বেদ মতে কুমড়ার গুণ, যথা—ইহা শীতল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, শ্লেষ্মাজনক এবং পিত্তরক্ত ও বায়ুর উপকারক। কচি কুমড়া শীতল ও পিত্তনাশক। মধ্যম অর্থাৎ পরিপুষ্ট অথচ অপক্ব কুমড়া গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক। পাকা কুমড়া মধুর রস, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, নাতিশীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত-নাশক, বস্তিশোধক এবং চিত্তবিকারে উপকারক।

কুমড়ার লতা ও শাক ক্ষারগুণযুক্ত, মধুর রস, রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকারক এবং বায়ু, কফ, অশ্মরী ও শর্করা-রোগে হিতকর। লতামধ্যস্থ মজ্জা মধুর রস, মলমূত্র-নিবারক, রুচিকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃষ্ণানিবারক, বলকারক, পিত্তনাশক এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও

অশ্মরীরোগে হিতকর। কুমড়া-বীজের তৈল শীতল, গুরুপাক, বাতপিত্তনাশক ও কফবর্দ্ধক।

রিটাফল দ্বারা যেমন রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করা হয় এই কুমড়ার অভ্যন্তরস্থ জলের ন্যায় পদার্থ হইতেও ঐ ভাবে পশম ও রেশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে পারা যায়।

মিঠা কুমড়া

ভারতবর্ষ ইহার ঠিক আদি জন্মস্থান নয় কিন্তু এদেশে ইহার চাষ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ব্যবহার এত অধিক যে কুমড়া এদেশেরই সজ্জী বলিয়া মনে হয়। স্কোয়াস ও পামকিন রূপান্তরিত হইয়া কুমড়ার আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা বিলাতী কুমড়া, সূর্য্য কুমড়া ও মিঠা কুমড়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিবেচনা পূর্ব্বক চাষ করিলে বৎসরে প্রায় বারমাসই এই ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কুমড়া গাছ মাটিতে লতাইয়া ফল দেয় আবার উহা মাচাতেও তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

গ্রীষ্মের বা চৈত্তালী কুমড়ার বীজ পৌষ মাঘ মাসে, বর্ষার বা আউসে কুমড়ার বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং শীতের কুমড়া-বীজ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। যে কোন জমিতে উহা জন্মিয়া থাকে। পার্ব্বত্য জমিতে ইহা ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বপন করা হইয়া থাকে।

ইহার জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া তাহাতে গোবর-সার, গোয়ালের আবর্জ্জনা, ছাই ও পাঁকমাটি মিশাইতে পারিলে ভাল হয়। জমি প্রস্তুত হইলে ৬।৭ হাত অন্তর ৩।৪ হাত ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া তাহাতে ৩।৪টী করিয়া বীজ বুনিতে হইবে। চারা বাহির হইলে সবল চারাগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য চারাগুলি ক্ষেত হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। গ্রীষ্মের কুমড়ার জমিতে রীতিমত জল-সেচনের ব্যবস্থা করা উচিত। ভালরূপে সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিলে কুমড়ার আকারও অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। অনেকে আলু ক্ষেতে, জলের নালার ধারে ও দাঁড়ার পিছনে কুমড়ার চাষ করেন। ইহাতে সার ও পরিচর্য্যা কম লাগে।

কুমড়া গাছ মাচায় তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু মাচার গাছ অপেক্ষা ভূমিতে কুমড়ার ফলন অধিক হয়। বর্ষার কুমড়াগাছে একটু যত্ন লইতে হইবে।

কারণ, এসময় জমি কর্দ্দমাক্ত থাকে, সুতরাং সিক্ত জমিতে কুমড়া শীঘ্র পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কুমড়া ধরিলে সেগুলি ইট, খোলা, খড় বা অন্য কোন জিনিষ দিয়া উঁচু করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ২॥০-৩ মাসের মধ্যেই গাছের ফলন আরম্ভ হয়। বিঘা প্রতি তিন ছটাক বীজ লাগে। রীতিমত চাষ করিতে পারিলে খরচ-খরচা বাদে বিঘা প্রতি ৮০৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

কুমড়া হইতে নানাবিধ তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন অন্য কোন সব্জী পাওয়া যায় না তখন কেবল কুমড়াই সকল অভাব পূরণ করিয়া থাকে। কুমড়ার পাতা, ডাঁটা, ফুল প্রভৃতি সমস্তই তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুমড়া হইতে একপ্রকার মিষ্টান্নও প্রস্তুত হয়। কুমড়ার বীজের উপরিভাগস্থ খোসাটি বাদ দিয়া চিনি ও ঘৃত দিয়া পাক করিলে একপ্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুপ্রকোপক ও শ্লেষ্মা-নাশক।

চুনা বা গিমাকুমড়া

ইহার গঠন বিলাতী কুমড়ার ন্যায় হইলেও দেশী কুমড়া বা চাল কুমড়ার ন্যায় ইহার রং সাদা এবং সাধারণ কুমড়া অপেক্ষা ইহা আকারে ছোট। ইহা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ইহা গিমাকুমড়া নামে পরিচিত। আকারে ছোট বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে চুনা কুমড়া এবং দেখিতে সাদা বলিয়া কেহ কেহ ইহার সাদা কুমড়া নাম দিয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গের পলিযুক্ত চরভূমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার বীজ বপন করা হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে ফল প্রদান করিয়া গাছগুলি মরিয়া যায়। ইহার জন্য মাচার আবশ্যক হয় না। ইহা জমির উপর লতাইয়া ফল দেয়। বিঘা প্রতি ১০ তোলা বীজ লাগে। ইহার চাষ ও পরিচর্য্যা কুমড়ার মতই করিতে হয়।

চাউ চাউ

গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকা প্রদেশে চিরস্থায়ী লতা জাতীয় সজী। পাতা ও লতা অনেকটা তেলাকুঁচার স্থায়। মাচা ও গেটের উপর ইহাকে জন্মান হয়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এ ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ও কলিকাতার বাজারে আমদানী হয়। এদেশে ইহাকে 'স্কোয়াস' নামে অভিহিত করা হয় কিন্তু ইহা প্রকৃত স্কোয়াস নহে। চীন ও জাপান দেশে ইহার যথেষ্ট আদর আছে।

ইহার বীজ হইতে চারা হয় না। গাছের সুপক্ক ফল হইতে ২০-২৫ দিনের মধ্যে শিকড় ছাড়িয়া গাছ বাহির হয়। তিন ফিট প্রশস্ত ও দেড় ফিট গভীর গর্ত্ত করিয়া উত্তমরূপে গোয়ালের আবর্জ্জনা সার দিয়া এই পাকা ফল গাছের জন্য বসাইতে হয়। এই গাছের মূল হইতেও অতি উপাদেয় তরকারী প্রস্তুত হয়। ফল দেখিতে অনেকটা কাফ্রী পেয়ারার স্থায়। গাত্র আবড়ো-খাবড়ো ও ছোট ছোট কোমল শুঁয়াযুক্ত। ইহা আলুর স্থায় তরকারীতে ও ঝোলে খাইতে বেশ সুস্বাদু লাগে। শ্রাবণ হইতে

কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সুপক্ক ফল বীজ হিসাবে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। নদীয়া ও যশোহরে ইহার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। সমুদ্রতল হইতে ১৫০০ ফিট উচ্চ এবং দোআঁশ, শীতল ও শুষ্ক স্থানে ইহা খুব ভাল জন্মায়।

পামকিন ও স্কোয়াস

আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশই ইহাদের জন্মস্থান। এই পামকিন ও স্কোয়াস বর্ণশঙ্করভাবে উৎপন্ন হইয়া এদেশে বিলাতী কুমড়া নামক একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

দোআঁশ জমিতে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহার জমি এক হাত আন্দাজ গভীর ভাবে কর্ষণ করিয়া তাহাতে হাড়ের গুঁড়া, গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইবে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে ১০।১২ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া জমিতে বপন করা যাইতে পারে। ইহাতে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ৫।৬ হাত

অন্তর ৩।৪ হাত ব্যবধানে এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে এবং চারা বাহির হইলে সতেজ চারাগুলি রাখিয়া বাকিগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। গাছ একটু বড় হইলে কঞ্চি বা পালার সাহায্যে মাচায় তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বৎসরে দুইবার ইহার বীজ বপন করা হইয়া থাকে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার এবং ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাসে পুনরায় ইহার বীজ বপন করা হইয়া থাকে। স্কোয়াস ও পামকিনের মধ্যে কতকগুলি গাছ লতানিয়া এবং কতকগুলি ঝোপের ন্যায় ঝাড়াল হয়, তাহাদের মাচার আবশ্যক হয় না। হোয়াইট বুস, ক্রুকনেক, কোকোজেলী ভেজিটেবল্ ম্যারো, ফোর্ডক প্রভৃতি জাতীয় বীজ গ্রীষ্মকালে এবং হাবার্ড, বোষ্টন ম্যারো, ম্যামথচিলি, ম্যামথ হোয়েল প্রভৃতি জাতীয় বীজ শীতের পূর্ব্বে বপন করা যাইতে পারে।

স্কোয়াস ও পামকিনের বহু বিভিন্ন জাতি আছে। কতকগুলির গাত্র করলার ন্যায় উঁচুনীচু, কতকগুলির ঘাড় বাঁকা, কতকগুলি চ্যাপ্টা এবং কতকগুলি আকারে লম্বা হইয়া থাকে। জাতিভেদে ইহা এক-একটী অর্দ্ধ

পোয়া হইতে সওয়া মণ পর্য্যন্ত ওজনে হইয়া থাকে। স্কোয়াস্ ও পামকিন বীজ উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। লতা জাতীয় স্কোয়াস বা পামকিনের বীজ বিঘা প্রতি তিন ছটাক এবং ঝোপ জাতীয় পামকিন বা স্কোয়াস বীজ পাঁচ ছটাক আন্দাজ লাগে।

তরমুজ

তরমুজের আদি উৎপত্তি স্থান যে ভারতের কলিঙ্গ নামক দেশ তাহা তরমুজের কালিঙ্গ নামক নাম হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তরমুজের চাষ আজকাল পৃথিবীর নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকায় গিয়া ইহা সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার জল-হাওয়ার অবস্থা অনেকটা ভারতের অনুরূপ। এইজন্য তথায় বিস্তৃতভাবে তরমুজ চাষ হইয়া থাকে।

আকৃতি ও জাতিভেদে বহুপ্রকারের তরমুজ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে লম্বা ও গোল উভয় আকৃতির

তরমুজ জন্মে। বাংলা দেশে লম্বা আকারের তরমুজই অধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। জাতিভেদে তরমুজ বহুপ্রকারের আছে। এদেশে গোয়ালন্দ, আমতা, সাহারাণপুরী, ভাগলপুরী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় তরমুজ দৃষ্ট হয়। এদেশের তরমুজ এক-একটী ৩০।৩৫ সের ওজনে হইয়া থাকে। আজকাল আমেরিকা হইতে আইসক্রিম, টমওয়াট্‌সন কোলোরাডো, আরাকান ট্রাভলার, রাসিয়ান প্রভৃতি নানা বিভিন্ন জাতীয় তরমুজ বীজ এদেশে আমদানি করিয়া চাষ করা হইতেছে। এই সমস্ত বিদেশী জাতীয় বীজের ফলও কলিকাতার বড় বড় বাজারে আমদানি হইতে দেখা যায়। পক্ক অবস্থায় কোন কোন তরমুজের বীজ ঘোর লালবর্ণ, কোন বীজ লোহিতাভ ধূসর, এবং কোন বাজ কৃষ্ণবর্ণের হয়।

পলি পড়া চর জমিতে* অথবা বেলে দোআঁশ জমিতে তরমুজ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে ও জমির উপর লতাইয়া ফল প্রদান করে। স্থান বিশেষে ইহার আকার ও আস্বাদ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়। চট্‌চটে আঠাল জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে না ও আকারে বড় হয় না। তরমুজ

* দামোদর ও পদ্মার বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের তরমুজ চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লতা গুচ্ছমূলক উদ্ভিদ্ এবং উহাদের শিকড় মাটির মধ্যে অনেক দূর প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য তরমুজ চাষের মাটি হাল্‌কা, বেলে এবং উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া দরকার। জলবসা জমি তরমুজ চাষের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইহার চাষে জল-সেচনের প্রয়োজন হয় না।

এঁটেল মাটিতে ইহার চাষ করিতে হইলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে ছাই, বালি, পাতাপচা সার প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া মাটির স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া আবশ্যক। পলি-পড়া বা চর জমিতে কর্ষণের বিশেষ আবশ্যক হয় না। অন্য জমি হইলে ভালরূপে কর্ষণ করিয়া মাটি চূর্ণ করা আবশ্যক। ইহার জমিতে ২০।২২ মণ গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা এবং অর্দ্ধ মণ রেড়ির খইল সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পলি-পড়া জমিতে সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

জমি প্রস্তুত হইলে চারি পাঁচ হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ঐরূপ ব্যবধানে ৪।৫ ইঞ্চি গভীর একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রতি মাদায় ৩।৪টী করিয়া বীজ পুঁতিতে হইবে। বীজ বপনের পূর্ব্বে ১০।১২ ঘণ্টা-কাল জলে ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়। বিঘা প্রতি ১০।১২ তোলা আন্দাজ বীজ লাগে। পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস

পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার মত উচ্চ স্থানে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাসে বীজ বপন করা হইয়া থাকে। নিম্ন জমিতে বর্ষার জলে নদীর চরভূমি ডুবিয়া যাইবার পূর্ব্বে যাহাতে ফলন তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য তথায় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বীজ বপন করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

আবহাওয়ার গুণে ও জমির অবস্থা ভেদে ৮ দিন হইতে ১২ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারা বাহির হইলে সবল চারা রাখিয়া জমি হইতে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য চারা তুলিয়া ফেলা এবং গাছের গোড়া হইতে আগাছা তুলিয়া দেওয়া উচিত। বড় ফল পাইতে ইচ্ছা করিলে জমি ভালরূপে কর্ষণ করা, গাছে অধিক সংখ্যক ফল জন্মিতে না দেওয়া এবং মূল লতা হইতে যে সমস্ত শাখালতা বাহির হইবে সেগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে তরমুজ ফল অস্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তরমুজ পক্ক হইবার কিছু পূর্ব্বে যে ফলটীকে বড় করিতে হইবে তাহার বোঁটার সন্নিকটে ফলের মুখের স্থান একটু চিরিয়া দিয়া এক হাত কি দেড় হাত আন্দাজ ন্যাকড়া সলিতার

মত করিয়া ভিজাইয়া তরমুজটীর বোঁটার গোড়ায় ছিদ্রের মধ্যে একদিক আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া অপর দিকে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিতে হয়। যে স্থান চিরিয়া দেওয়া হইবে তাহাতে যেন কেবলমাত্র সলিতাটীই প্রবেশ করে এবং বায়ু প্রবেশ করিবার মত ফাঁক না থাকে। জলপূর্ণ পাত্রটী যেন খোলা না থাকে; বোতল হইলেই ভাল হয়। উহা সর্ব্বদা জলপূর্ণ থাকা প্রয়োজন। জলপাত্র এবং ফলটী সর্ব্বদা অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে রাখিতে হইবে। এক পক্ষের অধিক কাল তরমুজটীকে জল-শোষণ করিতে দেওয়া উচিত নয়।

তরমুজ গাছে হলদে ও নীলরঙ্গের ছোট ছোট দুর্গন্ধ-যুক্ত পোকা দেখা যায়। ইহারা ছোট ছোট গাছের কচি কচি পাতাগুলি খাইয়া ফেলে। কেবল তরমুজ গাছ কেন ইহারা লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি গাছের অনিষ্ট করিয়া থাকে। জোনাকিপোকা নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গও তরমুজ গাছের শত্রু। রাত্রিকালে এই পোকার পশ্চাৎভাগ জ্বলিতে থাকে। কাঠের বা ছাইয়ের গুঁড়ার সহিত অল্প কেরোসিন তৈল মিশাইয়া পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে এই পোকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার গুণ, যথা—কাঁচা তরমুজ রসে ও পাকে মধুর, শীতল, মলরোধক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা ফল—উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। তরমুজের পাতা রক্তের স্থিতিকারক।

খেঁড়ো

ইহা এক জাতীয় সব্জী, দেখিতে অনেকটা তরমুজের ন্যায়। বর্দ্ধমান, বীরভূম, সাঁওতাল-পরগণা প্রভৃতি জেলায় খেঁড়ো অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সাহারাণপুর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে যে একপ্রকার খেঁড়ো জন্মে তাহার আকার ভিন্নরূপ। উক্ত দেশে ইহা 'দিলপসিন্দ' বা 'তেন্দো' নামে অভিহিত হয়।

স্থান বিশেষে ইহার বীজ পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বপন করা হইয়া থাকে। ইহার বীজও দেখিতে অনেকটা তরমুজের ন্যায়। খেঁড়ো অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাঁচা অবস্থায় ইহা লাউ, কুমড়ার ন্যায় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। ফল পাকিয়া গেলে উহার

ভিতরকার শাঁস শক্ত হইয়া যায়, সেজন্য তখন আর উহা খাওয়া চলে না। বিঘা প্রতি ৭।৮ তোলা বীজ লাগে। ইহার চাষ তরমুজের অনুরূপ।

খরমুজা

খরমুজা এদেশীয় ফল নহে। ইহার আদি জন্মস্থান মধ্যএসিয়া অর্থাৎ আরব, পারস্য ও আফগানিস্থান। এজন্য পারস্য খরপুজ শব্দের নাম অনুসারে এদেশে উহার খরমুজা বা খরবুজা নাম-করণ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, ইহা প্রথমে মধ্যএসিয়া হইতে যে পৃথিবীর নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু খরমুজা চাষের উপযোগী বিবেচনায় তথায় বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকায় গিয়া ইহা বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এদেশে খরমুজা জন্মিলেও উহা সেরূপ সুগন্ধ ও আস্বাদনযুক্ত হয় না। ভারতের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ও সাহারাণপুরজাত খরমুজা আকারে, স্বাদে ও গুণে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে।

আকার, বর্ণ ও জাতিভেদে খরমুজা বহুপ্রকারের আছে। ইহার আকার গোল এবং প্রায় কমলালেবুর মত দুই পাশ চ্যাপ্টা। সাধারণতঃ দুই প্রকারের খরমুজা দৃষ্ট হয়। একপ্রকার ফলের গাত্র রেখাযুক্ত চিত্রিত, অপর প্রকার ফলের গাত্র বেশ মসৃণ। জাতিভেদে ইহা বড়, ছোট ও নানা আকারের আছে। সবুজ, গাঢ় সবুজ, ফিকে সবুজ, শ্বেত, হরিদ্রা, রক্তিমাভ এবং সোনালী বর্ণের খরমুজাও দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল হনিডিউ, রকিফোর্ড, ব্যানানা, নেটেডজেম, পোলক্স প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী জাতীয় খরমুজা এদেশে চাষ করা হইতেছে।

বাংলার জলহাওয়া খরমুজা চাষের পক্ষে ঠিক উপযোগী না হইলেও এদেশে যে খরমুজা উৎপাদন করা যায় না এমন নহে, তবে বাংলাদেশে যে খরমুজা জন্মে তাহা আদি স্থান বা স্বস্থানজাত খরমুজার ন্যায় স্বাদে ও গন্ধে উৎকৃষ্ট হয় না। সারযুক্ত হালকা দোআঁশ মৃত্তিকাই খরমুজা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চট্‌চটে এঁটেল মৃত্তিকায় খরমুজার চাষ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ মৃত্তিকায় চাষ করিতে হইলে মাটির স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। এঁটেল মৃত্তিকায় বালি, ছাই, পাতাপচা, গোবর প্রভৃতি মিশাইয়া উহা খরমুজা চষের

উপযোগী করিয়া লইতে হয়। পলিযুক্ত চর জমি খরমুজা চাষের পক্ষে প্রশস্ত এবং এরূপ জমিতে কোন সার দিবার আবশ্যক হয় না। যে জমিতে তরমুজ খুব ভাল জন্মে সেই জমিতে ইহার চাষ করা চলে। গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা, রেড়ির খইল খরমুজার জমিতে সার হিসাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া বা লাঙ্গল দিয়া মাটি বেশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া লইতে হয় এবং মাটির সহিত সার মিশাইয়া দিতে হয়। খরমুজা গুচ্ছমূলক উদ্ভিদ্, এজন্য মাটি গভীর ভাবে কর্ষিত না হইলেও চলে কিন্তু উহা উত্তমরূপে চূর্ণিত হওয়া আবশ্যক।

জমি প্রস্তুত হইলে তিন হাত অন্তর লাইন দিয়া ঐরূপ ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হইবে। প্রতি মাদায় ৩।৪টী করিয়া বীজ বপন করা প্রশস্ত এবং চারা বাহির হইলে প্রতি মাদায় অন্ততঃ দুইটি সরল চারা রাখিয়া বাকী নিস্তেজ বা দুর্ব্বল চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। খরমুজার বীজ বপনের পূর্ব্বে ঈষৎ রৌদ্রতপ্ত গরম জলে ১২।১৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া বপন করা শ্রেয়ঃ। জলে ভিজাইবার পর বীজগুলি অল্প ভিজা ছাইয়ের মধ্যে রাখিয়া দিলে শীঘ্র অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৬।৭ তোলা বীজ লাগে। গাছে আবশ্যক

মত জল সেচন করা, গাছের গোড়া নিড়ানি দিয়া আলগা করিয়া দেওয়া ও জমি হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা ভিন্ন ইহার আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

স্থান বিশেষে অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। বর্ষার জলসিক্ত স্থানে চর জমিতে জলদি অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসেই বীজ বপন কার্য্য সমাধা করিতে হয়। এইরূপ স্থানে বর্ষার জলে চর জমি ডুবিয়া যাইবার পূর্ব্বে ফসল উঠাইয়া লওয়া হয়।

গাছগুলি বড় হইয়া লতাইতে আরম্ভ হইলে খড় বিছাইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা বালুকার উত্তাপে খরমুজা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। গাছের শাখালতা ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং অল্প সংখ্যক ফল রাখিয়া রীতিমত যত্ন করিলে বড় ফল পাইবার আশা করা যাইতে পারে। এদেশে মুঙ্গের, লক্ষ্ণৌ, ভাগলপুর, আগ্রা, অযোধ্যা, সাহারাণপুর, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে খরমুজার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। কাবুলের খরমুজা শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট। উচ্চ ও শুষ্ক বায়ুযুক্ত স্থানের ফল বলিয়া ইহাতে জলীয়াংশ কম থাকে। অনেক খরমুজার গাত্রত্বক শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ হইলেও ফলের ভিতরাংশ ঠিক থাকে। এইজন্য উহা দূরদেশে চালান দিবার পক্ষেও বেশ সুবিধা আছে।

তরমুজের ন্যায় খরমুজা গাছও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। শশা, ঝিঙ্গে, কুমড়া প্রভৃতি গাছে যে একপ্রকার ছোট ছোট হরিদ্রাবর্ণের পোকা দেখা যায় উহারা খরমুজা গাছেরও শত্রু। কেরোসিন ইমালসন প্রয়োগ দ্বারা ইহাদের উপদ্রব দমন করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রকারক এবং বাতপিত্তনাশক। যে সমস্ত খরমুজা অম্লমধুর রস ও ক্ষারগুণযুক্ত তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উৎপাদক।

ফুটী ও কাঁকুড়

নদীর চর জমিতে অথবা যে জমিতে বালির ভাগ বা নদীর পলিমাটি অধিক থাকে তাহাতে কাঁকুড় বা ফুটী জাতীয় ফসল ভালরূপ জন্মে। স্থান বিশেষে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। দামোদর নদীর চর জমিতে, চাঁপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীরা জমিতে রস থাকিতে

থাকিতে বীজ বপন করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া আর বিশেষ কোন পাট করে না। জল-সেচনেরও আবশ্যক হয় না।

ইহার জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া ৩।৪ ফিট অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে তিন ফিট ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী করিয়া বীজ বপন করা যাইতে পারে। চারা বাহির হইলে প্রতি মাদায় এক-একটী সবল চারা রাখিয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল চারাগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ দুর্ব্বল গাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয় এবং সেই রোগ ক্ষেত্রস্থ সমস্ত গাছে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কাঁকুড় ও ফুটীগাছ লতানিয়া স্বভাব বিশিষ্ট কিন্তু ইহাদের জন্য মাচা বা পালার আবশ্যক হয় না, ইহারা জমিতে লতাইয়া ফল প্রদান করে।

ফুটী * অনেক রকমের আছে; তন্মধ্যে একপ্রকার কাঁকুড় নামে অভিহিত। পক্ক অবস্থায় কাঁকুড়ের কোন আস্বাদন থাকে না, সেজন্য ইহা কাঁচা অবস্থাতেই তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁচা ফুটী অল্প তিক্ত লাগে। এইজন্য উহা পক্ক অবস্থায় ফলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। ফুটী পাকিলে উহার গায়ের উপরকার পাতলা খোসা

* সুপক্ক ও ফাটা অবস্থায়ও কাঁকুড়কে ফুটী বলা হয়।

ছাড়াইয়া ফেলিয়া চিনি কিংবা গুড় সহযোগে ভক্ষিত হইয়া থাকে। কাঁকুড় ও ফুটীর বীজ দেখিতে প্রায় একই প্রকার। বিঘা প্রতি ৭।৮ তোলা বীজ লাগে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ফুটী—মধুর রস, রুচিকারক, মূত্রদোষ-নাশক, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা রোগের উপশমকারক এবং অতিরিক্ত সেবনে বায়ুর প্রকোপকারক।

কাঁচা কাঁকুড়—রুচিকারক ও পিত্তনাশক। কচি কাঁকুড়—লঘু, শীতল, রুক্ষ অতিশয় মূত্রকারক এবং রক্ত-পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তদোষনিবারক।

ছোট বড় ভেদে কাঁকুড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে বড় কাঁকুড় মধুর রস, শীতল, রুচিকারক, পাচক, পিত্তনাশক, শ্রান্তিকারক এবং কাস ও পীনস রোগজনক।

কাঁকড়ি

ইহার চাষ ফুটীর ন্যায়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। ইহার ফল লম্বা, দেখিতে অনেকটা কাঁকুড়ের মত। কাঁকড়ি কচি

অবস্থায় শশার ন্যায় কাঁচা এবং পুষ্ট হইলে তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। কাঁকড়ি পাকা অবস্থায় খাইতে বিস্বাদ লাগে। ইহা লম্বা ১॥০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৭।৵ তোলা বীজ লাগে।

শশা

আমরা শশাকে ফল হিসাবে এবং সব্জীরূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহার করিয়া থাকি। শশা প্রধানতঃ দুই প্রকার, পালা ও ভূঁয়ে। এতদঞ্চলে পালা শশাই প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। পালা শশার বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বপন করা হয়। ভূঁয়ে শশা বৎসরে দুইবার হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে একবার বীজ বপন করা হয়, উহাকে মাড়মা শশা বলে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আর একবার ইহাদের বীজ বপন করা হয়।

পালা শশা বর্ষাতি ফল। ইহার গাছ বড় ও লম্বা হয়, সুতরাং ইহার জন্য মাচা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। পালা শশার ফল লম্বা হয়। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস

পর্য্যন্ত ইহা ফল দেয়। চৈতে শশার গাছ ছোট হয়, উহা মাটির উপর লতাইয়া ফল প্রদান করে। ইহার গাছ অধিক লতাইয়া যায় না। সেইজন্য মাচারও আবশ্যক হয় না। চৈত্রের চারায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ফল হয়। আশ্বিনের চারায় মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। পালা শশা আকারে বড় এবং ভুঁয়ে শশা আকারে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে কিন্তু পালা শশা অপেক্ষা ভুঁয়ে শশার ফলন অধিক। আশ্বিন মাস হইতে শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলে, পালা শশার গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে শশাগাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ফলন কম হয়। বিঘা প্রতি পালা শশা বীজ ৭।৮ তোলা এবং ভুঁয়ে শশা ১০।১২ তোলা লাগে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলি ৫।৭ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া লওয়া উচিত।

সাধারণতঃ দোআঁশ জমিতে শশা ভাল জন্মে। আঠাল ও বেলে জমিতেও শশা গাছ জন্মিয়া থাকে। জমিতে ৩।৪ হাত অন্তর অন্তর এক হাত আন্দাজ গোলাকার এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা, পাঁক মাটি ও পোড়ো ঘরের পুরাতন মাটি দিয়া গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিতে হইবে। পরে জমি প্রস্তুত হইলে প্রতি মাদায় পৃথক্ ভাবে ৫।৬টী

করিয়া বীজ বপন করিতে পারা যায়। বীজ হইতে চারা বাহির হইলে সবল চারাগুলি রাখিয়া জমি হইতে দুর্ব্বল চারাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। প্রতি মাচায় ২।৩টী গাছ রাখা যাইতে পারে। কোন কোন ভূশায়িত গাছের গ্রন্থি হইতে মূল উৎপন্ন হইয়া গাছ জন্মে। ঐ মূলগ্রন্থির গোড়া হইতে কাটিয়া দিলে উহা পৃথক্ গাছে পরিণত হয়। এই প্রকারে গাছকে অধিক কাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। এই গাছ অধিক কাল জীবিত থাকে।

ছায়াযুক্ত সেঁতসেঁতে স্থানে শশার আবাদ ভল হয় না। ইহার জন্য রৌদ্রযুক্ত স্থান আবশ্যক। শশার বীজ বপন করিবার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে তাহা এই: "বীজগুলির মুখ নিচের দিকে করিয়া পুঁতিলে ফল ছোট হয় ও অল্প ফলে, শোয়াইয়া বপন করিলে ফল মধ্যমাকার এবং মুখ ঈষৎ আড়ভাবে উপরের দিক্ করিয়া রোপণ করিলে ফল বড় হয় এবং ফলন অধিক হয়।" চারাগুলি এক হাত আন্দাজ বড় হইলে মাটি টানিয়া গাছের গোড়া উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের গোড়া নিড়ানি দিয়া আলগা করিয়া দেওয়া এবং জমিতে আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শশা গাছের পাতায়

ও ডালে একপ্রকার ছোট ছোট কাঁটা জন্মে। গাছে অধিক জল বসিলে গাছগুলি পচিয়া যায়। পালা শশার গাছের গাঁইট হইতে সূতার মত সরু কোঁকড়ান পাশ বাহির হইলে গাছের গোড়ায় পালা পুঁতিয়া দিয়া পাশ লতাগুলি ধরাইয়া দিতে হয়।

শশা কচি অবস্থায় ফলরূপে খাওয়া হইয়া থাকে। বড় হইলে ভিতরে দানা জন্মে এইজন্য তখন কাঁচা খাওয়া চলে না। পরিপুষ্ট শশাকে পাঁড় শশা বলে। পাঁড় শশার ভিতরে দানা অম্লরসবিশিষ্ট। সেইজন্য তখন উহা কাঁচা না খাইয়া তরকারীতে ব্যবহার করা হয়। শশা হইতে নানাবিধ তরকারী ও চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লাল ও নীল রঙের একপ্রকার পোকা ও ফড়িং প্রভৃতি পতঙ্গ চারাগাছের পাতা খাইয়া কখনও কখনও গাছ মারিয়া ফেলে। এই পোকার উপদ্রব নিবারণের জন্য অনেকে ছাই, হুঁকার জল, তামাকের জল প্রভৃতি দিয়া থাকেন। শুধু ছাই না দিয়া ছাইয়ের সহিত একটু কেরোসিন তৈল মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। প্রাতঃকালে যখন গাছের পাতা সামান্য ভিজা থাকে সেই সময়ে ছাই ও তামাকের গুঁড়াপাতা প্রয়োগ করা উচিত। ছাইয়ের পরিবর্ত্তে গুঁড়াচূর্ণও দেওয়া চলে। /৫ সের

আন্দাজ ছাই অথবা গুঁড়া চূণের সহিত এক পোয়া আন্দাজ কেরোসিন মিশাইতে হয়। অধিক গাছ হইলে লেড্ আর্সিনিয়েট নামক সেঁকোবিষের জল পাতায় ছিটাইয়া পোকা মারিতে হয়। বেগুন গাছে যে কাঁটালে পোকা লাগে তাহারা শশা গাছেরও অনিষ্ট করে। কখনও কখনও পাতার নিচে জাবপোকা লাগিয়া থাকে। এক-প্রকার রোঁয়াযুক্ত শুঁয়াপোকাও ইহার পাতা খাইয়া থাকে। গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে কাঁচপোকার ন্যায় একপ্রকার পোকা আসিয়া ফুল খাইয়া দেয়। সময়ে সময়ে গন্ধকের ধোঁয়া দিতে পারিলে পোকা পলাইয়া যায়। কাক, শৃগাল প্রভৃতি পশুপক্ষাদি শশা খাইয়া অনিষ্ট করে। এইজন্য অনেকে কিম্ভূতকিমাকার খড়ের মানুষ প্রস্তুত করিয়া কালবর্ণে রঞ্জিত করিয়া জমিতে এক-খণ্ড বাঁশ পুঁতিয়া তাহাতে ঝুলাইয়া রাখে। কাক বা শৃগাল উহা দেখিয়া মানুষ মনে করিয়া পলাইয়া যায়।

বীজের জন্য সুঠাম, নীরোগ ও সুপক্ক শশা রাখিতে হইবে। প্রথমবারের ফলই বীজের জন্য রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। বীজ শশা পাকিয়া বেশ হরিদ্রাবর্ণ হইলে গাছ হইতে তুলিয়া আনা উচিত। পরে শশা কাটিয়া উহার ভিতর হইতে বীজ বাহির করিয়া বীজগুলি

জল দিয়া ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিতে হইবে। বীজগুলি কোন জলপাত্রে দিলে যেগুলি ভাসিয়া উঠে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ সে বীজে কোন কাজ হয় না। পরে বীজগুলি রৌদ্রে দিয়া ছাই মাখাইয়া শুকাইয়া লইয়া কোন বোতল বা শিশির মধ্যে বায়ুরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বীজগুলি রৌদ্রে দিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। বীজে ছাই মাখাইয়া রাখিলে উহাতে সহজে পোকা ধরে না।

শশার বীজ হইতে একপ্রকার কবিরাজী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাকে 'ত্রপুষ-তৈল' বলে। উহা কেশের উপকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক। আয়ুর্ব্বেদ মতে শশা—মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, বলনাশক ও মূত্রকারক এবং ভ্রম, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, ক্লান্তি, রক্তপিত্ত ও বমনরোগে উপকারক। পক্ক শশা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, বাত ও শ্লেষ্মানাশক। শশার বীজ—শীতল, রুক্ষ, মূত্রবর্দ্ধক, পিত্তরক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উপশমকারক।

পটল

বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সব্জীর মধ্যে পটল অন্যতম। যে সমস্ত প্রদেশে প্রতি বৎসর বন্যায় পলি পড়ে সেই সকল স্থানে পটল ভাল জন্মে। দোআঁশ, আঠাল এবং মিটেন জমিতেও পটল জন্মে কিন্তু সাধারণতঃ বেলে দোআঁশ জমিতে পটলের আবাদ উত্তম হইয়া থাকে। পটল চাষের জন্য উঁচু জমি নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন, কারণ যে জমিতে বর্ষাকালে জল বসে সে জমিতে উহা ভাল জন্মে না। জমি ঈষৎ ঢালু হইলে ভাল হয়, কারণ এরূপ জমিতে বর্ষায় জল দাঁড়াইতে পারে না। পার্ব্বত্য প্রদেশে পটল গাছ বাঁচে না। পলিমাটিতে অন্য কোন সারের বিশেষ আবশ্যক হয় না। আঠাল অথবা মিটেন জমিতে গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা, হাড়ের গুঁড়া, পাঁকমাটি ও কাঠের ছাই সার-রূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। বিঘা প্রতি ৩।৪ গাড়ী গোবর ও ১ মণ হাড়ের গুঁড়া সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে জমিতে তিন চারিবার লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি উত্তমরূপে চষিতে হইবে। জমি প্রস্তুত হইলে তিন হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে তিন

চারি হাত ব্যবধানে এক-একটী গর্ত্ত করিয়া মাদা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রতি মাদায় ভাল দেখিয়া ২।৩টী সরু পটল-মূল গোবর-জলে ডুবাইয়া লইয়া গ্রন্থি উপরে রাখিয়া বসাইতে হইবে। পুঁতিবার পর গর্ত্তে সামান্য খড় চাপা দিয়া দুই একদিন অন্তর তাহার উপর অল্প অল্প জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলে খড়ের গরমে এবং জল পাইয়া মূলের উপরিভাগ হইতে শীঘ্রই কচি কচি পাতা বাহির হইবে। অন্যভাবেও পটল রোপণ করিতে পারা যায়। ২ হাত লম্বা পটল লতার টুক্‌রা গোলভাবে ৩।৪ ফের দিয়া জড়াইয়া সোজা লাইনে ৪।৫ ফিট অন্তর ৪।৫ ফিট ব্যবধানে মাটি ঢাকা দিয়া রোপণ করিতে হয়। বেশী জমি হইলে ৫।৬ ফিট অন্তর জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে লতার গোছার মধ্য দিয়া মই চালাইয়া মাটি চাপা দিতে হয়। চারাগুলি আধ হাত আন্দাজ দীর্ঘ হইলে কোদালি দ্বারা সাবধানে জমি এক-বার ওলটপালট করিয়া লইয়া উভয়পার্শ্ব হইতে মাটি টানিয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাটি কোপাইবার সময় যেন গাছের গোড়ায় কোনরূপ আঘাত না লাগে। গাছের গোড়ায় যে পাড় বাঁধা হইবে তাহা প্রস্থে ১॥০ হাত ও উচ্চতায় আধ হাত হওয়া প্রয়োজন।

এরূপ করিলে পাড়ের মধ্যে যে নালা থাকিয়া যায় তাহাতে আবশ্যক মত জল সেচনের এবং জল নিষ্ক্রামণের সুবিধা হয়। গাছের গোড়া বাঁধিয়া দিবার সময় পাড়ের উপরে খড় বিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের ডগাগুলি খড় অবলম্বন করিয়া উহার উপর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ছায়াবিহীন আলোকবিশিষ্ট জমি পটল চাষের জন্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। নিড়ানী দ্বারা জমি পরিষ্কার রাখা বিশেষ আবশ্যক। বিঘা প্রতি ১০ সের পটল-মূল লাগে।

পটল চাষের একটু বিশেষত্ব এই যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় পটল-মূল আছে এবং উভয় প্রকার মূলেই গাছ হয়, ফুল ফোটে কিন্তু পুং জাতীয় মূলের গাছে ফল ধরে না। আবার পুং গাছ জমিতে না থাকিলে স্ত্রী পটলের ছানাগুলি শুকাইয়া বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়। এইজন্য জমিতে ২।৪টী পুং জাতীয় মূল লাগাইয়া বাকি স্থানে স্ত্রী জাতীয় লতার মূল রোপণ করা আবশ্যক। মোট কথা, জমিতে শত করা ১৫।২০টী পুং জাতীয় পটল-মূল লাগান প্রশস্ত।

স্ত্রী ও পুং মূল চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। এইজন্য উহা বিশ্বস্ত স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ২।৩ বৎসরের পুরাতন মোটা মূল পুঁতিলে গাছ ষাঁড়াইয়া যায় এবং সে

গাছে ভাল পটল ধরে না। সুতরাং এক বৎসরের লতার ছোট সরু মূল সংগ্রহ করিয়া জমিতে লাগান আবশ্যক।

অনেকে সস্তায় বাজার হইতে অল্প মূল্যে পুং জাতীয় লতার মূল কিনিয়া ফলতঃ নিজেরাই ঠকিয়া থাকেন। এরূপস্থলে সময় নষ্ট এবং অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সব দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইজন্য যাহাতে উৎকৃষ্ট এবং আসল স্ত্রী মূল পাওয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

ঠিক সময়ে চাষ করিতে পারিলে মাঘ ফাল্গুন মাসে গাছ হইতে নূতন পটল পাওয়া যাইতে পারে। জলদি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে ব্যবসায়ীরা চড়া দরে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে বেশ দু'পয়সা লাভ করিতে পারেন। ২৪-পরগণা, হাওড়া এবং হুগলীর স্থানে স্থানে, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে পটলের চাষ হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার পটল দেখিতে পাই। একপ্রকার ডোরাদার ও অন্য প্রকার ধূসরবর্ণের। ধূসরবর্ণ অপেক্ষা ডোরাদার পটলই উৎকৃষ্ট। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ধূসরবর্ণের পটলের অত্যধিক চাষ হয়।

একবার জমিতে পটলের চাষ করিতে পারিলে তিন

বৎসর সেই একই ক্ষেত হইতে ফসল পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম বৎসর ফসল হইয়া যাইবার পর মাটি কোপাইয়া আলগা করিয়া দিলেই চলিবে, নূতন করিয়া মূল রোপণের আবশ্যক হইবে না। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে মূল হইতে গাছ গজাইবার পূর্ব্বে কোদালি দ্বারা কোপাইয়া জমি হইতে মোটা মূলগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং জমিতে কিছু হাড়ের গুঁড়া অথবা গোবর ও ছাই মিশাইয়া সরু সরু মূলগুলি বাছিয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে লতাইয়া যাইবার পূর্ব্বে মাটি টানিয়া গোড়ায় পাড় বাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং পাড়ের উপরে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কিছু খড় বিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তৃতীয় এবং চতুর্থ বৎসরেও নূতন করিয়া মূল রোপণের আবশ্যক হয় না। জমিতে যে পুরাতন মূল থাকিবে তাহা হইতে সরু সরু মূলগুলি বাছিয়া বসাইলেই চলিবে। জমিতে আগাছা জন্মিতে না দেওয়া, গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা এবং জমিতে নিয়মিত ভাবে জল সেচন একান্ত আবশ্যক।

পটলের চাষ করিতে বিঘা প্রতি আনুমানিক খরচ হয় ৪০৲।৫০৲ টাকা। এক বিঘা জমিতে পটলের ফলন হয় ৩০/০ মণ। যখন নূতন পটল উঠে তখন প্রতি

সের ৷৷০ আনা হইতে ৷৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হয়। যদি ৵০ আনা সের হিসাবে ধরা যায় তাহা হইলে ৩০/০ মণ পটলে ১৫০৲ টাকা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বৎসরে লাভ বেশী পাওয়া যায়, কারণ দ্বিতীয় বৎসরে নূতন করিয়া মূল কিনিতে হয় না।

পটলের ডগা সমেত কচি কচি পাতা এবং পটল উভয়ই তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পটলের পাতাকে পল্‌তা কহে। ইহাও তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পটল—কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণ-বীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, জ্বর, দাহ, কুষ্ঠ, কাশ, ক্রিমি, রক্ত ও ত্রিদোষে উপকারক। পটলের পাতা বা পল্‌তা পিত্তনাশক। পটলের ডাঁটা—শ্লেষ্মানাশক এবং মূল বিরেচক।

পল্লীগ্রামে অনেক লোকের ধারণা আছে যে পটলের চাষ করিলে গৃহস্থের কোন-না-কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক ভ্রান্ত ধারণা। ইহাতে কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

—— ঃ*ঃ ——

বেগুণ

আকার, গঠন ও বর্ণভেদে বেগুণ নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—মুক্তকেশী, গৌরী কাজল, আউসে, মাকড়া, পাটনাই, সিঙ্গে, কুলি, দোঁকো ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতীয় বেগুণ বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আউসে বেগুণের বীজ চৈত্র বৈশাখ মাসে, পৌষালি বেগুণের বীজ ভাদ্র আশ্বিন এবং কুলি বেগুণের বীজ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বপন করিতে হয়।

জমির সন্নিকটে বা অন্য কোন স্থানে একটী চৌকা করিয়া তাহার মাটি কোপাইয়া ধূলির মত করিতে হইবে। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে ৮।১০ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। পরে চৌকাতে বীজ ছড়াইয়া তাহার উপর অতি পাতলাভাবে গুঁড়ামাটি চাপা দিয়া হস্তদ্বারা উক্ত মৃত্তিকা মৃদুভাবে সঞ্চালিত করিয়া দিতে হইবে অথবা কোন সমতল তক্তা দ্বারা মাটি অল্প চাপিয়া দিতে

হইবে। বীজগুলি উপরে দৃশ্যমান থাকিলে পিঁপড়ায় ও পাখীতে খাইয়া ফেলে এবং পোকায় নষ্ট করে। এইজন্য বীজ ছড়াইয়া তাহার উপর পাতলা করিয়া সামান্য গুঁড়ামাটি চাপা দেওয়া আবশ্যক।

বেগুণের জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া তাহাতে গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা, ছাই, পাঁকমাটি প্রভৃতি মিশাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। চারাগুলি ৬।৭ ইঞ্চি আন্দাজ বড় হইলে চৌকা হইতে উঠাইয়া জমিতে আড়াই হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ২॥০ হাত ব্যবধানে এক-একটী সবল ও সতেজ চারা রোপণ করা যাইতে পারে। জমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিবার পূর্ব্বে চারাগুলি ১০।১৫ দিনের জন্য হাপোরে লাগাইতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে চারাগুলি বেশ ঝাড়াল ও সতেজ হইয়া উঠে। জমিতে বসাইবার পূর্ব্বে এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া রাখিয়া উপযুক্ত সময়ে জমিতে চারা রোপণ বিধেয়। চারাগুলি মাটিতে বেশ বসিয়া গেলে দুই পাশ হইতে মাটি টানিয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছের মধ্যে মধ্যে জুলি বা নালা থাকিয়া যায়, তাহাতে জল সেচনের ও জল নিকাশের সুবিধা হয়।

অনেকে গাছগুলিকে সোজা রাখিবার জন্য ও লাইন ঠিক রাখিবার জন্য ডাল সরাইয়া বা ঠেকা দিয়া থাকেন। এরূপ করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে গাছের ফলন কমিয়া যাইতে দেখা যায়।

সারবান জমিতে উৎপন্ন বেগুণ অধিক আস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। পুরাতন গৃহের পোড়ামাটি অথবা পুরাতন রাবিস বেগুণগাছের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বেগুণের জমিতে বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ গোবর সার, ১৫ সের সালফেট্ অফ এমোনিয়া ও ২০ সের হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে উত্তম ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি জমিতে ৪।৫ সের গুঁড়া চূণ (slaked lime) ও ৬।৭ মণ ছাই ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার অথবা অন্য কোন সার প্রয়োগ করিবার প্রায় তুই মাস পূর্ব্বে জমিতে চূণ প্রয়োগ করা উচিত। সালফেট্ অফ এমোনিয়া ও হাড়ের গুঁড়া এক মাস পূর্ব্বে ব্যবহার করা যাইতে পারে ও গোবর সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করা চলে। মধ্যে মধ্যে জমিতে সেচ দেওয়া, গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা এবং গোড়ার মাটি নিড়াইয়া আলগা করিয়া দেওয়া ও কিছু কিছু খইল খাওয়ান বিশেষ আবশ্যক। প্রথম বৎসরের ফলন শেষ হইলে গাছের

গোড়ায় পাঁকমাটি প্রয়োগ পূর্ব্বক উহার ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে পারিলে দ্বিতীয় বৎসরেও কিছু কিছু নূতন ফলন পাওয়া যায়। নূতন গাছের ফল অপেক্ষা পুরাতন গাছের ফল নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া বেগুণের চাষ করা উচিত। শীতকালের বেগুণ যেমন সুস্বাদু, কোমল ও বড় হয় অন্য সময়ের বেগুণ তদ্রূপ হয় না। বিঘা প্রতি ৪।৫ তোলা বীজ লাগে।

একই জমিতে প্রতি বৎসর বেগুণ লাগাইলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয়। একই জমিতে যদি প্রতি বৎসর বেগুণ গাছ লাগাইবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে উত্তমরূপে সার প্রয়োগ প্রয়োজন। অধিক সারবান জমিতে বেগুণের চাষ দিলে গাছগুলি খুব তেজাল হয় কিন্তু সেই অণুপাতে ফলন হয় না। বেগুণের আকৃতি বড় এবং ফলন অধিক করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সুপক্ক ও সতেজ বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা এবং চারা বাহির হইলে দুর্ব্বল চারাগুলি বাদ দিয়া উৎকৃষ্ট সতেজ চারাগুলির মূল-শিকড় কাটিয়া দিয়া জমিতে লাগান আবশ্যক। গাছের শাখা-প্রশাখা বাহির হইলে অধিক সংখ্যক দুর্ব্বল ডাল না রাখিয়া কয়েকটী সতেজ ও সরল ডাল রাখিয়া

বাকীগুলি কাটিয়া দেওয়া উচিত। গাছগুলি অধিক লম্বা না করিয়া ঝাড়বিশিষ্ট করিবার আবশ্যক হইলে গাছগুলি জমিতে বসিয়া যাইবার পর শাখা-প্রশাখা ছাড়িতে আরম্ভ করিলে ডগাগুলি কাটিয়া দিতে হয়। ফল অধিক বড় করিলে ফলন বেশী পাওয়া যায় না। চাষীদের পক্ষে অধিক বড় ফল অপেক্ষা অধিক ফলন বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য যাহাতে গাছের ফলন অধিক হয় সেই বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ বড় ফল পাইতে হইলে অধিক ফলনের আশা বৃথা।

অনেকে সখ করিয়া অথবা প্রদর্শনীতে দিবার অভিপ্রায়ে বড় ফল জন্মাইতে ইচ্ছা করেন। বীজের বেগুণ বড়, সুপক্ক ও রোগশূন্য হওয়া প্রয়োজন। যে গাছের বেগুণ বীজের জন্য রাখিতে হইবে বা বড় করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই গাছ হইতে বেগুণ সংগ্রহ করা মোটেই উচিত নয়। এইজন্য ক্ষেত্র মধ্যে ২।৪টী সবল ও সতেজ গাছ ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে নির্ব্বাচন করিয়া রাখিতে হইবে। বড় ফল পাইতে হইলে অধিক সংখ্যক ডাল জন্মাইতে দেওয়া উচিত নয়। একটী গাছে কয়েকটী মাত্র বাছাই করা ডাল রাখিয়া বাকীগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। গাছে ফুল ধরিলে মধ্যমাকার

সতেজ ডালের ৮।১০টী ফুল রাখিয়া বাকিগুলি বিনষ্ট করিতে হয়। পরে ফল ধরিলে একটী গাছে ২টী অথবা ৩টী সুপুষ্ট ফল রাখিয়া বাকিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। যাহাতে গাছে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উপরের বা নীচের দিকের বীজ বাদ দিয়া বেগুণের মাঝের বীজ লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বেগুণের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মুক্তকেশী, কুলী, মাকড়া, সিঙ্গে প্রভৃতি জাতির চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। আজকাল বিদেশ হইতে নিউইয়র্ক ইমপ্রুভ্‌ড, ব্লাকবিউটী, লংপার্পল, লং হোয়াইট প্রভৃতি জাতীয় বীজ আনাইয়া এদেশে চাষ করা হইতেছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল, সিঙ্গাপুর, আণ্ডামান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে ভারতীয় প্রণালীতে বেগুণের চাষ হইয়া থাকে।

বেগুণ গাছে মাঝে মাঝে কীট-পতঙ্গের ভয়ানক উপদ্রব দেখা যায়। একপ্রকার পিঁপড়া ও ছোট ছোট পতঙ্গ বেগুণের চারা গাছের ডালগুলি কাটিয়া দেয়। একপ্রকার পোকা গাছের অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট করিয়া ফেলে। কোন স্থানে পোকা দেখা যাইতেছে না, অথচ গাছের একটী ডাল নিস্তেজ হইয়া পড়িল, এরূপস্থলে

বুঝিতে হইবে সেই ডালটীর মধ্যে যে-কোন ভাবে পোকা প্রবেশ করিয়াছে। তখনই সেই ডালটী গোড়া হইতে কাটিয়া দিতে হইবে। বেগুণ গাছের পাতার পশ্চাদভাগে একপ্রকার পতঙ্গ বাসা বাঁধিয়া বাস করে। পাতার আকৃতি দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোন পোকা দ্বারা উহা আক্রান্ত হইয়াছে। যে পাতার নিম্নভাগে ঐ পোকা থাকে সেই পাতাটি ক্রমশঃ কোঁকড়াইয়া যাইতে থাকে। এইরূপ কোঁকড়ান পাতার ভাঁজ খুলিলে শুঁয়াপোকার ন্যায় একপ্রকার পোকা দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় পতঙ্গ সমেত পাতাটি আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া উহা মারিয়া ফেলিতে হইবে।

প্রজাপতির ন্যায় একপ্রকার পতঙ্গ বেগুণের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। কিছুদিন পরে ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট কীড়াগুলি বেগুণের গায়ে ফুকর করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। কীড়াগুলি বেগুণের ভিতরে শাঁসগুলি কুরিয়া খাইয়া বড় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাপতির আকার ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে ও ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই উহারা ক্ষেত্রময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ পোকাধরা বেগুণ ও গাছের ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া ভিতরের পোকাগুলি বাহির করিয়া

মারিয়া কিংবা পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। অনেকে কীটাক্রান্ত বেগুণ অথবা পোকাধরা শুষ্ক ডালগুলি ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে কিংবা জমির এক পাশে ফেলিয়া রাখেন। এরূপভাবে ফেলিয়া রাখিলে পোকাগুলি বাঁচিয়া থাকে এবং ক্ষেত্রস্থিত সমস্ত গাছে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। পোকাগুলিকে সংবশে মারিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

বেগুণ গাছ সময়ে সময়ে ফুলা রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা ক্ষেত্রস্থিত একটী গাছে ধরিলে অন্যান্য গাছও রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং কোন গাছে এই রোগ জন্মিতে দেখিলে তাহা পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। বেগুণ গাছে আর একটী সংক্রামক রোগ জন্মিতে দেখা যায়। ইহাকে ধসা ধরা বলে। একপ্রকার উদ্ভিদাণুই এই রোগের উৎপত্তির কারণ। সাধারণতঃ জলবসা ও সেঁতসেঁতে জমির গাছ এই রোগাক্রান্ত হয়। যাহাতে গাছের গোড়ায় জল বসিতে না পায় তাহার সুবন্দোবস্ত করা এবং রোদপিটে জমিতে ইহার স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। গাছ এই রোগাক্রান্ত হইলে যাহাতে ক্ষেত্রস্থিত অন্যান্য গাছে সংক্রামিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং যে গাছে এই রোগ জন্মে তাহা পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

কাঠের অথবা ঘুঁটের ছাইএর সহিত কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া উহা মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া পাতায় উপর ছড়াইয়া দিলে পোকার উপদ্রব নিবারণ হয়। প্রাতঃকালে গাছে ছাই প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত। কেরোসিন মিশ্রিত জল ও সাবান জল একত্র মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা গাছে ছিটাইতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। তীব্র হুঁকার জল, হলুদগোলা জল, গন্ধকের গুঁড়া ইত্যাদি ছিটাইলে সময় সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—গুরুপাক, রুচিকর, বল ও পুষ্টিকর এবং বায়ুরোগে অনিষ্টকারক। বার্ত্তাকুফল নিদ্রাজনক, প্রীতিকর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কাশ রোগের বিকৃতি-কারক। দীর্ঘাকার বার্ত্তাকু—কফকারক এবং শ্বাস, কাশ ও অরুচিবর্দ্ধক। মতান্তরে অগ্নিজনক, বায়ুনাশক, শুক্র ও শোণিতবর্দ্ধক এবং হৃদ্শ্বাস, কাস ও অরুচির উপশম-কারক। কচি বেগুণ কফ ও বায়ুনাশক; পাকা বেগুণ ক্ষারযুক্ত ও পিত্তবর্দ্ধক। যে বেগুণ বারমাস ফলে তাহা ত্রিদোশনাশক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক। পোড়া বেগুণ সারক, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু ও মেদো ধাতের পক্ষে উপকারক।

বেগুণ চাষ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে তাহা এই—

"বলে গেছে বরাহের পো
দশটি মাসেই বেগুণ রো।
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ
ই'তে নাই কোন বিবাদ।
মাটি শুকালে দিবে জল,
বার মাসে পাবে ফল।"

টমেটো বা বিলাতী বেগুণ

ইহা একপ্রকার বেগুণ জাতীয় সব্জী। এদেশীয় ফসল নহে বলিয়া ইহার এতদ্দেশীয় কোন বাংলা নাম নাই। ইহা টমেটো বা বিলাতী বেগুণ নামেই এদেশে পরিচিত। দক্ষিণ আমেরিকা টমেটোর আদি জন্মস্থান। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহা য়ুরোপে আনীত হয়। ইহাকে ফল অথবা সব্জী যে কোন ভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদগণ টমেটোকে 'Solanaceæ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। টেঁপারি, বেগুণ, লঙ্কা

প্রভৃতি গাছ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা একপ্রকার বন্যজ ফল। চাষের গুণে উৎকর্ষতা হেতু ফলের বন্য-গন্ধ দূরীভূত হইলেও ইহার পাতার গন্ধবন্ধ এখনও দূরীভূত হয় নাই। এদেশীয় ফল নহে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় বা কোন ভৈষজ গ্রন্থে ইহার গুণাগুণ দৃষ্ট হয় না। আমেরিকা ও য়ুরোপের বহু বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতানুসারে ইহা ভিটামিন্-প্রধান পুষ্টিকর, কোষ্ঠশুদ্ধিকর এবং সহজপাচ্য খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। এইজন্য ঐ সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দেশে টমেটো চাষের বিশেষ প্রচলন আছে এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের ন্যায় ইহারও বিশেষ আদর আছে।

বাংলার মৃত্তিকা ও আবহাওয়া ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দোআঁশ মৃত্তিকায় ইহা ভাল জন্মে। এদেশে শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। সময়ে প্রথম ভাগে বীজ বপন করিলে জলদি এবং শেষ ভাগে বপন করিলে নাবী ফসল হইয়া থাকে। ভাটীতে অথবা প্রশস্ত টব বা গামলার মধ্যে ইহার বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লওয়া সঙ্গত। বেগুণের ন্যায় একই ভাবে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি প্রায় ২৷৷ তোলা

বীজ আবশ্যক হয়। বীজ বপন করিবার পর বর্ষা নামিলে উপরে হোগলার আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক নতুবা অঙ্কুরিত বীজগুলি বা ক্ষুদ্র চারাগুলি নষ্ট হইয়া যায়। চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চি আন্দাজ দীর্ঘ হইলে স্থায়ীভাবে জমিতে ১॥ হাত অন্তর ব্যবধানে রোপণ করিতে পারা যায়।

ইহার জমিতে পূর্ব্ব হইতেই চাষ দিয়া রাখা আবশ্যক। সেঁতসেঁতে জলবসা জমিতে গাছ ভাল জন্মে না। সুফল পাইতে হইলে ছায়াবিহীন উন্মুক্ত জমি নির্ব্বাচন করা যুক্তিসঙ্গত। নীরস জমিতে টমেটো গাছ ভালরূপ জন্মে না এবং ইহার ফলনও কম হয়। সুতরাং মাটি সরস রাখিবার জন্য জমিতে শ্রেণীবদ্ধ রোপিত চারাগাছের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা কাটিয়া দিয়া উহাতে জল সেচনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চারাগুলি বেশ বসিয়া গেলে উহাদের গোড়ার মাটি নিড়াইয়া আলগা করিয়া দিতে হয়। জমিতে আগাছা জন্মিতে না দেওয়া এবং নিয়মিত ভাবে জল-সেচন ব্যতীত ইহার আর অন্য কোন পাট নাই। প্রথম জল সেচনের পরবর্ত্তী জল-সেচন সময় মধ্যে যেন মাটি শুষ্ক না হয়। এই প্রকার জল সেচন করিলে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বাড়ন্ত

ফলগুলির খোসা ফাটাফাটা হয় না বা একেবারে ফাটিয়া যায় না।

ইহার চাষে গরু, ঘোড়া ও ভেড়ার মলমূত্র সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। টমেটো পটাস-প্রধান ফল এবং ইহার চাষে পটাস সার বিশেষ আবশ্যক। বিঘা প্রতি প্রায় অর্দ্ধ মণ সুপারফস্ফেট এবং ২৫।৩০ সের নাইট্রেট অফ পটাস জমি প্রস্তুত করিবার সময় মাটির সহিত মিশাইয়া লইতে হয়। কাঠের ছাই, কচুরিপানা-পোড়া ভস্ম প্রভৃতি পটাস সাররূপে ব্যবহার করা চলে। প্রথমে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করা অনুচিত, কারণ প্রথম মুখে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করিলে গাছের পাতা বেশী ও লম্বা লম্বা পাব হওয়ায় ফুলের ছড়ি পড়ে কম কাজেই ফলও কম হয়। জলের সহিত তরল গোময়সার বা এমোনিয়ম্ সলফেট তরল সাররূপে ব্যবহার করা ভাল, তাহাতে খরচ উঠিয়া আসে।

টমেটো গাছ অর্দ্ধলতানে। গাছগুলি নিজে খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, এজন্য প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কোন শক্ত কঞ্চি অথবা সরু বাঁশ পুঁতিয়া গাছের ডালের সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়। এরূপ কোন অবলম্বন না দিলে গাছগুলি যথেষ্ট আলোক, রৌদ্র ও বাতাস না

পাইয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া ডালপালা বিস্তৃত করিয়া মাটির উপরেই বিশৃঙ্খলভাবে বক্র হইয়া ও আংশিক শায়িত ভাবে থাকে। এইজন্য উহাতে ফলন কম হয় এবং সুপুষ্ট ও বড় ভাল ফল পাওয়া যায় না। প্রতি গাছের সহিত কাঠি না পুঁতিয়া জমির প্রস্থভাগের শ্রেণীবদ্ধ গাছ লম্বা তারের সহিত বাঁধিয়া মধ্যে মধ্যে খুঁটী পুতিয়া তাহাতে ঐ তার আটকাইয়া দিতে পারা যায় এবং তারের সহিত গাছের কাণ্ড, পাটের দড়ি অথবা কলাগাছের আঁশ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া চলে। প্রতি লাইনে দুইটী করিয়া লম্বা তার লাগাইয়া গাছের গোড়ার কাণ্ডে বা মাথায় বাঁধিয়া দিতে হয়। এইভাবে অবলম্বন করিয়া দিলে আলোক ও রৌদ্র পাইয়া গাছগুলি অবাধে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং এই ভাবে সজ্জিত থাকায় দেখিতে অতি মনোরম হয়। বিশেষত যখন গাছে ফল পাকে তখন অতি চিত্তাকর্ষক হয়।

গাছগুলি ঝাড়াল হইবার জন্য উহার অগ্রভাগ ছাঁটিয়া দিতে হয়। টমেটো গাছের নিম্নদিকে বহু অনাবশ্যক ডালপালা জন্মে। উহাতে ভাল ফল হয় না, সুতরাং গাছের সংগ্রহীত খাদ্যের অনেকাংশ ঐ সমস্ত শাখা-প্রশাখা বৃথা গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। এই সমস্ত ডাল ছাঁটিয়া

দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না বরং গাছ অধিক ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। গাছের প্রধান কাণ্ডস্থিত ২।৪টী সতেজ সুস্থ ডাল রাখিয়া অবশিষ্টগুলি কাটিয়া দিতে পারা যায়। গাছগুলি ইহাতে সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া শীঘ্র ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

আকৃতি, গঠন ও বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে টমেটোর বহুপ্রকার ভেদ আছে। কোন কোন জাতির বর্ণ ঘোর লাল, কোনটী ফিকে লাল, কোনটী হরিদ্রাভ এবং কোনটী বা সোনালি বর্ণবিশিষ্ট। কাঁচা অবস্থায় টমেটোর বর্ণ সবুজ থাকে কিন্তু পাকিলে জাতিগত বর্ণ ও গুণ প্রাপ্ত হয়। জাতিভেদে কোন কোনটীর ফল ক্ষুদ্র এবং কোনটী বা ওজনে /।০ সের /৵০ পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহা ইউরোপীয়দের অতি প্রিয়। পক্কাবস্থায় ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। এইজন্য ইউরোপীয়েরা ইহাকে লাভ্ এপেল (Love Apple) বলিয়া থাকে। উপকারিতার জন্য এদেশে আজকাল ইহার আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহা ভাইটামিন-প্রধান সব্জী। বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে ইহাতে নিম্নলিখিত হারে উপাদান বা সার পদার্থ আছে : Protein (প্রোটিন) ৮০ ভাগ ছানাজাতীয়, Fat ৪৯ ভাগ মাখন জাতীয়, Carbohydrates ৩৬ ভাগ

শর্করা বা শালি জাতীয়, Salt ৪ ভাগ লবণ জাতীয়, Water ৯৪·৭৩ ভাগ জল। ইহার রস তৃষ্ণা নিবারণের একটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পানীয়। ইহাতে তিনটী বিশেষ অম্লশক্তি আছে—Uralic Acid যাহা আপেলে আছে, Citric Acid যাহা পাতিলেবু, চূণ ও কমলালেবুতে বর্ত্তমান এবং Phosphoric Acid। টমেটো হইতে এক-প্রকার আচার ও মুখরোচক চাটনি প্রস্তুত হয়। রন্ধন অপেক্ষা কাঁচা অবস্থায় ভাইটামিনের গুণ অধিক পাওয়া যায়।

বিঘা প্রতি টমেটোর ফলন প্রায় ৪০।৫০ মণ। সার দিয়া যত্ন পূর্ব্বক চাষ করিলে ৬০।৭০ মণ ফলন হয়। এদেশে টমেটো /০ আনা হইতে ।০ আনা সের দরে বিক্রয় হয়। এক আনা হিসাবে ধরিলে ৪০ মণের মূল্য ১০০৲ টাকা হয়। ইহার চাষে বিশেষ খরচা নাই, বিঘা প্রতি খুব বেশী ২৫৲ টাকা খরচা হইতে পারে। সুতরাং খরচ বাদে ইহার চাষে বিঘা প্রতি প্রায় ৭৫৲ টাকা লাভ থাকে। দেরীতে ফলন হইলে লাভ খুব কম হয়।

টমেটোর কতকগুলি বিভিন্ন জাতি আছে, যথা—ম্যাচলেশ, গোল্ডন কুইন, গোডেন ট্রাফি, একমি, জুনপিঙ্ক, মিকাডো, মনার্ক, পারফেকসান, পণ্ডরোসা ইত্যাদি।

বেগুণ লঙ্কা প্রভৃতি গাছের ন্যায় টমেটো গাছ

পোকাধরা, ধসাধরা, ছাতাধরা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যাহাতে ক্ষেত্রস্থিত সমস্ত গাছে রোগের বিস্তার ঘটিতে না পারে সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে সংক্রামক রোগের ব্যাধি বিনষ্ট করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফল হয় না। রোগ বিশেষে গাছের পাতা, ডাঁটা এবং ফল আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগগ্রস্ত গাছের বীজ বপনে সেই গাছও ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইজন্য খারাপ বীজ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। তামাকের জল, তুঁতের জল ও কেরোসিন মিশ্রিত জল ব্যবহারে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শাক-সব্জীর মধ্যে টমেটোই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আহার্য্য। প্রত্যহ ইহা আহার করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। রক্তহীনতা ও স্থূলরোগে ইহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা যে কেবল ভিটামিন-প্রধান এবং দেহ-পরিষ্কারক তাহা নহে। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ধাতব পদার্থও বিদ্যমান।

অজীর্ণতায়, চক্ষুরোগে, বাতে, কোষ্ঠবদ্ধতায়, রক্ত-দোষে, চর্ম্মরোগে এবং অন্যান্য অনেক শারীরিক অসুস্থতায় ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

লঙ্কা

লঙ্কা ঠিক সব্জী নয়—ইহা মশলার মধ্যে পরিগণিত। পরিমাণ মত লঙ্কা না দিলে কোন ব্যঞ্জনই সুস্বাদু হয় না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। দোআঁশ মৃত্তিকায় লঙ্কা ভালরূপ জন্মে। লঙ্কা চাষের জন্য উঁচু জমি নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। বর্ষাকালে যে জমিতে বৃষ্টির জল জমে এবং উহা বাহির হইয়া যাইতে পারে না এরূপ জলবসা জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে না। উচ্চ প্রদেশে চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন এবং আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে চারা রোপণ করা যাইতে পারে কিন্তু নিম্ন প্রদেশে কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে চারা রোপণ করা হয়। সাধারণ জমিতে ফাল্গুন মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত লঙ্কার বীজ বপন করা চলে। আমেরিকান লঙ্কা বর্ষার শেষভাগে এদেশে লাগান উচিত, কারণ ইহারা অধিক বর্ষা সহ্য করিতে পারে না।

প্রতি বৎসর জমিতে লঙ্কার চাষ দিলে উহা অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রতি বৎসর একই জমিতে লঙ্কার

চাষ দেওয়া উচিত নহে। যদি ইহা চাষ দেওয়া হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রে অন্য কোনরূপ ফসল ফলাইয়া লইতে হইবে এবং জমিতে পূর্ব্ব হইতে অধিক পরিমাণে সার দিয়া রাখিতে হইবে।

জমিতে লাঙ্গল ও মই দিয়া উত্তমরূপ কর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র সমতল করিতে হইবে। অল্প জমি হইলে কোদালি দ্বারা গভীর ভাবে কোপাইয়া মাটি সমান করিতে হইবে। পরে জমিতে দুই হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ১॥০ হাত অন্তর ব্যবধানে এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোময়, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

জমিতে লাঙ্গল ও মই দিবার পূর্ব্বে হাপোরে বা তলায় ছিদ্রযুক্ত কোন বড় গামলার মধ্যে লঙ্কার বীজ বুনিতে হইবে। চারাগুলি ৫।৬টী পত্রবিশিষ্ট হইলে উহাদিগকে নাড়িয়া সবল চারাগুলি পূর্ব্ব কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রতি মাদায় এক-একটী করিয়া স্থায়ী ভাবে রোপণ করিতে হইবে। জমিতে বসাইবার সময় মূল শিকড় কাটিয়া জমিতে লাগাইলে গাছ তেজাল এবং ঝাড়াল হইয়া থাকে। যতদিন না উহার শিকড় মাটিতে বসিয়া যায় ততদিন রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চারাগুলির উপর

কলাপাতা, কলার পেটো বা কচুপাতা চাপা দেওয়া আবশ্যক। গাছ বসিয়া গেলে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। এই সময় গাছের পাশ হইতে মাটি টানিয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

লঙ্কা গাছে মাঝে মাঝে তরল সার প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিবার সময় যে চুণ বালির সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়, সেই চূণ ৩।৪ সের, সের দুই আন্দাজ বীট লবণ, ৮।১০ সের খইল, পরিমাণ মত গোময় জলের সহিত গুলিয়া সেই জল জমিতে ছড়াইতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। উপরে যে পরিমাণ দেওয়া হইল উহা এক বিঘা জমির জন্য জানিতে হইবে। উক্ত জল জমিতে ছিটাইবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন গাছের পাতায় ঐ জল না লাগে।

আকার ও গুণ ভেদে লঙ্কা নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—পাটনাই, ধানি, সূর্য্যমণি, জয়পুরী, কামরাঙ্গা ইত্যাদি। অন্যান্য লঙ্কা যেমন গাছের নিম্নদিকে ঝুলিয়া থাকে, ধানি ও সূর্য্যমণি বা সূর্য্যমুখী লঙ্কা সেরূপ ভাবে থাকে না, উহারা গাছের উর্দ্ধভাগে মুখ করিয়া থাকে। ধানি ও সূর্য্যমণি লঙ্কা অপরিমিত ফলে। ধানি

লঙ্কার আকার অতি ক্ষুদ্র ; ধানের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ধানি লঙ্কা প্রায় বার মাস ফলে। এইজন্য অনেক গৃহস্থবাটীতে আবশ্যক অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কা ব্যবহারের জন্য ২।১টী ধানি লঙ্কার গাছ পুঁতিয়া থাকেন। অধিক পরিমাণে উহার চাষ করিতে বড় একটা দেখা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা অত্যধিক পরিমাণে কাঁচা লঙ্কা আহার করিয়া থাকেন।

আজকাল এদেশে আমেরিকা হইতে আনীত নানা জাতীয় লঙ্কার চাষ হইতেছে। উহাদের মধ্যে চাইনিজ জায়েণ্ট, রুবিকং, ইয়লো জায়েণ্ট, হাতিশুঁড় ও সুইট স্প্যানিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকান লঙ্কায় সেরূপ ঝাল নাই। ইহা আকারে বেশ বড় হইয়া থাকে। এই লঙ্কা চাট্‌নিতে ব্যবহৃত হয়। পটলের ন্যায় ইহা ভাজাও খাওয়া চলে। চাইনিজ জায়েণ্ট নামক লঙ্কা এক-একটী আয়তনে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে চারি ইঞ্চি চওড়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার লঙ্কা তরকারীতে ঝালের জন্য দেওয়া হয় না ; সুগন্ধ ও আস্বাদনের জন্য দেওয়া হয়। এই লঙ্কা দেখিতে যেমন বড় তেমনি চিত্তা-কর্ষক। আমেরিকান লঙ্কার চাষ আজকাল সৌখিন উদ্যানকগণের মধ্যে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই লঙ্কা সখ

করিয়া টবেও বেশ জন্মান চলে। এই লঙ্কাকে ইংরাজীতে Mango Pepper Capsicum বলে।

লঙ্কা গাছে পাকিয়া লাল হইয়া গেলে তুলিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। বিঘা প্রতি ৩।৪ তোলা বীজ লাগে। প্রতি বিঘায় ২৫।২৬ মণ কাঁচা লঙ্কা বা ৫।৬ মণ শুক্‌না লঙ্কা পাওয়া যায়। রীতিমত চাষ করিতে পারিলে খরচ-খরচা বাদ বিঘা প্রতি ৪০৲।৫০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—তীব্র কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, তীব্র, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাতপিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক এবং সকল রোগেই অনিষ্টকারক।

ঢেঁড়শ

ইহা এদেশীয় সব্জী নহে। ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। অনেকের মতে ইহা আফ্রিকা হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ইহার আদি জন্ম-স্থান না হইলেও ইহা একপ্রকার দেশী সব্জীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও চলে।

পাশ্চাত্ত্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ ঢেঁড়শকে Hibiscus Esculentus L. Malvaceæ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। জবা, স্থলপদ্ম, মেস্তাপাট, লতাকস্তুরী, হোলিহক প্রভৃতি গাছ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আজকাল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর ঢেঁড়শের চাষ হইয়া থাকে। ইহার ফলের মধ্যে আঠার ন্যায় এক প্রকার পিচ্ছিল বা হড়্‌হড়ে পদার্থ থাকায় অনেকের ইহা তত প্রিয় নয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সজী হিসাবেই ঢেঁড়শের চাষ হইয়া থাকে কিন্তু ঢেঁড়শ গাছের ত্বক্ হইতেও যে একপ্রকার পাট * প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অনেকের অবিদিত।

ঢেঁড়শের বিভিন্ন জাতি আছে। এক জাতীয় ঢেঁড়শের গাত্রের উপরিভাগ মসৃণ আবার কতকগুলির গায়ে শিরা আছে। কতকগুলি ঢেঁড়শ খর্ব্বাকৃতি, কতকগুলি বা লম্বাকৃতি, কতকগুলির রং সবুজ, কতকগুলি বা শুভ্র-বর্ণের হইয়া থাকে।

স্থান বিশেষে ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। ইহার জমি উত্তমরূপে

---

* গ্রন্থকার প্রণীত 'চাষীর ফসল' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

কোপাইয়া দুই হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে দেড় হাত ব্যবধানে এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া উহাতে গোময় সার প্রয়োগ করিতে হইবে এবং প্রতি মাদায় ৩।৪টী করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। চারাগুলি বাহির হইলে প্রতি মাদায় একটীমাত্র সবল ও সতেজ চারা রাখিয়া বাকীগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং মাটি দিয়া গাছের গোড়া উঁচু করিয়া দিতে হইবে। আবশ্যক মত গাছে জল সেচন করা ও গাছের গোড়া নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য কোন পাট নাই। বিঘা প্রতি ./॥০ সের বীজ আবশ্যক হয়।

ঢেঁরশ অনেকের প্রিয় না হইলেও উহা একেবারে অখাদ্য নহে। ঢেঁড়শ কচি অবস্থায় খাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। পক্ব অবস্থায় উহাতে ছিবড়া জন্মে। সেইজন্য তখন উহা খাদ্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহাও ভিটামিন-প্রধান খাদ্য। ঢেঁড়শ হইতে একপ্রকার চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা ও পিত্তনাশক গুণ থাকায় ইহা গ্রীষ্মদেশ-বাসীর পক্ষে উপকারক। ঢেঁড়শের পক্ব বীজ কাফির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে। ঢেঁড়শের পিচ্ছিলবৎ আঠা চিনির সহিত পাক করিয়া একপ্রকার লজেঞ্জুস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ঢেঁড়শ—শীতল, রুচিকর, মলভেদক, মূত্রকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অশ্মরীনাশক এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার উপশমকারক। ইহা রক্তনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রমেহ-রোগে হিতকর।

মেস্তা

চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ইহার বীজ ক্ষেতে ছিটাইয়া বপন করিতে পারা যায়। অনেকে বীজতলায় চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া জমিতে ৪ ফিট অন্তর চারা রোপণ করিয়া থাকেন। ইহার ফুলের গোড়ায় লাল রংয়ের আবরণ পত্র থাকে। ইহা হইতে সুন্দর জেলী ও চাট্‌নি প্রস্তুত হয়। ইহার জমিতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দিয়া জমি আলগা করা ও জল সেচন করা আবশ্যক। বিঘা প্রতি /১ সের বীজ লাগে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সীম দেশী

সীমের বহু বিভিন্ন জাতি আছে ও ইহার গাছ অধিক দূর বিস্তীর্ণ হইয়া লতাইয়া যায়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। সীমের বীজাবরণ অতি কঠিন। এইজন্য ১০।১২ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া বপন করিলে উহা হইতে শীঘ্র শীঘ্র চারা বহির্গত হয়। মৃত্তিকার অবস্থা অনুসারে ৮।১০ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

সীম প্রায় সকল মাটিতেই জন্মিয়া থাকে। দেশী সীম দোআঁশ, বেলে অথবা আঠাল মাটিতে জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু বিদেশী সীমের পক্ষে দোআঁশ জমিই উপযুক্ত। নাইট্রোজেন ঘটিত সারই সীমের পক্ষে উপকারী। এদেশে কোন সব্জী চাষে সার দেওয়া প্রথা বড় একটা দেখা যায় না। জমি হইতে ক্রমাগত ফসল উৎপন্ন করায় এবং মাটিতে খাদ্য প্রয়োগ না করায় জমি ক্রমশঃ নিঃস্ব ও অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। জমিতে রীতিমত চাষ করিতে হইলে পুরাতন গোবর সার, গোয়ালের আবর্জ্জনা

প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। জমিতে ৫।৬ ফিট অন্তর সারি দিয়া প্রতি লাইনে দুই হাত আড়াই হাত অন্তর ব্যবধানে এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী হিসাবে সুপুষ্ট বীজ বপন করিতে পারা যায়। গাছগুলি এক হাত বা দেড় হাত উচ্চ হইলে পালায় বা মাচায় উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিঘা প্রতি প্রায় /১॥০ সের বীজ লাগে। সীমগাছের ডগাগুলি কাটিয়া দিলে গাছ খুব ঝাড়বিশিষ্ট হয় এবং অধিক ফলবান হয়।

বর্ষাকালে ইহা দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, বর্ষার শেষভাগে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে ও বর্ষা থামিয়া গেলে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। সীম কচি অবস্থায় সুস্বাদু। কোন কোন স্থলে সীমের বীজ হইতে ডাইল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হয়। সীমের অনেক বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি সুখাদ্য এবং কতকগুলি বন্যগন্ধযুক্ত। সীম এবং উহার গাছ গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিঘা প্রতি /৪ সের বীজ বপন করিলে প্রায় ২০।২২ মণ গো-খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সীম বহু বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, তন্মধ্যে আলতাপাটি, সবুজ, সাদা, মটুরে,

কামরাঙ্গা, উদ্দা, তোহার, গোয়া, গুড়দাল, ঘৃতকাঞ্চন, হাতিকান, বাঘনখী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সীম মাখন

ইহা দেশী সীমের অন্তর্গত। অন্যান্য সীম অপেক্ষা ইহা আকারে বড়। মাখন সীমের লতা দীর্ঘপ্রসারী। কোন দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছের নিম্নে ইহার বীজ পুঁতিয়া দিলে সেই গাছ অবলম্বন করিয়া ইহা বর্দ্ধিত হয় এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল প্রদান করে। জমিতে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত্ত খুঁড়িয়া ১ ফুট ব্যবধানে ও এক শ্রেণীতে পাঁচ ফিট অন্তর ইহার বীজ লাগান যাইতে পারে। এই সীম এক হাত লম্বা এবং ৪।৫ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। ফল ছোট বা কচি অবস্থায় কোমল থাকে তখন উহা তরকারীতে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু উহা সুপুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে আহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে এবং ইহাতে বন্যগন্ধ অনুভূত হয়। অন্য জাতীয় সীমের পক্ক বীজ ডাইল হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহার বীজ অন্য কোন ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বীজের বর্ণ দুই প্রকার—সাদা ও গোলাপী। এই সীমের গাছ পশুখাদ্য হিসাবে জন্মান

চলে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয় এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার ফলন হয়।

সীম ফরাসী

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের পূর্ব্বে এবং শীতপ্রধান দেশে বসন্তকালে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। বাংলায় ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। খর্ব্বাকার ফরাসী সীমের দেশী বীজ বাংলায় বর্ষাতেও জন্মায়। লতানে গাছ বাংলায় বর্ষা বেশ ভাল ভাবে সহ্য করে কিন্তু উহার বীজগুলি এই দেশীয় হওয়া চাই।

দোআঁশ বা পলি মাটি ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। রোদপিটে জায়গা অপেক্ষা ছায়াযুক্ত স্থানে ইহা ভাল জন্মে। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক উহাতে পুরাতন গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা, ছাই প্রভৃতি সার মিশাইতে হইবে। প্রস্তুত জমিতে দুই ফুট অন্তর লাইন দিয়া দেড় ফুট ব্যবধানে এক-একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রতি মাদায় ২।৩টী করিয়া বীজ বপন করিতে

পারা যায়। চারা জন্মিলে সবল চারাগুলি জমিতে রাখিয়া বাকীগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ফরাসী সীমের কতকগুলি লতানিয়া এবং কতকগুলি ঝোপবিশিষ্ট হয়। গাছ একটু বড় হইলে লতানে গাছগুলি পালায় অথবা মাচায় উঠাইয়া দিতে হইবে। ইহা অতিরিক্ত বৰ্দ্ধিত হইলে ফল হয় না; সেইজন্য উহার মাথাটী ছাঁটিয়া দিতে হয়। জমিতে পটাস সারের অভাব হইলে গাছে ফল ধরে না। বিঘা প্রতি /৫ সের বীজ লাগে। কলিকাতার বাজারে ফরাসী সীমের যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং ইহার বীজ ও ডাইল স্বতন্ত্র ভাবে বিক্রয় হয়। ফরাসী সীমের নান বিভিন্ন জাতি আছে। তন্মধ্যে রাণার বীণ, ব্রড বীণ, বাটার এবং লাইমা বীণ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের আবার নানা উপজাতি আছে, যথা—ফ্রেঞ্চ কিডনি, কেণ্ঠুকি ওয়াণ্ডার, ক্যানেডিয়ান ওয়াণ্ডার, ব্ল্যাকওয়াক্স, গোল্ডনওয়াক্স, ষ্ট্রীংলেশ ইত্যাদি।

ব্রড বীণ (বাকলা সীম)

এই জাতীয় সীমের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে ঠিক জানা না থাকিলেও ইহা পারস্যদেশ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ব্রড বীণের সাধারণতঃ দুইটী প্রধান জাতি দৃষ্ট হয়, যথা—লংপড ও

উইণ্ডসর। লংপড সাধারণতঃ ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং এক খোলোয় একত্রে ৫।৬টী জন্মে। ইউণ্ডসর ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং দুই তিনটি সীম একত্রে ফলে। এই উইণ্ডসর ও লংপডের বহু উপজাতি আছে। জমিতে পাশাপাশি চাষ করিলে উহাদের বিভিন্নতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। এদেশে উইণ্ডসর বা লংপড কোন জাতি হইতেই ভাল ফলন পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতে এবং পার্ব্বত্য জমিতে ইহারা ভাল জন্মে।

হালকা দোআঁশ জমিতে ইহার চাষ করিতে পারা যায়। শুকনা গোবর ও গোয়ালের আবর্জ্জনা জমিতে প্রয়োগ করিয়া ৭।৮ ইঞ্চি গভীর ভাবে ইহার জমি কর্ষণ করিতে হয়। মাটি ভালরূপ চূর্ণিত হইলে মই দিয়া উহা সমতল করিয়া লইতে হয়। পরে জমিতে দেড় হাত অন্তর লাইন দিয়া দেড় হাত ব্যবধানে তিন ইঞ্চি গভীর করিয়া এক-একটী মাদা করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে উহা ৫।৬ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া লইলে উহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। গাছগুলি দুই হাত আন্দাজ লম্বা হইলে ফুল হইতে দেখা যায়। যদি ফুলের দোষে ফল না ধরিয়া ঝরিয়া পড়ে তাহা হইলে ফুলের মাথা অল্প ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয় ও ফুলের

পুং দণ্ডীটিকে লম্বালম্বি মাথা চাপিয়া দিলে ফল হইতে দেখা যায়। ফুল আসিবার পূর্ব্বে গাছের ডগাগুলি কাটিয়া দিলে উহারা বেশ ঝাড়বিশিষ্ট হয়। সাধারণতঃ আড়াই মাস হইতে গাছের ফলন পাওয়া যায়। সমতল জমিতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে এবং পার্ব্বত্য জমিতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করিতে হয়।

সীম রাণার

দক্ষিণ আমেরিকা ইহার অদি জন্মস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ফরাসী সীমের ন্যায় একই সময়ে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। এই জাতীয় গাছ লতানিয়া স্বভাবাপন্ন। এইজন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে লাইন দিয়া বীজ বপন করিতে হয় এবং গাছগুলি বড় হইলে বিলাতী মটরের ন্যায় অবলম্বনের জন্য কঞ্চি বা কঠি পুঁতিয়া দিতে হয়। পার্ব্বত্য জমিতে ইহা অল্পায়াসে জন্মে এবং ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত স্থানে ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করা চলে। রাণার, ফ্রেঞ্চ বা ব্রড বীণ গাছের বীজ জন্মাইবার ইচ্ছা বা আবশ্যক না থাকিলে ফল পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তুলিয়া ফেলিতে হয়। গাছে পরিপুষ্ট হইতে দিলে ফলন কম হয়। বীজ বপনের পর প্রায় দুই মাসের মধ্যে গাছের ফলন আরম্ভ হয়।

লাইমা বীণ

ইহা কোন কোন স্থানে বাটার বীণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাংলা দেশে যে-কোন স্থানে অতি অল্পায়াসেই ইহা জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু ইহা বিলম্বে ফলে। সীমকে ইংরাজীতে বীণ বলা হয়।

সাধারণতঃ অন্যান্য সীম ফুরাইয়া গেলে লাইমা বীণ আমদানী হইয়া থাকে। ইহা খুব লম্বা ও চওড়া বড় জাতীয় সীম। উপরকার ছাল বা খোসা ফেলিয়া দিয়া তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। দোআঁশ মাটিতে এবং অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে ইহা ভাল হয়। ইহার ফল খুব বড় সুস্বাদু এবং যথেষ্ট ফলন হয়। গাছ উচ্চ এবং ডালপালা-বিশিষ্ট হয়।

বিলাতি সর্ব্বপ্রকার সীমই দোআঁশ ও আঠাল মাটিতে চাষ করিতে পারা যায়। কচি অবস্থায় ইহাই তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। সীমের বীজ বা গাছ গাভীদিগকে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা জাতীয় সীম আছে উহাদের চাষের প্রণালী প্রায় একই প্রকার। হিন্দুশাস্ত্র মতে একাদশী তিথিতে সীম ভক্ষণ নিষেধ। আয়ুর্ব্বেদ মতে

সীম মধুর-কষায়-রস, পাকে অম্ল রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, সারক, বিদাহী, শুক্রনাশক, বাতাদি দোষজনক, দৃষ্টিশক্তির হানিকারক, মূত্ররেচক, বায়ুর বৃদ্ধিকারক এবং কফ, শোথ এবং বিষদোষে উপকারক।

বরবটী

ইহা মটর ও সীমের ন্যায় শুঁটী জাতীয় সব্জী। চৈত্র হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ইহার বীজ ক্ষেতে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়।

ইহা লতানিয়া উদ্ভিদ্। চারাগুলি একটু বড় হইলে কঞ্চি অথবা পালা দিয়া রক্ষা করিতে হয়। বরবটী গাছ অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আড়াই মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরে। এক বিঘা জমিতে তিন সের সাড়ে তিন সের বীজ ছড়াইলে ১৪।১৫ মণ বরবটী কলাই অথবা ৪।৫ মণ ডাইল উৎপন্ন হইতে পারে। বরবটীর শুঁটী সব্জী অপেক্ষা ডাইল হিসাবে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সব্জীর জন্য ব্যবহার করিতে হইলে কচি অবস্থাতেই

বরবটী উত্তোলন করা আবশ্যক। শুঁটীগুলি যখন গাছে পাকিয়া যায় সে সময়ে লতাগুলি সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া ডাইলের জন্য দানাগুলি ঝাড়িয়া বাহির করা হইয়া থাকে।

বরবটী গাছ বায়ু হইতেও নাইট্রোজেন নামক পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্ষার পূর্ব্বে ইহার বীজ ছড়াইয়া চারাগুলি ১ হাত ১৷৷ হাত আন্দাজ দীর্ঘ হইলে জমিতে গাছগুলি সমেত লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া রাখিলে তথায় অন্য সব্জীর চাষ করিতে পারা যায়।

জাতিবিশেষে বরবটী সাদা, কাল, লাল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের দৃষ্ট হয়। জমিকে সারবান করিতে হইলে কিংবা পশুখাদ্যের জন্য ইহার চাষ করিতে হইলে অল্প মূল্যের বীজ বপন করাই যুক্তিসঙ্গত। বরবটী গাছ ও বীজ গবাদি পশুর বিশেষ উপকারী খাদ্য। পশুখাদ্য অথবা সবুজ সারের জন্য চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৫।৬ সের বীজ লাগে। ঘন ভাবে চারা প্রস্তুত না করিলে ডাঁটা শক্ত হইয়া যায় এবং গরুকে খাওয়াইবার বা জমিতে লাঙ্গল দিবার অসুবিধা হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, সারক, রুক্ষ, রুচিকর, বলকারক, স্তন্যবর্দ্ধক ও বায়ুজনক এবং কফ,

শুক্র ও অম্লপিত্তের বৃদ্ধিকারক। ছোট অপেক্ষা বড়গুলি অধিক গুণবিশিষ্ট। বর্ণভেদে ইহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই।

মটর

মটর লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। মটরের জলদি, মাধ্যমিক এবং নাবী জাতি আছে। আকৃতি ভেদে ছোট বড় এবং সাদা, লাল, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের মটর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ফলন পাইতে হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক জলদি, মাধ্যমিক ও নাবী জাতীয় বীজের চাষ করা উচিত। এইভাবে বপন করিলে একটীর ফলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটীর ফলন পাওয়া যায়।

ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা হইয়া থাকে। পলি অথবা এঁটেল মৃত্তিকায়ও ইহার চাষ করা যাইতে পারে। হালকা দোআঁশ জমি মটরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাটিতে যথেষ্ট রস থাকিতে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ পূর্ব্বক বিঘা প্রতি ৭।৮ মণ গোবর, ১০ সের হাড়ের গুঁড়া ও ৩।৪ মণ ছাই প্রয়োগ করিলে উত্তম ফলন হইয়া থাকে। দেশী বা কাবুলী

মটর বীজ ৮।১০ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া বিঘা প্রতি ১৪।১৫ সের বীজ ছড়াইতে হইবে। তার পর দুইবার লাঙ্গল দিয়া উত্তম রূপে মই দ্বারা বীজগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বিলাতী বা আমেরিকান মটর বীজ বপন করিতে হইলে জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিবার পর দুই হাত অন্তর ব্যবধানে ২।৩ ইঞ্চি গভীর ও এক হাত চওড়া জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং জুলির মধ্যে অর্দ্ধহাত অন্তর খুবী কাটিয়া প্রত্যেক খুবীতে ৩।৪টী করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। ইহাতে বিঘা প্রতি ১০।১১ সের বীজ লাগে। বীজ হইতে চারা বাহির হইতে ৭।৮ দিন সময় লাগে। প্রতি খুবির পাশে জুলির উপরে পাঠ কাঠি, ধঞ্চে কাঠি অথবা কঞ্চি সম্মুখভাগে হেলাইয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি ঐ কঞ্চি অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বামন বা খর্ব্ব জাতীয় গাছে কঞ্চি দিবার আবশ্যক করে না। জমিতে আগাছা জন্মিলে তুলিয়া ফেলা ও আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল-সেচন প্রয়োজন। গাছগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের অভাব হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দেশী মটরের মধ্যে পাটনাই, ওলন্দা ও দার্জ্জিলিং

বিখ্যাত। ওলন্দা মটরের শুঁটী খোসা সমেত সীমের ন্যায় খাওয়া যাইতে পারে। দেশী মটর সাধারণতঃ জমিতে ছিটাইয়া বপন করা হয়। ইহাতে বীজ অনেক বেশী লাগে। দেশী বীজের মধ্যে ওলন্দার শুঁটী অপেক্ষাকৃত বড়। সাধারণতঃ পৌষ মাস হইতে গাছে শুঁটী ধরিতে আরম্ভ হয়। ফুল ধরিবার সময় গাছের ডগাগুলি কাটিয়া লইলে শুঁটীগুলি একটু বড় হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যে ফসল পাকিয়া উঠে। অর্দ্ধ-পরিপুষ্ট শুঁটী সব্জী হিসাবে এদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মটরগাছের ডগা সমেত কচি কচি পাতা এদেশে শাক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিলাতী মটর অপেক্ষাকৃত নরম বলিয়া ইহা কাঁচা অবস্থায় সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পক্ক অবস্থায় মটর শুকাইয়া যাঁতায় বা কলে ভাঙ্গিয়া ডাইল হিসাবে ব্যবহৃত করা হইয়া থাকে। এটেল অপেক্ষা দোআঁশ জমিতে উৎপন্ন মটর অপেক্ষাকৃত নরম ও সুমিষ্ট হয়। এঁটেল জমিতে যে দেশী মটর ছিটাইয়া বপন করা হয় তাহাই ডাইল হিসাবে অধিক ব্যবহৃত হয়।

আজকাল এদেশে বহু বিভিন্ন জাতীয় বিলাতী মটরের চাষ করা হইয়া থাকে। ইহাদের গঠন ও আস্বাদ অতি চমৎকার। ইহাদের মধ্যে আশু

জাতিগুলি ৫০ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে, মাধ্যমিক জাতি ৭৫ দিনে এবং নাবী জাতির ৯০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়।

জাতি	ফলন	গাছের উচ্চতা
আমেরিকান ওয়াণ্ডার	জলদি	১ ফুট
এক্সেলসার	,,	২ ফিট
গ্রেডাস্	,,	৪ ফিট
পাইলট	,,	৪ ফিট
পাইওনিয়ার	,,	২ ফিট
বাউন্টিফুল	,,	৩॥০ ফিট
হার্বিঞ্জার	,,	১ ফুট
লিটিল মার্ভেল	,,	২ ফিট
এবানডান্স	মাধ্যমিক	২॥০ ফিট
টেলিগ্রাফ	,,	৪॥০ ফিট
ডিউক অফ আলবানী	,,	৫ ফিট

জাতি	ফলন	গাছের উচ্চতা
আপ-টু-ডেট্	মাধ্যমিক	৫॥০ ফিট
প্রিন্স অফ ওয়েলস	”	৩ ফিট
ফিল বাস্কেট	”	৩ ফিট
ষ্ট্রাটাজেম	”	২॥০ ফিট
চ্যাম্পিয়ন অফ ইংলণ্ড	”	৫ ফিট
গ্লাডষ্টোন	নাবী	৩॥০ ফিট
কন্টিনিউটি	”	৩॥০ ফিট
টেলিফোন	”	৪॥০ ফিট

আয়ুর্ব্বেদ মতে মটর শাক—তিক্ত, কষায়-রস, পাকে মধুর, গুরুপাক, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফপিত্তনাশক।

মটর—কষায়-মধুর-রস, মধুর বিপাক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক, আমদোষজনক, কফ ও পিত্তনাশক এবং দাহ-নিবারক।

মটর ডাইলের জুস—লঘুপাক, শীতবীর্য্য, মলরেচক, রুচিজনক, রক্তদোষ, পিত্তবিকৃতি ও কফরোগে উপকারক।

[illegible] অধ্যায়

গ্লোব আর্টিচোক

চলতি ভাষায় ইহাকে হাতিচোক বলে। আর্টিচোক দুই প্রকার, গ্লোব ও জেরুজিলাম। গ্লোব আর্টিচোকের বীজ বুনিয়া জমিতে চাষ করিতে হয় এবং জেরুজিলাম আর্টিচোকের মূল রোপণ করিয়া চাষ করিতে হয়। জেরুজিলাম আর্টিচোকের কথা মূলজ সব্জী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

ইহার বীজ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বপন করিতে হয়। গামলা বা হাপোরে চারা জন্মাইয়া চারাগুলি একটু বড় হইলেই জমিতে নাড়িয়া বসাইতে হয়। আড়াই হাত অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে দুই হাত ব্যবধানে এক-একটী চারা রোপণ করিতে পারা যায়। বিঘা প্রতি ৭।৮ তোলা বীজ লাগে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১২।১৪ দিন সময় লাগে। ৪।৫ মাসে গাছে ফুল আসে। হালকা দোআঁশ মাটিতে উহা উত্তম জন্মে। বিঘা প্রতি তিন মণ

সোরা, ৭।৮ মণ গোবর সার ও গোয়ালের আবর্জ্জনা ব্যবহার করিতে পারা যায়। গ্লোব আর্টিচোকের মধ্যে অবার বিভিন্ন জাতি আছে। তন্মধ্যে গ্রীণ গ্লোব ও পার্পল গ্লোবই উৎকৃষ্ট।

এসপ্যারাগ্যাস্

ইহা 'শতমূল' জাতীয় একপ্রকার বিদেশী সব্জী। ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান ইংলণ্ড। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়।

হাল্‌কা দোআঁশ জমিতে খইল ও গোবর সার প্রয়োগ করিয়া তাহা উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হইবে। অন্য কোন স্থানে প্রথমে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া জমিতে লাগাইতে পারা যায়। জমি প্রস্তুত হইলে ২॥ ফিট অন্তর লাইন দিয়া প্রতি লাইনে ১॥ ফিট ব্যবধানে ইহার চারা লাগান যাইতে পারে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিক দিন সময় লাগে বলিয়া হতাশ হওয়া উচিত নয়। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহা ১০।১২ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া বপন করা আবশ্যক।

এসপ্যারাগাসের ডাঁটাই সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাঁটা একবার কাটিয়া লইলে গাছের গোড়া হইতে পুনরায় নূতন ডাল বাহির হয়। এইরূপে তিন চারিবার উহার ডাঁটা আবশ্যক মত কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রথমবার মূল কাণ্ডের দুই অঙ্গুলি আন্দাজ উর্দ্ধ হইতে ডাঁটা কাটিয়া লইয়া গাছের গোড়া নিড়ানী দ্বারা আলগা করিয়া দিতে হইবে এবং খইলের তরল সার ও লবণ-জল প্রয়োগ করিয়া গাছের কাণ্ড মাটি দিয়া চাপা দিতে হইবে। প্রত্যেকবার ডাঁটা কাটিয়া লইবার পর তরল সার প্রয়োগ করা ও গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছ ১৫।১৬ বৎসর জীবিত থাকে। তৃতীয় বৎসর হইতে উহার ডাঁটা কাটিয়া আবশ্যক মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ২।৩ তোলা বীজ লাগে।

এনডিভ্ বা কাশনি

ইহা একপ্রকার শাক জাতীয় সব্জী। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিলে মাঘ ফাল্গুন মাসে উহা আহারের উপযোগী হইয়া থাকে।

দোআঁশ মাটিতেই ইহা ভাল জন্মে। জমি উত্তমরূপে পাট করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ ঘনভাবে না ছড়াইয়া পাতলাভাবে ছড়ান আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৩।৪ তোলা বীজ লাগে। ছালাদের ন্যায় ইহার পাতা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। গাছ বড় হইলে পাতাগুলি জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয় কিংবা টব দ্বারা ঢাকিয়া রৌদ্র-প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। খাদ্যোপযোগী হইবার ১০।১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে এইরূপ করিতে হয়। জল-সেচনের সময় দেখিতে হইবে যাহাতে জল মাঝের পাতার মধ্যে না প্রবেশ করে। জল ঢুকিলে গাছ পচিয়া যায়।

রাই বা মাষ্টার্ড

ইহা একপ্রকার শাক জাতীয় সব্জী। ইহার শাক ছালাদের ন্যায় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ হইতেও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়া হইতে

একপ্রকার ঝাঁঝাল মসলা প্রস্তুত হয়। এই মসলা টিনে প্যাক হইয়া বিদেশ হইতে প্রচুর আমদানী হয়। এদেশে চেষ্টা করিলে ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জমি উত্তমরূপে চষিয়া ইহার বীজ ক্ষেতে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ দীর্ঘ হইলে ডগা সমেত কচি পাতা কাটিয়া লওয়া হয় এবং উহাই সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহার বীজ বপন করা চলে। বিঘা প্রতি /১॥০ সের বীজ লাগে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—কটুরস, তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক ও রক্তপিত্তকারক এবং কণ্ডু, কৃমি ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক। ইহার তৈল—কটুরস, শীতল, তীক্ষ্ণ; কেশের পক্ষে উপকারক, ত্বক্‌দোষনিবারক, বাতাদি ত্রিদোষনাশক এবং পুরুষত্বের হানিকর।

ইহার শাক—মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত ও কফনাশক এবং কৃমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

পার্শ্লেী

সার্ডিনিয়া ইহার জন্মস্থান। এদেশে ইহা নূতন ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। পাতার জন্য ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ খাদ্য সুগন্ধ করিতে ও ডিস্ সাজাইতে ইহার পাতার গুঁড়া প্রয়োজন হয়। পাতা শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখা হয় ও প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই ইহার চাষ চলে কিন্তু সার-যুক্ত আঠাল দোআঁশ মাটিতে গাছের আবছায়াযুক্ত স্থানে ইহা খুব ভাল জন্মায়। এক ফুট অন্তর সারি করিয়া বীজ ছড়াইয়া বপন করিলেও হয়। গাছ বাহির হইলে তুলিয়া পাতলা করিয়া ৬।৭ ইঞ্চি অন্তর ফাঁক করিয়া দিতে হয়। উত্তোলিত চারা অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করিলেও বেশ পাতা জন্মায়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২।৩ সপ্তাহ সময় লাগে। সেইজন্য কোনও জলদি মূলা বীজের সহিত মিশাইয়া বপন করা চলে। এইরূপে মূলা ফসলও পাওয়া যায় ও জমিতে পাট করিতে সুবিধা হয়, কারণ মূলা গাছ দেখিয়া জানা যায় কোথায় উক্ত বীজ ফেলা হইয়াছে।

চিকরী

ইউরোপ ও এসিয়ার কোন কোন অংশ ইহার জন্মস্থান। ইহা চিরস্থায়ী গাছ। স্মরণাতীত কাল হইতে ইউরোপে বন্যাবস্থায় জন্মায় ও লোকে শাক ও ঔষধরূপে ব্যবহার করে। মূল শুষ্ক ও ঝলসাইয়া গুঁড়া করিয়া কোকোর সহিত মিশ্রিত করা হয়। যে-কোন বাগানের সারযুক্ত মাটিতে ও কর্ষিত জমিতে ইহার চাষ করা চলে। এক ফুট অন্তর করিয়া ৪।৫ ইঞ্চি অন্তর চারা রাখিতে হয়। সব্জী হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে ১৫ ইঞ্চি দূরে দূরে গাছ করিয়া একটু বড় হইলে খালি টব গাছের উপর উপুড় করিয়া ১।।০ সপ্তাহ রাখিলে ইহা ছালাদরূপে ব্যবহার করা যায়। বপন সময় শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক।

কার্ড্বুন

চিরস্থায়ী সব্জী গাছ। দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা ইহার জন্মস্থান। ইহা দেখিতে অনেক অংশে গ্লোব আর্টিচোকের ন্যায়। গ্লোব আর্টিচোকের ফুল কলি

খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কার্ডুনের পত্রবৃন্ত বেশ মোটা ও রসাল হয় এবং তাহাই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আর্টিচোক অপেক্ষা ইহার গাছ আকারে বড় ও বীজ হইতেই গাছ জন্মায়। ভাটীতে চারা প্রস্তুত করিয়া একটু বড় হইলে স্থায়ীভাবে জমিতে রোপণ করিতে হয়। মাটিতে ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ১৫ ইঞ্চি গভীর জুলী কাটিয়া ১৮ ইঞ্চি দূরে দূরে গাছ লাগাইতে হয়। প্রত্যেক জুলী ৪ ফিট ব্যবধান হইলে ভাল হয়। গাছ বড় হইলে গোড়ায় মাটি দিতে হয় ও সিলেরীর ন্যায় পাট করিতে হয়। গাছগুলি দড়ি দিয়া সিলেরী ও চিনা কপির ন্যায় বাঁধিয়া দিতে হয়।

ক্রেস বা হালিম

ইহা একপ্রকার বিদেশী শাক। সারযুক্ত হালকা দোআঁশ ও অল্প ছায়াযুক্ত জমিতে ইহার চাষ করা চলে। জমিতে গোবর ও খইলের সার প্রয়োগ করিয়া উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। ইহার জমিতে মধ্যে মধ্যে জল-সেচন করা

আবশ্যক। অল্পদিনেই এই শাক আহারোপযোগী হয়। সেইজন্য প্রতি ১০।১২ দিন অন্তর বীজ ফেলিলে প্রায় সমস্ত বৎসরই এই শাক জন্মান চলে। কিন্তু শীতের সময় ইহা ভাল ও সুস্বাদু হয়।

চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ দীর্ঘ হইলে ডগা সমেত কচি পাতা তরকারীতে ব্যবহার করা চলে। বীজ বপনের পর ১৫।১৬ দিনের মধ্যে শাক আহারের উপযোগী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। অনেকে ইহার কচি পাতা কুচি কুচি করিয়া তরকারীতে মাখাইয়া অথবা 'স্যালাড' হিসাবে ব্যবহার করেন। ইহা সাহেবদের প্রিয় খাদ্য। বিঘা প্রতি ৪।৫ তোলা বীজ লাগে। চেষ্টা করিলে ইহা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায়।

জল ক্রেস্‌ :—ইহা ইউরোপের একটি চিরস্থায়ী জলজ শাক। ইহা স্রোতযুক্ত নদী-নালার কূলে জন্মিয়া থাকে। চেষ্টা করিলে খাল, বিল ও পুকুরপাড়ে জন্মান যায়। ইহাতে বেশ ঝাঁঝযুক্ত সুন্দর গন্ধ থাকায় ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী বলিয়া অন্যান্য দেশের লোকে ইহা প্রচুর ব্যবহার করে। যেখানে স্রোতজল পাওয়া সম্ভব নহে সেখানে নালা কটিয়া তাহার ধারে রোপণ

করিলে ও মধ্যে মধ্যে জল ঢালিয়া স্রোত বহাইয়া দিলে শাক জন্মায়। মোটের উপর জমি ভিজাইয়া রাখা প্রয়োজন কিন্তু বদ্ধ-জলাশয়ে বাঁচে না বলিয়া জল ঢালিয়া স্রোত বহাইয়া দিতে হয়।

জলে থাকে বলিয়া ইহাকে 'ওয়াটার ক্রেস্' বলা হয়। বীজ বপন কিংবা চারার খণ্ড রোপণ করিয়া ইহার গাছ উৎপাদন করিতে পারা যায়। স্রোতহীন জলে ইহা ভাল হয় না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে উহার বীজ বপন করিতে হয়।

যেখানে জল ঢালিয়া স্রোত বহানও সম্ভব নয়, সেরূপ স্থানে, চারার খণ্ড সকল কাঠ কয়লার মধ্যে টবে করিয়া জন্মান যায়। সপ্তাহে দুই দিন জল পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক। পাতা একটু ছোট হইলেও গাছের বৃদ্ধি মন্দ হয় না। সাধারণ দোআঁশ মাটি ১/৩ ভাগ, মোটা বালি ১/৩ ভাগ, পচাপাতা সার ১/৩ ভাগ মিশ্রিত করিয়া বড় পাত্রে রাখিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয় ও পাত্রটি জলপূর্ণ গামলায় রাখিয়া ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। সপ্তাহে দুই দিন জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। এই কয় প্রকার প্রথাতে স্রোতহীন জলেও জল ক্রেস্ শাক জন্মান যায়।

আমেরিকান ক্রেস্ বা উচ্চ ভূমির ক্রেস্ নামে অন্য এক জাতীয় ক্রেস্ আছে। ইহাও বিদেশী। ইহার সমস্ত গুণাদি প্রায়ই জল ক্রেসের সমকক্ষ কিন্তু ইহার জন্য জলাশয় প্রয়োজন হয় না। ইহার চাষ খুব সোজা। শীতের প্রারম্ভে সাধারণ ক্রেসের ন্যায় বীজ বপন করিতে হয়। যাঁহাদের জলাশয়ের সুবিধা নাই তাঁহারা এই জাতীয় ক্রেসের চাষ করিয়া জল ক্রেসের স্বাদ পাইতে পারেন।

সিলেরী

ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান ইংলণ্ড ও উত্তর-পশ্চিম হিমালয়। শ্রাবণের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। ইহার বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেইজন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত ভাটী বা মাটিপূর্ণ গামলায় বীজ বপন করিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয়।

ইহার জমি পূর্ব্ব হইতেই উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে কর্ষিত জমিতে এক হাত অন্তর লাইন দিয়া ৮।৯ ইঞ্চি ব্যবধানে যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে জমিতে

জল-সেচন করিতে হইবে। গাছগুলি এক ফুট আন্দাজ দীর্ঘ হইলে উহার ডালপালা কাটিয়া দিতে হইবে এবং কলার বাসনা, শুপারী গাছের বাকলা, বা ঐরূপ কোন দ্রব্য দ্বারা সিলেরীর ডাঁটা জড়াইয়া বাঁধিয়া উহার আগাগোড়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ডাঁটাগুলি ঢাকিয়া না দিলে উহা বিবর্ণ ও শক্ত হইয়া যায় এবং খাইতে বিস্বাদ লাগে। ইহার ডাঁটাই আহার্য্য।

বীজ হইতে উহার চারা জন্মিতে ১৫।২০ দিন সময় লাগে। এমন কি আবহাওয়া প্রতিকূল হইলে ৬।৮ সপ্তাহও দেরী হয়, সুতরাং বীজ হইতে চারা বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষভাবে যত্ন লইতে হইবে। ফুলকপির ন্যায় ইহাকে দুইবার নাড়িয়া তৃতীয়বারে প্রস্তুত স্থায়ী জমিতে লাগাইতে হয়। সিলেরীর জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৩।৪ তোলা বীজ লাগে এবং ৬।৭ মাসে উহা আহারের উপযোগী হইয়া থাকে। সিলেরী সব্জী হিসাবে এবং পাতা মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিলেরীয়াক্

ইহাও একপ্রকার সিলেরী জাতীয় সব্জী। চাষের দ্বারা ইহার মূল বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। মূলগুলি প্রায় হাতের মুঠার মত হয়। পাতার ডাঁটাগুলি ফাঁপা ও মধ্যমাকার। ভারতে ইহা প্রায় অজানা সব্জী। শীতের সময় ঠাণ্ডা ও রসপান্তা মাটিতে ইহা জন্মায়। ইহা স্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। বীটের ন্যায় ইহাকে রান্না করিয়া খাইতে হয় ও অন্যান্য তরকারীতে মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার চাষ সিলেরীর ন্যায়।

বিবিধ শাক

নটে শাক

নটে শাক নানা জাতীয় আছে; তন্মধ্যে চাঁপানটে, পদ্মনটে, পুনকা ও কনকানটে প্রধান। সর্ব্বপ্রকার নটে বীজ চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলে।

চেষ্টা করিলে বারমাসই ইহার চাষ চলিতে পারে তবে ঋতু বিশেষে আস্বাদের তারতম্য হয়।

ইহার জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া গোবর, গোয়ালের আবর্জ্জনা, পুষ্করিণীর পাঁকমাটি ও খইলচূর্ণ মাটির সহিত মিশাইতে হইবে। নটেশাকের বীজ অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং যাহাতে উহা ক্ষেতে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে তজ্জন্য বীজের সহিত সামান্য ঝুরা হালকা মাটি অথবা বালি মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বীজ ছড়াইবার পর জমির মাটি হাত দিয়া মৃদুভাবে ঈষৎ সঞ্চালন করিয়া দিতে হইবে যেন বীজ উপরে জাগিয়া না থাকে। বীজ হইতে চারা বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত ডাল সমেত নারিকেল পাতা বা ঐরূপ কোন দ্রব্য দ্বারা জমি আবৃত করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। মাটি সরস থাকিলে চারা শীঘ্রই বহির্গত হয়। জমি হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা ও ৫।৬ দিন অন্তর জমিতে নিয়মিত ভাবে জল-সেচন ভিন্ন ইহার আর অন্য কোন পাট নাই।

চাঁপানটে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া জল দিতে পারিলে উহা খুব শীঘ্রই আহারের উপযোগী হইয়া উঠে। যতবার কচি পাতা সমেত গাছের ডগা কাটিয়া লওয়া হইবে ততই অসংখ্য ফেঁকড়ী বাহির হইয়া গাছ ঝাড়াল হইয়া উঠিবে।

অন্যান্য নটে বীজ অপেক্ষা চাঁপানটের বীজ একটু পাতলা ভাবে ছিটান আবশ্যক। এদেশে সাধারণতঃ দুই জাতীয় চাঁপানটে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতীয় সাদা অন্য জাতীয় লাল।

কনকানটে বীজ গ্রীষ্মকালে এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পুনরায় বপন করা যাইতে পারে। এই সময়ের শাক অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। বিঘা প্রতি ✓৷৹ সের বীজ লাগে।

লাল শাক

ইহা নটে শাক জাতীয় সব্জী। নটে শাকের ন্যায় একইভাবে ও একই সময়ে জমি প্রস্তুত করিয়া বীজ হইতে ইহার চারা উৎপাদন করিতে হয়।

ইহা অতি কোমল, মুখরোচক ও সুস্বাদু শাক। লাল শাক সাধারণতঃ ভাজা খাওয়া হইয়া থাকে। এই শাক হইতে একপ্রকার লাল রং বাহির হয় এবং আহারের সময় আহারীয় দ্রব্যে ও হস্তে উহা লাগিয়া যায়। সেইজন্য ছোট ছোট মেয়েরা লাল শাকের বিশেষ পক্ষপাতী।

কাটোয়া ও ডেঙ্গোর ডাঁটা

ইহা নটে জাতীয় সব্জী বিশেষ। অন্যান্য নটে অপেক্ষা কাটোয়া ও ডেঙ্গোর ডাঁটা অধিক মোটা হইয়া থাকে

এবং গাছও অধিক লম্বা হয়। উহাদের পাতা অপেক্ষা শাঁসযুক্ত ডাঁটাই অধিক বাঞ্ছনীয়। কাটোয়ার ডাঁটা ও ডেঙ্গোর ডাঁটা ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ডাঁটার ভিতরে যে কোমল শাঁসাল পদার্থ থাকে উহা মিষ্ট-আস্বাদনযুক্ত এবং অতি মুখরোচক।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের বীজ বপন করিতে হয়। ইহার জমি নটে শাকের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হইবে। দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। বিঘা প্রতি /॥০ সের বীজ লাগে। ডেঙ্গো অপেক্ষা কাটোয়ার ডাঁটা উৎকৃষ্ট।

পালম শাক

ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা চলে। দোআঁশ জমিতে পালম শাক ভাল জন্মে। ইহার মাটি সারাল ও আলগা হওয়া আবশ্যক; এইজন্য জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে গোবর ও ছাই মিশ্রিত করা উচিত।

পালম শাকের বীজ প্রায় দুই দিন জলে ভিজাইয়া জমিতে বপন করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র চারা উৎপন্ন হয়। জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ইহার বীজ জমিতে

ছিটাইয়া বপন করা উচিত। বীজ বপনের সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়মিত ভাবে জল-সেচন আবশ্যক।

এদেশে লাল এবং সবুজ উভয় রঙ্গের পালম শাক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতীয় পালম ঝাড়বিশিষ্ট হয় এবং অন্য জাতীয় শিশনাযুক্ত হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশ হইতে সাদা, হল্‌দে, গোলাপী প্রভৃতি নানা রংয়ের পালম শাক আমদানি করিয়া চাষ করা হইতেছে। কপি ক্ষেতে চাষ করিলে পালম শাক বেশ ঝাড়াল ও সুস্বাদু হয়। বিঘা প্রতি /১ সের বীজ লাগে।

অন্যান্য শাক অপেক্ষা পালম শাক স্বভাবতঃ কোমল এবং রসাল। রীতিমত জল-সেচন করিতে পারিলে পালম শাক বার মাস জন্মাইতে পারা যায়। বর্ষাকালে চাষ করিতে হইলে উঁচু জমির আবশ্যক কিন্তু জল-সেচনের আবশ্যক হয় না। শীতের পালম যেরূপ আস্বাদনযুক্ত হয়, অন্য সময়ে সেরূপ হয় না। ভাইটামিন-প্রধান সজ্জী বলিয়া ইহার আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পালম শাক—ঈষৎ কটুযুক্ত-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভ, রুক্ষ ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং বায়ু পিত্ত, শ্বাস ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।

স্যুইস চার্ড :—ইহার সুমিষ্ট ও সুখাদ্য শাক পালম শাকের ন্যায় সব্জীরূপে ব্যবহৃত হয়। বীটগুলির তেমন আদর নাই। ইহার শাকের আদরই অধিক। এই শাকের অনেক প্রকার তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ২ মাসে আহারের উপযোগী হয়। ইহার বাহিরের পাতা ভাঙ্গিয়া লইলে দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা চলে। ইহাতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ খুব কম হয়।

টক পালম

ইহা টক পালম বা চুকা পালম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। ইহা অম্লরসযুক্ত ; এইজন্য ইহার কচি ডগা ও পাতা হইতে উৎকৃষ্ট চাটনি ও অম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি /৵০ পোয়া বীজ লাগে। ইহার আবাদ পালম শাকের ন্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—অতিশয় অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, দুর্জ্জর, মলভেদক, পিত্তকারক এবং বায়ু, দাহ, বাত ও শ্লেষ্মানাশক। চিনি মিশ্রিত চুকা পালম—দাহ, পিত্ত ও কফরোগে উপকারক।

পুঁই শাক

পুঁই শাক গ্রীষ্ম ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই জন্মাইতে পারা যায়। ইহা সাধারণতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত। এক প্রকার লাল ও অন্য প্রকার সবুজ। উঠান ঝাঁটান ওঁচলা মাটি, গোয়ালের আবর্জ্জনা, গোবর ও ছাই ইহার উৎকৃষ্ট সার। সাধারণতঃ চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা হয়। গ্রীষ্ম অপেক্ষা বর্ষার গাছ অধিক দীর্ঘ এবং তেজাল হইয়া থাকে।

ইহার জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া সার নিশ্রিত করিতে হইবে। পরে কোন এক স্থানে বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে জমিতে বসান যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে পুঁই শাকের ডগাগুলি কাটিয়া লইলে গাছগুলি বেশ তেজাল হয়। পুঁই শাকের গাছ মাচায় তুলিয়া দিলে কিংবা চালের উপরে উঠাইয়া দিলে দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ⁄।০ পোয়া বীজ লাগে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গাছে ফুল ধরে। উহাকে মিটুলি বলে। মিটুলি হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়। পুঁই শাকের পাতা, ডাঁটা এবং কচি মিটুলি তরকারীতে

ব্যবহৃত হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে দ্বাদশী তিথিতে পূতিকা বা পুঁই শাক ভক্ষণ নিষেধ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—কটু-কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক, মেদোনাশক, আলস্যজনক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিদ্রাবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক ও শ্লেষ্মাকারক।

শুলফা শাক

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়। ইহার জমিতে আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল-সেচন প্রয়োজন। তরকারী সুস্বাদু করিবার জন্য শুলফা শাক ও বীজ মসলার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কনফেকসনারীতেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এদেশ অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে ইহার আদর অধিক। বীজ পাকিলে পক্ক বীজ সমেত গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বীজগুলি ঝাড়িয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। তিন চারি মাসে ফসল তৈয়ারী হয়। বিঘা প্রতি তিন পোয়া বীজ লাগে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং গুল্ম, শূল, বাত ও পিত্তনাশক।

বেথুয়া শাক

ইহার বীজ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বপন করা হয়। জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া মাটি গুঁড়াইয়া ধূলার মত করিতে হয়। জমি প্রস্তুত হইলে বীজের সহিত অল্প ঝুরা মাটি বা বালি মিশ্রিত করিয়া উহা জমিতে পাতলা ভাবে ছিটাইয়া বপন করা উচিত। গাছ বড় হইলে ডগা সমেত গাছের কচি পাতাগুলি কাটিয়া শাকের ন্যায় ব্যবহার করা চলে। বিঘা প্রতি তিন পোয়া বীজ লাগে।

মেথি শাক

ইহার বীজ তরকারীতে মসলারূপে এবং পাতা শাক-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইহার বীজ জমিতে পাতলা ভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি /১৷৷৹ সের বীজ লাগে। চৈত্র মাসে ইহার বীজ পাকিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, রক্তপিত্তের প্রকোপক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও জ্বরে উপকারক।

পিড়িং শাক

দোআঁশ মাটিতে ইহার চাষ করিতে পারা যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া ইহার বীজ ক্ষেতে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। ইহার জমিতে জল-সেচনের বিশেষ আবশ্যক। গাছ একটু বড় হইলে ইহার শাক তুলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। শাক তিক্ত-আস্বাদযুক্ত। বিঘা প্রতি ৵১॥০ সের বীজ লাগে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—কটু-তিক্ত-মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং কফ, কাশ, মেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, দাহ, ঘর্ম্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্ত-দোষ ও বিষদোষে উপকারক।

ধনে শাক

ধনে এবং উহার পাতা উভয়ই মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি তিন সের বীজ লাগে।

গাছগুলি ৬।৭ অঙ্গুলি আন্দাজ বড় হইলে আবশ্যক মত উহার পাতা কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। বীজ জন্মাইতে হইলে গাছের পাতা না কাটিয়া ফাল্গুন চৈত্র

মাসে বীজ পাকিলে নূতন পক্ক ধনে বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বপন করিবার পূর্ব্বে উহা ৭।৮ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া লওয়া উচিত। রীতিমত চাষ করিতে পারিলে বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ ধনে জন্মিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ধনে—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, রুচিকর, মল-রোধক, মূত্রকারক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, কৃশতা ও কৃমি-রোগে উপকারক। কাঁচা ধনে পিত্তনাশক।

কুলফা শাক

এই শাক ক্ষুদ্র অবস্থায় লেটুসের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন জেলায় ইহার অধিক চাষ হইয়া থাকে। চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা হয়। হালকা দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। এই শাক অতি স্নিগ্ধ এবং স্কার্ভি রোগে উপকারক।

পাট শাক

পাট গাছের ডগা সমেত কচি পাতা শাকের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র ভাবে ইহার চাষ করা

হয় না। কেহ কেহ সখ করিয়া বাগানের মধ্যে অন্যান্য শাকের সহিত ইহার বীজ ছড়াইয়া থাকেন। একপ্রকার তিক্ত পাট শাক দৃষ্ট হয়। এই তিক্ত পাট শাকের বাংলা নাম 'নালতে পাতা'। ইহা অনেক রোগে উপকারী। ইহা মধুর-রস, শীতল, পিচ্ছিল, বিষ্টম্ভী, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক এবং রক্তপিত্ত-রোগে উপকারক।

পুদিনা শাক*

অন্যান্য শাকের ন্যায় ইহা তরকারীতে ব্যবহৃত হয় না। এই শাক হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক চাট্‌নী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এদেশে ইহার ব্যবহার সেরূপ প্রচলিত নাই। পশ্চিমদেশীয় লোকদের নিকট ইহা বিশেষ পরিচিত। ইহার বীজ হইতে ও কাটিং পুঁতিয়া উভয় প্রকারেই গাছ জন্মান যাইতে পারে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ইহার বীজ অথবা কাটিং হইতে চারা প্রস্তুত

* গুড়-মাখান দড়ি হইতে পুদিনার উৎপত্তি হয়। একটী গুড়-মাখান দড়ি (৩ হাত পরিমিত) লইয়া একস্থানে ঝুলাইয়া রাখিলে উহার উপর মাছি ডিম পাড়ে। কিছুদিন পরে সেই দড়িগাছটী লইয়া সাবধানে গোলাকারভাবে মাটিতে রাখিয়া তাহার উপর সার প্রয়োগ করিলে ঐ মাছির ডিম হইতে পুদিনা শাকের উৎপত্তি হয়।

করিতে হয়। গাছ একবার প্রস্তুত করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত রাখা চলে। বিঘা প্রতি ।/৹ পোয়া বীজ লাগে। অল্প ছায়াযুক্ত দোআঁশ জমিতে ইহা ভাল জন্মে। ইহা সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচিনাশক এবং মূর্চ্ছা ও বমি-নিবারক।

কলমী শাক

ইহা একপ্রকার জলজ শাক। কলমী শাক বিশেষ উপকারী এবং উহার আস্বাদন ভাল। ইহার চাষ করিতে হয় না। কোন কোন পুষ্করিণীতে ইহা আপনা-আপনিই জন্মিয়া থাকে। ইহা লাগাইতে হইলে শিকড় সমেত কয়েকটী ডগা সংগ্রহ করিয়া জলে নামাইয়া দিতে হয়। ২।১ বৎসরের মধ্যে উহা পুষ্করিণী বা জলাশয়ের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসে। ইহার কচি ডগা-সমেত পাতা কাটিয়া আহারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক এবং স্তনদুগ্ধ, শুক্র ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

হিঞ্চে শাক*

কলমীর ন্যায় ইহাও একপ্রকার জলজাত শাক।

* হিঞ্চে শাকের রস কাঁচা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলে পিত্তনাশ হয়।

হিঞ্চে শাকও কলমী শাকের ন্যায় পুষ্করিণীতে বা জলাশয়ে লাগাইতে পারা যায়। কলমী শাকের ন্যায় ইহাও আহার করা হয় তবে ইহা অল্প তিক্ত আস্বাদযুক্ত।

ইহা তিক্তরস, শীতল, সারক, পিত্তনাশক এবং কফ, শোথ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

শুষনি শাক

ইহা জলক শাক বিশেষ। হিঞ্চে, কলমী প্রভৃতি জলের উপরে জন্মিয়া থাকে কিন্তু ইহা জলাশয়ের ধারে জন্মিয়া থাকে।

ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, রুচিজনক, মেধা-বর্দ্ধক, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক এবং দাহজ্বরে উপকারক।

গিমে শাক

ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ। ভিজা সেঁতসেঁতে জমিতে ইহা স্বভাবতঃই আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে। ইহার আস্বাদ নিমের ন্যায় তিক্ত। ইহা বিশেষ উপকারী শাক।

ব্রাহ্মী শাক

ঔষধ হিসাবেই ইহার ব্যবহার অধিক প্রচলিত। ইহা স্বভাবতঃ আপনা-আপনিই জলাশয়ের কিনারায় বা

সেঁতসেঁতে জমিতে জন্মিতে দেখা যায়। স্বতন্ত্রভাবে কেহ বড় একটা ইহার চাষ করে না। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, সারক, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধি-কারক, স্বর-পরিষ্কারক এবং কাশ, কুষ্ঠ, শোথ, মেহ, পাণ্ডু ও পিত্তে উপকারক।

থালকুনি শাক

ইহা একপ্রকার গুল্ম জাতীয় শাক। ইহাও ব্রাহ্মী শাকের ন্যায় নানারোগে ঔষধের কার্য্য করে। ইহা শীতল, লঘুপাক, সারক, কাশনাশক, পাকে কটু, উষ্ণ, লঘুপাক, রুচিকর এবং মেহ, প্লীহা, কৃমি ও অর্শরোগের শান্তিকারক। ইহার পাতা বাহ্য প্রয়োগে নানাবিধ চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ, উপদংশ ও নালিঘায়ে উপকারক। এই শাক স্বভাবতঃ বন্যভাবে জন্মিয়া থাকে।

পুনর্ণবা শাক

ইহা নটে বা অন্যান্য শাকের সহিত আপনা-আপনি জন্মিতে দেখা যায়। শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণ ভেদে ইহারা তিন ভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ শ্বেত পুনর্ণবাই অধিক উপকারী। শ্বেত পুনর্ণবা—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং

শ্লেষ্মা, শোথ, পাণ্ডু, অরুচি, শূল, অর্শ, কাশ এবং বায়ু-রোগ, রক্তবিকার ও বিষদোষে উপকারক। রক্ত পুনর্ণবা—শীতল, লঘুপাক, সারক ও বায়ুবর্দ্ধক এবং শোথ, পিত্ত, রক্ত, পাণ্ডু ও শ্লেষ্মারোগে হিতকর। নীল পুনর্ণবা—শোথ, পাণ্ডু, হৃদরোগ এবং শ্বাস ও বায়ুর শান্তিকারক ও বেরীবেরী রোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

চেরভিল

এদেশে ইহার ব্যবহার প্রচলিত নাই এবং ইহার চাষও বড় একটা দেখা যায় না। তরকারী সুগন্ধ করিবার জন্য ইহার কচি পাতা ব্যবহৃত হয়। বীজ ছিটাইয়া ইহা বপন করিতে হয়। সমতল জমিতে ভাদ্র হইতে ফাল্গুন মাস এবং পার্ব্বত্য জমিতে ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করা চলে। চেরভিলের অন্য এক জাতি আছে যাহার মূল পার্সনিপের মত ব্যবহার করিতে হয়।

স্পিনাচ্

ইহা পালম শাকের ন্যায় শাক জাতীয় বিদেশী সব্জী। লতানে ও ঝাড়বিশিষ্ট অনেকগুলি জাতি আছে। ভাদ্র

হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ ৯ ইঞ্চি হইতে ১২ ইঞ্চি অন্তর ছড়াইয়া বপন করা হয়। দুই হইতে আড়াই মাসের মধ্যে শাক ব্যবহারের উপযোগী হয়। মধ্যে মধ্যে জমিতে নিড়ানী দেওয়া ও জল-সেচন করা প্রয়োজন। নিউজিল্যাণ্ড স্পিনাচের চারা ভাটীতে তৈয়ারী করিয়া তিন ফিট অন্তর লাইনে প্রত্যেকটি দুই ফিট ব্যবধানে বসাইতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়

ভুঁইফোঁড় বা কোঁড়ক

ইহা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলায় ইহা কোঁড়ক ছাতা, পাতালফোঁড়, ভুঁইফোঁড়, কোঁড়ক, পোল ছাতা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে ইহার বিস্তৃত চাষ বড় একটা দেখা যায় না কিন্তু বাংলার বাহিরে অবাঙ্গালি বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহা এরূপ পরিচিত হইয়াছে যে, ইহার চাষ করিয়া এক-একটী পরিবার স্বচ্ছন্দে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কোঁড়কের মধ্যে তুইটী বিভিন্ন জাতি দৃষ্ট হয়। একটীকে চলতি ভাষায় ব্যাঙের ছাতা বলে এবং অপরটী ভুঁইফোঁড় নামে অভিহিত। ব্যাঙের ছাতা ছাতির ন্যায় মাথাবিশিষ্ট; ইহা মানবের অভক্ষ্য। ভুঁইফোঁড় বা কোঁড়ক ছোট অর্দ্ধ-গোলাকৃতি মাথাবিশিষ্ট; ইহা সুস্বাদু ও ভক্ষণোপযোগী।

বর্ষাকালে খড়ের গাদা, গোয়ালের আবর্জ্জনা অথবা

কোন উঁচু মাঠাল জমিতে ইহা স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখা যায়। ইহাকে পোয়াল ছাতা কহে। উইঢিবির উপর একপ্রকার ছাতা জন্মায় তাহাকে দুর্গা ছাতি কহে। এগুলি খাদ্যোপযোগী। ইহাদের বীজ সংগ্রহ করিয়া যে বিস্তৃত ভাবে চাষ হইতে পারে সকলে তাহা অবগত নহেন।

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহার যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। ইহার চাষের জমি প্রস্তুত করিবার একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ সব্জী চাষের ন্যায় জমি প্রস্তুত অথবা সার প্রয়োগ করা ইহার পক্ষে প্রশস্ত নহে। অন্যান্য সব্জী চাষে পুরাতন ও পচা সার উপকারী কিন্তু ইহার পক্ষে টাটকা তেজস্কর সার আবশ্যক।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু এবং আবহাওয়া ভেদে বিভিন্ন সময়ে ইহার চাষ হইতে পারে। সাধারণতঃ বর্ষার প্রারম্ভেই ইহার চাষ হইয়া থাকে এবং ঐ সময়ে চাষ করাও বিশেষ সুবিধাজনক।

শীতল ছায়াযুক্ত ও শুষ্ক স্থান দেখিয়া ইহার জমি নির্ব্বাচন করিতে হয়। বীজ বপন কাল উপস্থিত হওয়ার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ইহার জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। নির্ব্বাচিত জমিতে ইট, খোলা প্রভৃতি

ছড়াইয়া স্থান উঁচু করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর টাট্‌কা গোময়, গোয়ালের আবর্জ্জনা এবং ঘোড়ার মল-মূত্রাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিছাইয়া উপরে খড় চাপা দিয়া পুনরায় একবার গোময় ও খড় ইত্যাদি বিছাইতে হইবে এবং তদুপরি ২॥ ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত উপায়ে জমি প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন কাল উপস্থিত হইলে যখন দেখা যাইবে জমির অভ্যন্তরস্থ সার ইত্যাদি পচিয়া উত্তাপ উত্থিত হইতেছে, তখন কোঁড়কের বীজ ঝুরা মাটির ন্যায় গুঁড়া করিয়া উপরে ছড়াইয়া বপন করিতে হইবে। জমি সরস রাখার নিমিত্ত আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল-সেচন ব্যতীত ইহার জমিতে অন্য কোন কার্য্য করার আবশ্যক হয় না। ঝারি অথবা পিচকারীর সাহায্যে জল-সেচন করা বিধেয়। এই উপায়ে বপন করিলে দেখা যাইবে যে, ১০।১৫ দিনের মধ্যেই জমি হইতে অসংখ্য কোঁড়ক উত্থিত হইতেছে। ইহা নাড়িয়া বসাইবার আবশ্যক হয় না। ইহাই বড় হইয়া খাদ্যোপযোগী হইয়া থাকে। টবে অথবা গামলার মধ্যেও ছত্র উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং ইহাতে চাষ করিলে নিম্নে টালি বিছাইবার আবশ্যক হয় না।

ইহা মধুর-রস, শীতল, পিচ্ছিল ও গুরুপাক এবং কফ, জ্বর, অতিসার ও বমনরোগে হিতকর।

সজিনা

ইহা ডালপালা বিশিষ্ট সুদীর্ঘ গাছ। বর্ষাকালে সুপক্ক বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বীজ অপেক্ষা গাছের ডাল কাটিয়া রোপণ করাই প্রশস্ত। চৈত্র মাসে ইহার ডাঁটা গাছে পাকিয়া ফাটিয়া যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার ডাল কাটিয়া পুকুরের পাড়ে অথবা জলাশয়ের ধারে বসাইয়া দিলে শীঘ্রই উহা হইতে শিকড় বহির্গত হয়। ডাল পুঁতিয়া উহার অগ্রভাগে মাটির পিণ্ড বসাইয়া দিলে শীঘ্রই উহা হইতে নব শাখা-প্রশাখা বহির্গত হইয়া থাকে।

বীজের গাছ অপেক্ষা ডালের গাছে শীঘ্রই ফল বা খাড়া জন্মিয়া থাকে। একবার এই গাছ জন্মিলে সহজে মরিতে চায় না। এজন্য পল্লীগ্রামের অনেকে সজিনা গাছের ডাল পুঁতিয়া বেড়া প্রস্তুত করেন। এরূপ ভাবে বপনে উভয়বিধ কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে।

সজিনা গাছের কচি পাতা, ফুল ও ডাঁটা সমস্তই সব্জীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুন মাসে গাছে খাড়া বা ডাঁটা ফলিয়া থাকে।

সজিনার অন্য এক জাতি আছে তাহাকে 'নাজিনা' বলে। ইহার খাড়া বার মাস জন্মিয়া থাকে। সময়ের ফল বা খাড়ার মত অসময়ের খাড়া সুস্বাদু নহে।

ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, কটু, বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, রুচিকর, বিদাহী, ধারক, ক্ষারগুণযুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তপ্রকোপক, বাত-শ্লেষ্মানাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মুখের জড়তা নিবারক এবং শোথ, ব্রণ, মেদোদোষে, গুল্ম, প্লীহা ও গলগণ্ড রোগে হিতকর। ইহার শাক—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক ও কৃমি-বিনাশক। ইহার মূল বিষাক্ত।

সজিনা বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা পিচ্ছিল, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও কফ-বায়ুনাশক এবং ব্রণ, কণ্ডু, ত্বকদোষ ও শোথরোগ-নিবারক।

শাক

শাক অনেকের নিকট অতি তুচ্ছ ও নগণ্য সব্জী হইলেও, আহার্য্য হিসাবে উহার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু মোটেই তুচ্ছ বা নগণ্য নহে, কারণ শাকের মধ্যে খাদ্য-সার (ভিটামিন) ও লবণ অনেক অধিক পরিমাণে আছে। সেইজন্য ইহা ভোজন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে শাকান্ন ভোজনের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপীয়রাও স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর শাক বা ছালাদ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাঁচকলা

কলার অন্তর্গত এক স্বতন্ত্র জাতি। অন্যান্য জাতির কলা যেমন পক্ক অবস্থায় ফল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইহা সে ভাবে ব্যবহৃত হয় না। কাঁচা অবস্থায় সব্জী হিসাবেই ইহার ব্যবহার প্রচলিত। ইহা আহার ও ঔষধ

উভয়ের কাজ করে। উদরাময় রোগীর পক্ষে কাঁচকলা পরম হিতকর। ইহাতে লৌহের অংশ থাকায় ইহা ধাতু-পুষ্টি করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে কাঁচকলা—কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভকারক ও বলবর্দ্ধক।

থোড়

ইহা কলাগাছের আভ্যন্তরীণ কাণ্ড। সব্জী হিসাবে তরকারীতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। কলাগাছের মোচা নামিবার পূর্ব্ব অবস্থা পর্য্যন্ত থোড় কোমল বা নরম থাকে। কলা জন্মিবার পর হইতে থোড় ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে, তখন উহা আহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। এতদ্ভিন্ন ইহা ধাতুবর্দ্ধক। আয়ুর্ব্বেদ মতে থোড়—মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং প্রদর ও যোনিদোষে উপকারক।

মোচা

কলার মোচাও সজী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট মুখরোচক তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। সজী হিসাবে ইহা আমাদের যে পরিমাণ উপকারে আসে তাহা অপেক্ষা ঔষধ হিসাবেই অধিক কাজ করে। মোট কথা, ইহা একেবারে সজী ও ঔষধ উভয় প্রকারে আমাদের উপকারে আসে। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রস্রাবের পীড়াক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা—মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয়রোগে হিতকর।

পেঁপে *

পেঁপে পক্ক অবস্থায় ফল হিসাবে এবং কাঁচা অবস্থায় সজী হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেঁপে কাঁচা

* ইহার চাষ, গ্রন্থকার প্রণীত 'আদর্শ ফলকর' নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ও পাকা উভয় অবস্থাতেই বিশেষ উপকারক। এজন্য অনেকে পেঁপে কাঁচা অবস্থাতেই আহার করেন। ইহা শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক এবং অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ ও অম্লরোগে উপকারক। কাঁচা পেঁপের আটা কলার মধ্যে পুরিয়া কিছুদিন সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্মরোগের উপশম হয়। আঁচিল, ব্রণ ও জিহ্বাক্ষত প্রভৃতিতে পেঁপের আটা লাগাইলে বিশেষ উপকার করে। মাংস সিদ্ধ করিবার সময় কাঁচা পেঁপে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উহাতে ছাড়িয়া দিলে মাংস অল্প সময়ে সুসিদ্ধ হয় বলিয়া শুনা যায়।

এঁচোড়

কাঁঠালের কচি অবস্থার নাম এঁচোড়। কচি অবস্থায় ইহা সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এঁচোড় হইতে চপ, ডালনা প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য ও মুখরোচক তরকারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা— মধুর-কষায়-রস, কঠিন, রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, বলকর,

দাহজনক, কফ, বায়ু ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক। কাঁঠালের বীজও সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহা কষায়যুক্ত মধুর-রস, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, ত্বকদোষনাশক, মলরোধক, মূত্রবিরেচক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ডুমুর

ডুমুর সাধারণতঃ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়, দেশী ডুমুর ও যজ্ঞডুমুর। ইহাদের মধ্যে যজ্ঞডুমুর অনেক রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক। দেশী ডুমুরের আকার যজ্ঞডুমুর অপেক্ষা কিছু ছোট। ডুমুর কচি অবস্থাতেই তরকারীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কষায়-রস, মলমূত্রাদির স্তম্ভনকারক এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও বেদনায় হিতকর। ডুমুরের মধ্যে লৌহের ভাগ থাকায় ইহা ধাতুপুষ্টিকর।

পরিশিষ্টাংশ

(ক)

মাসিক কার্য্য

বৈশাখ—এসময় ঢেঁরস, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, শশা, করলা, কাঁকরোল, ধুন্দুল, লঙ্কা, কুমড়া, চালকুমড়া, বরবটী, বর্ষাতি মূলা, দেশী সীম, টেঁপারী, শাঁক-আলু ও নটে শাকের বীজ বপন করিতে পারা যায়। আদা, হলুদ, কচু, মানকচু, জেরুজিলাম আর্টিচোক, মেটে আলু প্রভৃতির গেঁড় বা মূল এবং বেগুণের চারা এসময় রোপণ করা দরকার। করলা, ওল ও কচুর জমিতে আবশ্যক মত নিড়ান ও সেচ দেওয়া আবশ্যক। বৃষ্টি হইতে দেখিলে মাটিতে পরিমিতভাবে খইল দিয়া কোপাইয়া দেওয়া দরকার।

জ্যৈষ্ঠ—সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে যে সমস্ত বীজ বপন করা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসেও উহা বপন করা চলে। এসময় বেগুণ গাছের গোড়ায় ভাঁটী টানিয়া দেওয়া দরকার। পাটনাই ও বেনারসী জলদি ফুলকপির চারা এই সময় হইতেই জন্মাইতে পারা যায়। বেগুণের চারা এই

মাসে লাগান হইয়া থাকে। জমিতে নিয়মিত ভাবে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জমিতে গোবর দিয়া কচুর মুখী রোপণ করিতে হইবে। কচু গাছের পাশ গজা ভাঙ্গিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। কচু ও ওলের জমি আবশ্যক মত নিড়াইয়া দাঁড়া বাঁধিয়া সেচ দিতে হইবে।

আষাঢ়—ঢেঁড়স, সীম, শাঁক-আলু, দেশী শালগম ও জলদি ফুলকপির বীজ বর্ত্তমানে বপন করা যায়। লাউ, কুমড়া ও ঢেঁড়স ইত্যাদি বীজ বপন করা না হইলে এই মাসে বপন করা কর্ত্তব্য। বেগুণ চারা ভাল হইয়া লাগিয়া গেলে সামান্য খইল মাটির সহিত মিশাইয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আদা ও হলুদের জমিতে নিড়ান দিয়া গাছের গোড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়া দিবে। সুবিধামত কিছু খইল মাটির সহিত মিশাইয়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। টেঁপারি ও মেস্তার জমি নিড়াইয়া আবশ্যক মত গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রাবণ—এই সময় নানাপ্রকার শাক, সীম, কুমড়া, লঙ্কা, পুঁই, বরবটী, লাউ, টমেটো, শাঁক-আলু, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, জলদি বাঁধাকপি ও মূলা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হইবে। কুলিবেগুণের 'জলদি' আবাদ হইলে এই সময় ফলিতে আরম্ভ করে। করলার ফল হইতে

আরম্ভ হয়। ফুলকপির বীজ এক্ষণে বপন করা আবশ্যক। চারা প্রস্তুত হইলে সকালে ও বিকালের রোদ খানিকটা করিয়া লাগাইয়া চারাগুলিকে ক্রমশঃ শক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। এই মাসে কচু তৈয়ারী হইয়া যাইবে। ওলের জমিতে আবশ্যক মত নিড়ান দেওয়া উচিত।

ভাদ্র—এসময় ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, মূলা, লেটুস, ফরাসী সীম, টমেটো, মটর, স্কোয়াস, পার্শনিপ, পালম প্রভৃতি শাক-সব্জী এবং শাঁক-আলু, পেঁপে ও টেঁপারীর বীজ লাগান উচিত। জলদি ফুলকপির চারা এক্ষণে উঠাইয়া হাপোরে দিতে হইবে। হাপোরের মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা আবশ্যক। হাপোরের উপর আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ অতি বৃষ্টি ও রৌদ্রে চারা খারাপ হইয়া যাইবে। বাঁধাকপি ও ওলকপির বীজ এই সময়ে বপন করিতে হয়। এক্ষণে টমেটোর বীজ পাতলা ভাবে বুনিতে হয়। টমেটোর চারার উপর আচ্ছাদন দিতে হইবে। লঙ্কা বীজ ও তামাক বপনের ইহা উপযুক্ত সময়।

আশ্বিন—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টমেটো, শালগম, বীট, পেঁয়াজ, টক পালম, নটে শাক, মূলা, শীতের লাউ, শীতের কুমড়া, সীম ও জলদি মটর প্রভৃতির বীজ

বপন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। জলদি কপির চারা জমিতে লাগান হইলে এই সময় চারার গোড়ায় মাটি তুলিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। গাছে আবশ্যক মত নিড়ান ও খইল দেওয়া আবশ্যক। জলদি ফুলকপির চারা এক্ষণে রোপণ করা দরকার। বাঁধাকপির ও ওলকপির চারা প্রস্তুত হইলে হাপোরে দিতে হইবে। ওল এই সময়ে বসান উচিত। এই মাসের মাঝামাঝি জমিতে শিলং আলু আবাদ আরম্ভ করিতে হইবে। পটল-মূল ও আলু এই সময় লাগান চলে।

কার্ত্তিক—ওলকপি, ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদির চারা এক্ষণে বসানর কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে আর একপ্রকার করলার বীজ বপন করিতে হয়। আশ্বিন মাসে যে ফুলকপির বীজ বপন করা হইয়াছে তাহার চারা এক্ষণে দিতে হইবে। টমেটোর জমি নিড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া ও সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এই মাসের শেষ সপ্তাহে আমেরিকান মটর বপন করিতে হয়। ফরাসী সীম এক্ষণে বপন করা দরকার। মূলা বীজ পূর্ব্বের মাসে বপন করা হইলে জমি নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং চারা ঘন হইলে পাতলা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বড় পাটনাই ও বিলাতী পেঁয়াজ বীজ

এক্ষণে বপনের উপযুক্ত সময়। পটল-মূল ও আলু বসাইতে হইবে।

অগ্রহায়ণ—পটল-মূল ও আলু এই সময়েও লাগান চলে। তরমুজ, খরমুজা, লাউ, ভুঁয়ে শশা বীজ এই মাসে বপন করিতে হয়। কাঁকুড়, কাঁকড়ী, ক্ষেতি ঝিঙ্গা, কুমড়া ও উচ্ছে বীজ বপনের ইহা উপযুক্ত সময়। ফুলকপি, বাঁধা ও ওলকপির জমিতে খইল প্রয়োগ করিয়া মাটি খুঁড়িয়া দিতে হইবে। ইহাদের জলদি ও নাবী অনুসারে গাছের গোড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়া আবশ্যকমত সেচ দিতে হইবে। বিলাতি মটর ও ফরাসী সীমের নিড়ান জমি ও মাটি খুঁড়িয়া আলগা করিতে হইবে। বর্ম্মা আলু এই সময় বপন করিতে হইবে। শিলং ও দেশী আলুর চারা বাহির হইলে খোঁচা দিয়া মাটির চটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং মাটির সহিত খইল মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। দার্জ্জিলিং আলুর শিকড় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; ইহার গোড়ায় মোটা করিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতেহয়। পাটনাই ও ঠিকরে আলু বীজও এসময় বপন আবশ্যক। বড় পাটনাই ও বিলাতি পেঁয়াজের চারা বীজতলা হইতে উঠাইয়া জমিতে রোপণ করা উচিত।

পৌষ—এই সময় জমিতে তরমুজ, ফুটী, খরমুজা,

চৈতে ঝিঙ্গা, চৈতে শশা, লাউ, চৈতে বেগুণ, উচ্ছে প্রভৃতি বীজ বপন করা যাইতে পারে। বাঁধাকপি ও ওলকপিতে ৭।৮ দিন অন্তর আবশ্যক মত সেচ দেওয়া দরকার ও তরল সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মূলা তৈয়ার হইয়াছে। বীট, গাজর, শালগম ক্রমশঃ ব্যবহারের উপযোগী হইতেছে। শিলং আলু এই মাসের মাঝামাঝি খাদ্যোপযোগী হইয়া থাকে। ছোট পেঁয়াজের কলি দেখা দিলে ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত, নচেৎ পুষ্ট হইবার সুবিধা পায় না। আম-আদা ও হলুদ এই সময় তোলা আবশ্যক।

মাঘ—এমাসেও চৈতে শশা, ঝিঙ্গে, বেগুণ, উচ্ছে, লাউ, ফুটী, তরমুজ ও খরমুজা প্রভৃতির বীজ বপন করা আবশ্যক। পাটনাই কিংবা বিলাতী বড় পেঁয়াজ আলুর জমিতে বপন করা চলে।

ফাল্গুন—এই সময়ে তরমুজ, চৈতে ঝিঙ্গা, চৈতে শশা, কুমড়া, লাউ ইত্যাদির বীজ বপন করা যাইতে পারে। নাবী বাঁধাকপি, নাবী ফুলকপি, টমেটো, ফরাসী সীম ইত্যাদি এ সময় তৈয়ার হইয়া যাইবে। দার্জ্জিলিং, পাটনাই, নইনীতাল ইত্যাদি আলু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। ছোট দেশী পেঁয়াজ তৈয়ার হইলে ক্ষেত হইতে

উঠাইয়া লইতে হইবে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের উপ্ত করলা গাছে এক্ষণে ফল হইতে আরম্ভ হয়।

চৈত্র—এই সময় করলা, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, শশা, লাউ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, বরবটী, ধুন্দুল প্রভৃতির বীজ বপন করা যাইতে পারে। আশু আবাদের পেঁয়াজ তৈয়ারী হইয়া গেলে এই সময়ে জমি হইতে উঠাইয়া লওয়া উচিত। এক্ষণে ওল রোপণ করা হয়। কচু গাছে সেচ দেওয়া আবশ্যক। ভুট্টা ও বরবটীর বীজ জমি প্রস্তুত থাকিলে আশু বপন করা উচিত।

(খ)

সব্জী চাষের মোটামুটী হিসাব

চাষীগণের সুবিধার জন্য সব্জী চাষের মোটামুটী হিসাব দেওয়া হইল। বাংলাদেশের মধ্যে সকল স্থানের জল-হাওয়া বা মৃত্তিকা সমান নয়, এজন্য যে-কোন একটী ফসল বাংলার সমস্ত স্থানে ঠিক একই সময়ে চাষ করা চলে না। জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রতিকূল ও অনুকূলতা বশতঃ বীজ-বপন-কার্য্য কিছু অগ্র-পশ্চাৎ সাধিত হয় এবং এইজন্য উহাদের ফলনও জলদি ও

নাবী হইয়া থাকে, সুতরাং যথাযথ হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নয়। যে-কোন সব্জী নূতন অবস্থায় অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। এইজন্য জলদি ফসল উঠাইতে পারিলে লাভ কিছু বেশী পাওয়া যায় এবং উহা যত পুরাতন হইয়া আসে ও বাজারে অধিক পরিমাণে আমদানি হইতে থাকে ততই উহার মূল্য কমিতে থাকে। স্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু, কালাকাল, মৃত্তিকার ভেদাভেদ ও সময়ের আগুপিছু ও বাজার দর অনুসারে এই হিসাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কলিকাতা সহরতলীর ও অন্যান্য বড় সহরের নিকটবর্ত্তী বাজার সমূহে যেখানে শাক-সব্জী প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে সেইরূপ স্থানের পক্ষে আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব কিছু মিলিবে কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামের বাজার দরের সহিত ইহা মিলিবার আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-মন্দা হেতু লোকের ক্রয় শক্তি হ্রাস পাওয়ায় সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই নামিয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে আয়-ব্যয়ের হিসাবে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে, সুতরাং স্থান বিশেষে চাষীগণ ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারেন। স্থানীয় অভিজ্ঞ প্রাচীন চাষীর নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ লইলে অসুবিধা দূর হইতে পারে।

সব্জী চাষের হিসাব

সব্জীর নাম	বীজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
আর্টিচোক (গ্লোব)	৭—৮ তোলা	শ্রাবণ—কার্ত্তিক	১ বৎসর	৫০৲	২০৲	৩০৲
„ (জেরুজিলাম)	৮৹ তিরিশ সের	মাঘ—ফাল্গুন	৯—১০ মাস			
আলু (টুকরী)	২/০ মণ	আশ্বিন—অগ্রহায়ণ	৩—৫ মাস	১২০৲	৭০৲	৫০৲
„ গৌহাটী ও অন্যান্য	২৷৷০—৩/০ মণ	আশ্বিন—কার্ত্তিক				
„ রাঙ্গা বা শকরকন্দ	১/০ মণ	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	৫ মাস	৬৫৲	২৫৲	৪০৲
আদা	১/০ মণ	„ „	৬ মাস	৩০৲	১৫৲	১৫৲
আম-আদা	১/০ মণ	„ „	৬ মাস	২৫৲	১০৲	১৫৲
উচ্ছে	/।৶০ পোয়া	কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ ফাল্গুন—চৈত্র	৩ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲
এনডিভ্	/৵০—/১ সের	আশ্বিন—কার্ত্তিক	৪ মাস	—	—	—
এসপারাগাস	২—৩ তোলা	শ্রাবণ—ভাদ্র	১৪ মাস	—	—	—
ওলকপি	৩—৪ তোলা	ভাদ্র—আশ্বিন	২—২৷৷০ মাস	৬০৲	৩৫৲	২৫৲
ওল	১৷৷০ মণ	মাঘ—ফাল্গুন	১ বৎসর	৫০৲	২০৲	৩০৲

সব্জীর নাম	বীজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
কাঁকুড় বা ফুটী	৭—৮ তোলা	কার্ত্তিক—ফাল্গুন	৩ মাস	২৫৲	১০৲	১৫৲
কাঁকরোল	/॥০ সের	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	৩ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲
করলা	/॥০ সের	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র	২ মাস	৪০৲	১৫৲	২৫৲
কাঁকড়ি	৭ তোলা	চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ	৩ মাস	২৫৲	৫৲	২০৲
কচু (মুখী)	৸০ তিরিশ সের	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	১ বৎসর	৩০৲	১৫৲	১৫৲
কুমড়া (চাল)	৭—৮ তোলা	চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ	২—২॥০ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲
কুমড়া মিষ্ট (চৈতালি)	/৶০ তিন ছটাক	পৌষ—মাঘ	২॥০ মাস	১০০৲	২০৲	৮০৲
„ (আউসে)	/৶০ তিন ছটাক	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ				
„ (শীতের)	/৶০ তিন ছটাক	আশ্বিন—কার্ত্তিক				
„ (গিমি)	১০ তোলা	কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ	২॥০ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲
ক্রেস বা হালিম	৪—৫ তোলা	ভাদ্র—আশ্বিন	২০ দিন	—	—	—
খেঁড়ো	৬—৭ তোলা	পৌষ—ফাল্গুন	২ মাস	৪০৲	১৫৲	২৫৲
খরমুজা	৬—৭ তোলা	অগ্রহায়ণ—মাঘ	২॥০—৩ মাস	৯০৲	৩০৲	৬০৲

সব্জী চাষের হিসাব

সব্জীর নাম	বীজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
গাজর (দেশী)	/২॥০ সের	আশ্বিন—কার্ত্তিক	২॥০ মাস	৬০৲	৩০৲	৩০৲
„ (বিলাতী)	/৸০ পোয়া	„ „	২॥০ মাস	৬০৲	৩০৲	৩০৲
চিচিঙ্গা	১০—১২ তোলা	চৈত্র—আষাঢ়	২—২॥০ মাস	২৫৲	১০৲	১৫৲
ছালাদ বা লেটুস	//০ এক ছটাক	ভাদ্র—পৌষ	২ মাস	৭০৲	৩০৲	৪০৲
ঝিঙ্গা (ভুঁয়ে)	/৶০ ছটাক	পৌষ—ফাল্গুন	২ মাস	৪০৲	১৫৲	২৫৲
„ (পালা)	১০—১২ তোলা	বৈশাখ—আষাঢ়	২ মাস	৪০৲	১৫৲	২৫৲
টমেটো	২॥০—৩ তোলা	শ্রাবণ—কার্ত্তিক	৪—৪॥০ মাস	১০০৲	২৫৲	৭৫৲
টেঁপারী	/।০ পোয়া	„ „	„ „	৩৫৲	২০৲	১৫৲
ঢেঁড়স বা ভেণ্ডি	/॥০ সের	ফাল্গুন—আষাঢ়	২—২॥০ মাস	৪০৲	২০৲	২০৲
তরমুজ	১০—১২ তোলা	পৌষ—চৈত্র	২॥০—৩ মাস	৬০৲	২০৲	৪০৲
তামাক	„	„ „	২॥০—৩ মাস	১২০৲	৬০৲	৬০৲
[illegible]	৮—১০ তোলা	চৈত্র—আষাঢ়	১॥০—২ মাস	২০৲	৫৲	১৫৲

সব্জীর নাম	বাজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
পটল	১০ সের	আশ্বিন—কার্ত্তিক	৩৷ মাস	১৫০৲	৫০৲	১০০৲
পেঁপে	১০ তোলা	প্রায় বারমাস	—	১৫০৲	৪০৲	১১০৲
পেঁয়াজ (বীজ)	৮ তোলা	শ্রাবণ—কার্ত্তিক	৬—৭ মাস	৫০৲	২০৲	৩০৲
,, (মূল)	৩০—৩৫ সের	অগ্রহায়ণ	৫—৬ মাস	৫০৲	২০৲	৩০৲
পার্শেলী	/৷০ সের	,,	৪ মাস	—	—	—
পামকিন বা স্কোয়াস	৩ ছটাক	চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র-কার্ত্তিক	২৷ মাস	৭০৲	৩০৲	৪০৲
পার্শনিপ	৫ তোলা	ভাদ্র—অগ্রহায়ণ	৩ মাস	—	—	—
ফুলকপি (জলদি)	৪—৫ তোলা	আষাঢ়—শ্রাবণ	৩ মাস			
,, মাধ্যমিক	,, ,,	শ্রাবণ—ভাদ্র	৩৷ মাস	৪০০৲	২০০৲	২০০৲
,, নাবী	,, ,,	ভাদ্র—আশ্বিন	৪ মাস			
ব্রোকোলী	,, ,,	শ্রাবণ—আশ্বিন	৪ মাস	—	—	—
বাঁধাকপি (জলদি)	,, ,,	শ্রাবণ—ভাদ্র	২৷—৩ মাস			
,, মাধ্যমিক	,, ,,	ভাদ্র—আশ্বিন	৩৷ মাস	৪০০৲	২০০৲	২০০৲
,, নাবী	,, ,,	আশ্বিন—কার্ত্তিক	৩৷—৪ মাস			

সব্জী চাষের হিসাব

সব্জীর নাম	বীজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
বীট	/৸০ পোয়া	ভাদ্র—কার্ত্তিক	২৷৷—৩ মাস	৭০৲	২৫৲	৪৫৲
বেগুণ (আউসে)	৪—৫ তোলা	চৈত্র—বৈশাখ	৪—৫ মাস			
পৌষে বেগুণ	,, ,,	ভাদ্র—আশ্বিন	,, ,,	৯০৲	৩০৲	৬০৲
কুলী বেগুণ	,, ,,	অগ্রহায়ণ-পৌষ, চৈত্র-বৈশাখ	,, ,,			
বরবটী	/৩ সের	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	২—২৷৷ মাস	২০৲	৫৲	১৫৲
মকা, মকাই বা ভুট্টা	/৫ সের	ফাল্গুন—শ্রাবণ	৩ মাস	৩০৲	১৫৲	১৫৲
দেশী মটর	।০—।২ সের	ভাদ্র—কার্ত্তিক	৩—৪ মাস	২৫৲	১০৲	১৫৲
বিলাতী মটর	/৭—/৮ সের	আশ্বিন—অগ্রহায়ণ	,, ,,	২৫৲	১০৲	১৫৲
মূলা বর্ষাতি	/২ সের	জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়	১৷৷ মাস	৬০৲	৩০৲	৩০৲
অন্যান্য মূলা	/৷৷০—/১ সের	শ্রাবণ—আশ্বিন	২—৩ মাস	৬০৲	৩০৲	৩০৲
মানকচু	৭০০ মূখী	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	১ বৎসর	৯০৲	৩০৲	৬০৲
লাউ	১০ তোলা	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-পৌষ	২—২৷৷ মাস	৪০৲	১৫৲	২৫৲

সজীর নাম	বীজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
লঙ্কা	৩—৪ তোলা	ফাল্গুন—শ্রাবণ	৩—৩॥ মাস	৭০৲	২৫৲	৪৫৲
লীক	৩—৪ তোলা	আশ্বিন—অগ্রহায়ণ	২—৩ মাস	—	—	—
শশা পালা	৭ ৮ তোলা	জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়	২ মাস	৪০৲	১৫৲	২৫৲
,, ভুঁয়ে	১০—১২ তোলা	আশ্বিন—কার্ত্তিক চৈত্র—বৈশাখ	২ মাস ১ মাস			
শালগম	/।৶০ পোয়া	ভাদ্র—কার্ত্তিক	২—২॥ মাস	৩০৲	৩০৲	৩০৲
শাক নটে	/॥০ সের	চৈত্র—আষাঢ়	১ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲
,, কনকা	,,	আশ্বিন—কার্ত্তিক চৈত্র—আষাঢ়	২ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲
,, কাটোয়া ডাঁটা	,,	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	২ ২॥ মাস	৫০৲	১৫৲	৩৫৲
,, পালম	/১ সের	আশ্বিন—অগ্রহায়ণ বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	,, ,,	৫০৲	১৫৲	৩৫৲
,, টক পালম	/৶০ পোয়া	আশ্বিন—অগ্রহায়ণ	১॥ মাস	—	—	—

সব্জী চাষের হিসাব

সব্জীর নাম	বীজের পরিমাণ	বপনের সময়	ফলনের কাল	আয়	ব্যয়	লাভ
শাক (পুঁই)	/।০ পোয়া	চৈত্র—আষাঢ়	৩—৪ মাস	২৫৲	১০৲	১৫৲
,, শুলফা	/৸০ পোয়া	কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ	১॥ মাস	—	—	—
,, মেস্তা	/১ সের	চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ	,,	—	—	—
,, মেথী	,,	কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ	,,	—	—	—
,, পিড়িং	/॥০ সের	আশ্বিন—কার্ত্তিক	১॥ মাস	—	—	—
,, বেথুয়া	/৶০ পোয়া	,, ,,	,,	—	—	—
,, সিলেরী	৩—৪ তোলা	শ্রাবণ—কার্ত্তিক	৩॥ মাস	৮০৲	৩০৲	৫০৲
,, রাই	/১॥০ সের	ভাদ্র—আশ্বিন	৬—৭ মাস	—	—	—
শাঁক আলু	/২॥০ সের	চৈত্র—আষাঢ়	৪ মাস	৩০৲	১৫৲	১৫৲
শীম (দেশী)	/১॥০ সের	জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়	১ বৎসর	২০৲	৫৲	১৫৲
,, ফরাসী ও অন্যান্য	/৫—/৬ সের	ভাদ্র—অগ্রহায়ণ	২—৩ মাস	৩০৲	১০৲	২০৲

(গ)

শাক-সব্জীতে ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলিতে যাহার দ্বারা জীবনী-শক্তি ও দৈহিক বল বৃদ্ধি হয় তাহাই বুঝায়। পূর্ব্বে শরীর তত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে পাঁচ প্রকার পুষ্টিকর পদার্থ (যথা—ছানা জাতীয়, মাখন জাতীয়, শর্করা জাতীয়, লবণ ও জল) অবস্থিত থাকিলেই শরীর পোষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়। খাদ্যদ্রব্যে অবস্থিত এই রাসায়নিক উপাদান সমূহ আমাদের দেহ-গঠনে ও তাপ-সৃজনে বিশেষ আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা রাসায়নিক উপাদান সমূহ যথাপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিলে তাহা দেহের খাদ্যাভাব বা ক্ষুধা মিটাইতে পারে বটে কিন্তু প্রকৃতি বা স্বভাবজাত খাদ্যের মধ্যে ইহা ব্যতীত আরও এমন কিছু আছে যাহা শরীরের বৃদ্ধি ও রক্ষণ-কার্য্যে সহায়তা করে এবং দেহে রোগ-প্রতিশোধকতা-শক্তি আনয়ন করে। এই নবাবিষ্কৃত পদার্থ খাদ্য মাত্রেরই প্রাণস্বরূপ, এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা বা মনীষিগণ ইহাকে 'ভাইটামিন' বা 'খাদ্যপ্রাণ' নাম দিয়াছেন; সুতরাং খাদ্য-

দ্রব্যে এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থটি থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহার অভাবে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রিকেট, স্কাভি ও বেরিবেরি নামক উৎকট রোগ আক্রমণ করে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যে এবং কলে ছাঁটা চাউল, কলের ধব্‌ধবে সাদা ময়দা, দানাদার চিনি এবং টিনের কৌটায় রক্ষিত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিনের অস্তিত্ব প্রায় থাকে না। অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশী উত্তাপে রন্ধন করিলে এবং সোডা বা ক্ষার সংযোগে এই পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করিবার সময় যাহাতে ভাইটামিনের সংযোগ থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ 'এ' (A), 'বি' (B), 'সি' (C), 'ডি' (D) ও 'ই' (E) এই পাঁচ প্রকার ভাইটামিন আবিষ্কার করিয়াছেন।

'এ' (A) ভাইটামিনের অভাবে শারীরিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, সংক্রামক রোগ-প্রতিশোধক-শক্তি কমিয়া যায়, দন্তোৎগমে ব্যাঘাত হয় এবং উহা সম্যক পুষ্টিলাভ করে না। টন্‌সিল বড় হয় এবং দৃষ্টিহীনতা, বৃদ্ধিহীনতা, শীর্ণতা, রক্তাল্পতা ও নানাবিধ চক্ষুরোগ আনয়ন করে।

'বি' (B) ইহা শিশুদের শরীর-গঠনে সহায়তা করে

এবং ইহা অন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বেশী কার্য্য করে। ইহার অভাবে অন্ত্রে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং পরিপাক-যন্ত্র ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নিমান্দ্য, পিত্তের বিকৃতি, শক্তিহীনতা ও বেরিবেরি রোগ জন্মিয়া থাকে।

'সি' (C) ইহার অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ জন্মে। এই রোগে দাঁত আলগা হয়, দাঁতের গোড়া ফোলে, রক্ত পড়ে ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির মধ্যে এবং ত্বকের উপর নানাস্থানে রক্ত জমিয়া যায় এবং শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

'ডি' (D) ইহা শিশুদিগের অস্থিগঠন এবং উহার দৃঢ়তা সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয়, সহজে দাঁত উঠে না এবং অস্থি বক্র হইয়া যায়।

'ই' (E) এই জাতীয় ভাইটামিন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা পূর্ব্বে এক্স্ (X) নামে পরিচিত ছিল। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্য সকল প্রকার ভাইটামিন অবস্থিত থাকিলেও কেবল ইহার অভাবে বন্ধ্যাত্ব-দোষ জন্মে অর্থাৎ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় ও গর্ভস্থ ভ্রূণ আশু বিনষ্ট হয়।

'এ' A ও 'ডি' D ভাইটামিন একত্রে চর্ব্বিতে দ্রব হয় বলিয়া ইংরাজীতে ইহাদিগকে 'Fat Soluble Vitamin' এবং 'বি' B ও 'সি' C ভাইটামিন উভয়ই জলে দ্রবণীয় বলিয়া ইহাকে 'Water Soluble Vitamin' কহে।

সকল প্রকার স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে ভাইটামিন বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে টাট্‌কা সবুজ শাক-সব্জীর মধ্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। শাক-সব্জী ও তরিতরকারী কাঁচা অবস্থায় খাইলে তন্মধ্যস্থিত ভাইটামিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তরিতরকারী শুষ্ক করিয়া লইলে বা অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহার মধ্যস্থিত 'সি' (C) ভাইটামিন কিয়ৎ পরিমাণ নষ্ট হইয়া যায়। অধিক উত্তাপে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিলে সমস্ত ভাইটামিনের অংশ নষ্ট হইয়া যায়। উত্তপ্তাবস্থায় বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শই ভাইটামিন ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত শাক-সব্জীতে কি কি জাতীয় সার পদার্থ বা উপাদান শতকরা কত পরিমাণে বিদ্যমান আছে তাহার তালিকা

শাক-সব্জীর নাম	ছানা জাতীয় উপাদান (Protein)	মাখন জাতীয় উপাদান (Fat)	শর্করা জাতীয় উপাদান (Carbo-hydrates)	লবণ জাতীয় উপাদান (Salts)	জলীয় পদার্থ (Water)	পরীক্ষকগণের নাম
বাঁধাকপি	১· ৮	·০৫	৫· ৮	· ৭	৯১· ০	পার্কাস
বাঁধাকপি	১·৫৬	১·১১	৪· ৯	·৫২	৯২· ০	এ. কে. টার্ণার
বাঁধাকপি	১· ৫	...	২· ১	· ৬	৯১· ৫	ডাঃ চুনি বসু
ফুলকপি	· ৫	...	২· ০	· ৭	৯২· ০	গটিয়ার
ওলকপি	·৮৪	·৫৪	১· ৪	১·১৬	৮৭· ০	এ. কে. টার্ণার
লেটুস	১·৩১	১·৩২	১·৪০	· ৬	৯৫·৩৬	ঐ
পালম শাক	১· ৬	...	· ৫	২· ৪	৯২· ২	ডাঃ চুনি বসু
গাজর	·৮৭	৩·০৪	৭·২৮	·৬৮	৮৮·১২	এ. কে. টার্ণার
বীট	১·৯৬	২·০১	১১·৪১	১· ৩	৮৩·৩০	ঐ
মূলা	·২১	·০৬	৩·২৮	·৬৪	৯৫·৭০	ঐ
আলু	২· ০	·১৬	২১· ০	১· ০	৭৪· ০	পার্কাস
লাল আলু	·৭৮	৩·৩১	২১· ৭	·৫২	৭৪·১০	এ. কে. টার্ণার

শাক-সব্জীর নাম	ছানা জাতীয় উপাদান (Protein)	মাখন জাতীয় উপাদান (Fat)	শর্করা জাতীয় উপাদান (Carbo-hydrates)	লবণ জাতীয় উপাদান (Salts)	জলীয় পদার্থ (Water)	পরীক্ষকগণের নাম
বেগুণ	·৮৯	১·৪৮	৩·৪৮	১·৩৮	৯৩·৬৫	এ. কে. টার্ণার
পটল	০·৭৫	·৩৬	৩·৮৬	·৮৪	৯০·২৪	ডাঃ জে.এন্.মৈত্র
ঢেঁড়স	১·৯১	১·১১	৫·৭২	· ৮	৯০·৪০	এ. কে. টার্ণার
পেঁয়াজ	১·৫৭	২·৯৯	২· ৫	·৪৫	৮৮·৯০	ঐ
রশুন	৬·৮৫	০· ১	২৮·২১	...	...	ম্যাকারিসন
এস্পারাগাস	২২· ২	৩·৫৭	২· ৪	...	...	ম্যাকারিসন
লাউ	·৫৫	২·৩৬	· ৯	·২৬	৯৫·৮৮	এ. কে. টার্ণার
বরবটী (কাঁচা)	৩·৫০	১·২৫	১·৭৫	১· ৬	৯১·৯০	ঐ
,, শুষ্ক	২২· ০	১· ৫	৫৭· ৫	২· ৫	১৩· ০	গটিয়ার
মটরশুঁটী	৬·৩৫	·৫৩	১২· ০	·৮১	৭৮·৪৪	হচিনসন
টমেটো	·৮০	·৪৯	৩· ৬	...	৯৪·৭৩	এ. কে. টার্ণার
কাঁচকলা	১·৩১	২· ৭	১৬· ৮	·১৭	৭৯· ০	এন্. এন্. বসু

শাক-সব্জীর নাম	ছানা জাতীয় উপাদান (Protein)	মাখন জাতীয় উপাদান (Fat)	শর্করা জাতীয় উপাদান (Carbo-hydrates)	লবণ জাতীয় উপাদান (Salts)	জলীয় পদার্থ (Water)	পরীক্ষকগণের নাম
এঁচোড়	৮'৫২	'৯৪	১৬'২৮	১'৯৫	৬৩'৪১	ডাঃ জে.এন্.মৈত্র
সয়বীণ	৩৪'২৮	১৬' ৮	৩৪' ০	...	...	ম্যাকারিসন
কাঁটাল বীজ	১৩'১৪	১'৯৮	৩১'২০	২'২৭	৪৬'৪৬	এন্. এন্. বসু
ফ্রেঞ্চবীণ কাঁচা	২'৭৩	১'১৮	৫'১৬	'৭২	৯০'২০	ঐ
ঐ (শুষ্ক)	২২'৬	২' ০	৫৮' ০	২' ৪	১৬' ০	গটিয়ার
বিলাতী কুমড়া	'৯০	১'০৩	৩'৯৬	' ৭	৯৩'৪০	এন্. এন্. বসু
মানকচু	১'৮২	১'৬০	১১'৯৫	১'৪৬	৮১'২৪	ডাঃ জে.এন্.মৈত্র
ওল	২'২৯	২'৮৯	১২' ৮	১' ৪	৮০'৬০	এ. কে. টার্ণার
অন্যান্য						
তরকারী গড়ে	২'০৫	৩'৩৪	৫'৩৩	...	...	মেডিকেল কলেজ
পোলছাতু	২'২৮	০'১৮	...	...	...	...

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত খাদ্যদ্রব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ভাইটামিন বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন জাতীয় শাক-সব্জীতে কি কি ভাইটামিন বিদ্যমান আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

\+ এই চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থে ভাইটামিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে।

\+ + এই চিহ্ন দ্বারা ভাইটামিনের অংশ বেশী আছে বুঝিতে হইবে।

\+ + + এই চিহ্ন দ্বারা ভাইটামিনের অংশ খুব বেশী পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে।

— এই চিহ্নে ভাইটামিন নামমাত্র আছে বুঝিতে হইবে।

? এই চিহ্ন দ্বারা ভাইটামিন থাকা সম্বন্ধে অনিশ্চিত, অর্থাৎ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় নাই এইরূপ বুঝিতে হইবে।

শাক-সব্জীতে ভাইটামিনের পরিমাণ*

খাদ্যের নাম	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
বাঁধাকপি কাঁচা	+	+++	+++		
„ অর্দ্ধ সিদ্ধ	+	+ +	+ +		
ফুলকপি	+	+ +	+		
ওলকপি	—	+	+		
লেটুস	+ +	+ +	+++		+
শালগম	?	+ +	?		
পালম শাক	+++	+++	+++		
গাজর	+ +	+ +	+ +		
বীট	?	+	?		
মূলা	?	+	?		
আলু (কাঁচা)	+	+ +	+ +		
আলু (সিদ্ধ)	?	+ +	+ +		
লাল আলু	+ +	+	?		
বেগুণ	?	+	+		
পটল		+	+		
ঢেঁড়স	+	+ +	+		
পেঁয়াজ	?	+ +	+ +		
রশুন	?	?	+ +		
স্কোয়াস	+ +	?	?		
লাউ	+ +	?	?		

শাক-সব্জীতে ভাইটামিনের পরিমাণ*

খাদ্যের নাম	'এ' (A)	'বি' (B)	'সি' (C)	'ডি' (D)	'ই' (E)
বরবটী কাঁচা			+ + +		
সীম	+	+ +	?		
সয়বিন	+	+ + +			
পার্শনিপ	?	+ +	?		
কড়াইশুঁটী	+ +	+ +	+		
টমেটো	+ +	+ + +	+ + +		
সিলেরী	?	+	?		
ক্রেশ	?	?	+		
ধনে	+	+	+		
শুলফা	+	+	+		
পুদিনা	+	+	+		
কাঁচকলা	+	?	+ +		
এঁচোড়	+	?	?		

* ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের 'খাদ্য' পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

(ঘ)

বিভিন্ন প্রকার সব্জী প্রতি একর জমি হইতে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাকে অসার করিয়া ফেলে তাহার মোটামুটী হিসাব

সব্জীর নাম	যবক্ষারজান Nitrogen পাউণ্ড	অস্থিজান Phosphorus পাউণ্ড	ক্ষারজান Potash পাউণ্ড
আলু	৩০—৬০	৬০—১২০	৯০—১৮০
বেগুণ	৮০	১০০	১৮০
সীম	২৪—৩২	৩০—৬০	৩২—৪৮
বরবটী	২০—৩০	৩২—৫০	৪৮—৫৬
পেঁয়াজ	৬০—৮০	৯০—১২০	১০৫—১৪০
লাউ কুমড়া	৩৮—৪৫	৯২—১১০	৯৪—১৬০
শশা	৩৬	৯৬	৯৬
তরমুজ	৩৬—৪২	৯৬—১১০	৯৬—৯৮
ফুটী	৩৬	৯৮	৯৮
খরমুজ	৩৬—৪২	৯৬—১১০	৯৬—১০০
ফুলকপি	৪০—৮০	৭০—১৪০	৯০—১৩০
বাঁধাকপি	৫০—৯০	৭০—১২০	৯০—১৪০

সব্জীর নাম	যবক্ষারজান পাউণ্ড	অস্থিজান পাউণ্ড	ক্ষারজান পাউণ্ড
ওলকপি	৪০—৬০	৭০—৮০	৯০—১৪০
মূলা	৩৫—৪৫	৪২—৫৪	৬০—৮১
রাঙ্গা আলু	১২—১৬	৩৪—৪৫	৪০—৫২
মিঠা আলু	১২—১৬	৩৬—৪৮	৪২—৫৬
টমেটো	৩২—৪৮	৫৬—৮৪	৪৮—৭২
বীট	৫০—১০০	৬০—১২০	৯০—১৮০
গাজর	৪০—৬০	৬০—১১০	৯০—১৬০
শালগম	২৫—৪০	৫০—৭৫	৩০—৪০